নারায়ণ সান্যাল

'হিন্দু না ওরা মুসলিম'

ধুলু ব্যাঙ্গালিত পাঠাগার

www.Banglaclassicbooks.blogspot.in

আমার কথা

বাংলা বইয়ের ফর্মাগুলি আমার সংগ্রহে আছে। যে বইগুলো আমার পছন্দ এবং ইতিমধ্যে ইন্টারনেটে পাওয়া যাচ্ছে, সেগুলো নতুন করে স্ক্যান না করে পুরোগুলো বা এডিট করে নতুন ভাবে দেবো। যেগুলো পাওয়া যাবেনা, সেগুলো স্ক্যান করে উপহার দেবো। আমার উদ্দেশ্য ব্যবসায়িক নয়। শুধুই বৃহত্তর পাঠকের কাছে বই পড়ার অভ্যেস ধরে রাখা। আমার অগ্রণী বইয়ের সাইট সৃষ্টিকর্তাদের অগ্রিম ধন্যবাদ জানাচ্ছি যাদের বই আমি শেয়ার করব। ধন্যবাদ জানাচ্ছি বন্ধু অপ্টিমাস প্রাইম ও পি. ব্যাভস কে - যারা আমাকে এডিট করা ভালো ভাবে শিখিয়েছেন। আমাদের আর একটি প্রয়াস পুরোনো বিস্মৃত পত্রিকা নতুন ভাবে ফিরিয়ে আনা। আগ্রহীরা দেখতে পারেন www.dhulokhela.blogspot.in সাইটটি।

আপনাদের কাছে যদি এমন কোনো বইয়ের কপি থাকে এবং তা শেয়ার করতে চান - যোগাযোগ করুন - *subhajit819@gmail.com.*

PDF বই কখনই মূল বইয়ের বিকল্প হতে পারে না। যদি এই বইটি আপনার ভালো লেগে থাকে, এবং বাজারে হার্ড কপি পাওয়া যায় - তাহলে যত দ্রুত সম্ভব মূল বইটি সংগ্রহ করার অনুরোধ রইল। হার্ড কপি হাতে নেওয়ার মজা, সুবিধে আমরা মানি। PDF করার উদ্দেশ্য বিরল যে কোন বই সংরক্ষণ এবং দূর দূরান্তের সকল পাঠকের কাছে পৌঁছে দেওয়া। মূল বই কিনুন। লেখক এবং প্রকাশকদের উৎসাহিত করুন।

There is no wealth like knowledge, No poverty like ignorance

SUBHAJIT KUNDU

হিন্দু না ওরা মুসলিম?

হিন্দু না ওরা মুসলিম ?

আবুবকর সিদ্দিক

দে'জ পাবলিশিং ।। কলকাতা ৭০০০৭৩

HINDU NA ORA MUSLIM ?
[Are They Hindus or Muslims ?]
A Collection of two novelettes by NARAYAN SANYAL in Bengali
Published by Sudhangshu Sekhar Dey, Dey's Publishing
13 Bankim Chatterjee Street, Kolkata 700 073
Phone : 2241-2330/2219-7920 Fax : (033) 2219-2041
e-mail : deyspublishing@hotmail.com
₹ 100.00

ISBN 978-81-295-1826-2

গ্রন্থক্রমিক : 102

রচনাকাল : প্রাক পূজা, ১৪০২

[প্রথম কাহিনীটি পূজাসংখ্যা 'নবকল্লোল' ১৪০২ এবং দ্বিতীয়টি পূজা সংখ্যা 'সংবাদ প্রতিদিন'-এ সংক্ষিপ্ত আকারে প্রকাশিত]
প্রথম প্রকাশ : পয়লা নভেম্বর 1995, কার্তিক ১৪০২
চতুর্থ সংস্করণ : এপ্রিল 2013, বৈশাখ ১৪২০
© সবিতা সান্যাল
প্রচ্ছদ-পরিকল্পনা ও অঙ্কন : সন্দীপন ভট্টাচার্য
প্রচ্ছদের কেন্দ্রীয় সম্প্রীতিচিত্র : চণ্ডী লাহিড়ী
অলঙ্করণ চণ্ডী লাহিড়ী, সন্দীপন ভট্টাচার্য ও লেখক
প্রুফ নিরীক্ষা : সুচিত্রা সান্যাল, মৌ সান্যাল ও সুবাস মৈত্র

১০০ টাকা

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনও অংশেরই কোনওরূপ পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না, কোনও যান্ত্রিক উপায়ের (গ্রাফিক, ইলেকট্রনিক বা অন্য কোনও মাধ্যম, যেমন ফোটোকপি, টেপ বা পুনরুদ্ধারের সুযোগ সংবলিত তথ্য সঞ্চয় করে রাখার কোনও পদ্ধতি) মাধ্যমে প্রতিলিপি করা যাবে না বা কোনও ডিস্ক, টেপ, পারফোরেটেড মিডিয়া বা কোনও তথ্য সংরক্ষণের যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পুনরুৎপাদন করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

প্রকাশক : সুধাংশুশেখর দে, দে'জ পাবলিশিং
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩

বর্ণগ্রন্থন : লেজার অ্যাণ্ড গ্রাফিক্স
১৫৭বি মসজিদবাড়ি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০০৬

মুদ্রক : সুভাষচন্দ্র দে, বিসিডি অফসেট
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩

উৎসর্গ

অনুজপ্রতিমেষু,

ভাই আজিজুল, তুমি তো অনেক পড়াশুনা করেছ, কিন্তু বিষ্ণুপুরাণে অষ্টাবক্রমুনির উপাখ্যানটা পড়ার কি সৌভাগ্য হয়েছে তোমার? শোন বলি :

হিরণ্যকশিপু লোকটা গদিতে চড়ে বসেছিল বটে, কিন্তু সে ক্ষত্রিয় ছিল না, ছিল জাতে বামুন! তাই ব্রাহ্মণ-হত্যাজনিত হেতুতে নারায়ণের নখে দেখা দিল নিদারুণ প্রদাহ! কে বলেছিলেন মনে নেই — ব্রহ্মাই হবেন বোধহয় — নারায়ণকে বললেন, কেউ যদি স্বেচ্ছায় তোমার পাপের ভার নিজমস্তকে ধারণ করতে স্বীকৃত হয় তবেই তুমি রোগমুক্ত হবে। শ্রবণমাত্র দেবদেবী-গন্ধর্ব-কিন্নরেরা এদিক-ওদিক কেটে পড়লেন — নারায়ণকে এড়িয়ে চলতে শুরু করলেন।

তখন এগিয়ে এলেন এক অনিন্দ্যকান্তি তেজোদীপ্ত তরুণ তাপস। নারায়ণকে বললেন, আপনি আমাকে আশীর্বাদ করুন, প্রভু। আমি স্বেচ্ছায় আপনার পাপের ভার মস্তকে বহন করব। নারায়ণকে রোগমুক্ত করে কন্দর্পকান্তি তরুণ তাপস হয়ে গেলেন যষ্টিনির্ভর অকালবৃদ্ধ-তরুণ অষ্টাবক্র!

হেঁদুদের এই কিস্‌সাটি হয় তুমি জান না, নয় মান না। কিন্তু বিশ্বাস কর আজিজুল, এমনটাও হয়ে থাকে। সমাজের পাপ স্বেচ্ছায় নিজমস্তকে ধারণ করে তরুণ তাপসকে অষ্টাবক্র হয়ে যেতে আমি স্বচক্ষে দেখেছি।

অষ্টাবক্রকে আমি শ্রদ্ধা করি।

আশীর্বাদক

আজিজুল হক

আবুল সালাম

কৈফিয়ৎ

যা লিখেছি তার জন্য নয়, যা লিখিনি তা কেন লিখিনি সেই কৈফিয়ৎটাই আগে দাখিল করি। লিখিনি 'রূপমঞ্জরী'-র শেষ খণ্ড, লিখিনি 'না-মানুষী বিশ্বকোষ-এর তৃতীয় খণ্ড: স্তন্যপায়ী। পাঠক-পাঠিকাদের কাছ থেকে ক্রমাগত তাগাদা পাওয়া সত্ত্বেও কেন 'রূপমঞ্জরী' কাহিনী শেষ না করে এই রচনার জন্য কলম ধরেছি তার কৈফিয়ৎ এ-গ্রন্থে 42 পৃষ্ঠায় দিয়েছি। আশাকরি আপনারা আমার সঙ্গে একমত হবেন এবং আমাকে ক্ষমা করবেন।

চণ্ডী লাহিড়ী তাঁর ব্যঙ্গচিত্রগুলি ব্যবহার করতে দেওয়ায় তাঁর কাছে আমি কৃতজ্ঞ। একটি সুন্দর সারস্বত-সন্ধ্যায় গ্রন্থটি প্রকাশ করার আয়োজন করে অনুজপ্রতিম শ্রীমান সুধাংশু দে আমাকে আমার প্রিয় পাঠক-পাঠিকার কাছাকাছি আসার সুযোগ করে দিয়েছে, এতেও আমি মুগ্ধ। আর একটা কৈফিয়ৎ। আয়ার্ল্যান্ড দ্বীপটি কী করে বিষমণ্ডিত হয়ে উঠল সে কিস্‌সাটি বলতে গিয়ে প্রথম অনুচ্ছেদেই একটা 'স্লিপ অফ টঙ্গু' হয়ে গেছে! এমনটা অবশ্য হয়েই থাকে! 'কী যাতনা বিষে ... কভু আশীবিষে দংশেনি যারে' পংক্তিটি কোন যশুরে বাঙাল রচিত নয়। সম্ভবত সেটি কৃষ্ণধন মিত্র-মশাই রচিত। ডিসেম্বর ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বাঙালী তথা দেশীয় পরিচালিত প্রথম একটি শিশুপাঠ্য মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন : 'জ্ঞানোদয়'। দত্তমশাই ও মিত্রমশাই দুজনের কাছেই আমি ক্ষমাপ্রার্থী।

মহাষষ্ঠী
১৪০২
1.10.95

বাবুর সাব

নারায়ণ সান্যাল রচিত গ্রন্থ (1995 পর্যন্ত)

বিষয়ভিত্তিক

1. শিশু ও কিশোর সাহিত্য

গাছ-মা—86
হাতি আর হাতি—79
নাকউঁচু—66
কালো কালো—25
ডিজনেল্যান্ড—67
অরিগামি—55
কিশোর অমনিবাস—51
শার্লক হেবো—26

2. সদ্যসাক্ষর সাহিত্য

গ্রাম্যবাস্তু—4
পরিকল্পিত পরিবার—5
দশেমিলি—8

3. না-মানুষ আশ্রয়ী

না-মানুষের কাহিনী—76
রাস্কেল—60
তিমি-তিমিঙ্গিল—50
না-মানুষী 'বিশ্বকোষ'(এক)—74
না-মানুষী 'বিশ্বকোষ'(দুই)—83
গজমুক্তা—30

4. বিজ্ঞান-আশ্রয়ী

বিশ্বাসঘাতক—32
হে হংসবলাকা—33
অবাক পৃথিবী—39
নক্ষত্রলোকের দেবতাত্মা—40
আজি হ'তে শত বর্ষ পরে—38

5. চিত্রশিল্প-স্থাপত্য-ভাস্কর্য

অজন্তা অপরূপা—19
কারুতীর্থ কলিঙ্গ—29
ভারতীয় ভাস্কর্যে মিথুন—52
লা জবাব দেহলী
অপরূপা আগ্রা—56
রোদ্যাঁ—63
প্রবঞ্চক—71
Immortal Ajanta—61
Erotica in Indian Temples—62

6. ভ্রমণ সাহিত্য

দণ্ডকশবরী—11
পথের মহাপ্রস্থান—16
জাপান থেকে ফিরে—27

7. স্মৃতিচারণধর্মী

পঞ্চাশোর্ধ্বে—41
ষাট-একষট্টি—64
আবার সে এসেছে ফিরিয়া—80

8. মনোবিজ্ঞান আশ্রয়ী

অন্তর্লীনা—18
তাজের স্বপ্ন—20
মনামী—9

9. গোয়েন্দা কাহিনী

সোনার কাঁটা—34
মাছের কাঁটা—35
পথের কাঁটা—42
ঘড়ির কাঁটা—46
কুলের কাঁটা—47
উলের কাঁটা—68
সারমেয় গেণ্ডুকের কাঁটা—77
অ-আ-ক-খুনের কাঁটা—72
কাঁটায় কাঁটায়-এক—84
কাঁটায় কাঁটায়-দুই—85
রিস্তেদারের কাঁটা—92
কৌতূহলী কনের কাঁটা—93
'যাদু এ তো বড় রঙ্গ'-র কাঁটা—94
ন্যায়নিষ্ঠ ন্যাসনাশীর কাঁটা—96
অভি+নী-অল'-এর কাঁটা—95
দ্বি-বৈবাহিক কাঁটা—97
যমদুয়ারে পড়ল কাঁটা—98

10. প্রয়োগ বিজ্ঞান

Handbook of Estimating—12
গ্রামের বাড়ি—54
গ্রামোন্নয়ন কর্মসহায়িকা—53
বাস্তুশিল্প—99

11. গবেষণাধর্মী

নেতাজী রহস্য সন্ধানে—22
চীন-ভারত লঙ মার্চ—43
পয়োমুখম্—73

12. উদ্বাস্তু সমস্যা আশ্রয়ী

বকুলতলা পি. এল. ক্যাম্প—2
বল্মীক—3
অরণ্যদণ্ডক—10

13. ইতিহাস-আশ্রয়ী

মহাকালের মন্দির—14
আনন্দস্বরূপিণী—48
লাডলি বেগম—69
হংসেশ্বরী—44
রূপমঞ্জরী-এক—82

14. জীবনী-আশ্রয়ী

'আমি নেতাজীকে দেখেছি'—23
'আমি রাসবিহারীকে দেখেছি'—31
লিন্ডবার্গ—49

15. দেবদাসী সম্পৃক্ত

সুতনুকা একটি দেবদাসীর নাম—58
সুতনুকা কোন দেবদাসীর নাম নয়—59

16. সামাজিক উপন্যাস
ব্রাত্য—7
অলকনন্দা—13
সত্যকাম—17
নীলিমায় নীল—15
নাগচম্পা—21
পাষণ্ড পণ্ডিত—24
আবার যদি ইচ্ছা কর—28
অশ্লীলতার দায়ে—36
লালত্রিকোণ—37
প্যারাবোলা স্যার—45
মিলনান্তক—65
পূরবৈয়াঁ—70
অচ্ছেদ্যবন্ধন—75
ছোঁবল—81
ছয়তানের ছাওয়াল—78
আম্রপালী—88
মান মানে কচু—87
এমনটা তো হয়েই থাকে—91
রানী হওয়া—101
হিন্দু না ওরা মুসলিম—102
17 প্রবন্ধ সংকলন
লেঅনার্দোর নোটবই...—89
স্বর্গীয় নরকের দ্বার...90
18 নাটক
মুশকিল আসান—1
এক দুই তিন—100

নারায়ণ সান্যাল রচিত গ্রন্থ (নভেম্বর 1995 পর্যন্ত)

কালানুক্রমিক

1 মুশকিল আসান '54
2 বকুলতলা পি. এল. ক্যাম্প '55
3 বল্মীক '55
4 গ্রাম্যবাস্তু '56
5পরিকল্পিত পরিবার '57
6 বাস্তুবিজ্ঞান '59
7 ব্রাত্য '59
8 দশেমিলি '59
9 মনামী '60
10 অরণ্যদণ্ডক '61
11 দণ্ডকশবরী '62
12 Handbook of Estimating '63
13 অলকনন্দা '64
14 মহাকালের মন্দির '64
15 নীলিমায় নীল '64
16 পথের মহাপ্রস্থান '65
17 সত্যকাম ' 65
18 অন্তর্লীনা '66
19 অজন্তা অপরূপা '68
20 তাজের স্বপ্ন '69
21 নাগচম্পা '69
22 নেতাজী রহস্য সন্ধানে '70
23 'আমি নেতাজীকে দেখেছি '70
24 পাষণ্ড পণ্ডিত '70
25 কালোকালো '71
26 শার্লক হেবো '71
27 জাপান থেকে ফিরে '71
28 আবার যদি ইচ্ছা কর '72
29 কারুতীর্থ কলিঙ্গ '72
30 গজমুক্তা '73
31 'আমি রাসবিহারীকে দেখেছি' '73
32 বিশ্বাসঘাতক '74
33 হে হংসবলাকা '75
34 সোনার কাঁটা '75
35 মাছের কাঁটা '75
36 অশ্লীলতার দায়ে '75
37 লালত্রিকোণ '75
38 আজি হ'তে শত বর্ষ পরে '76
39 অবাক পৃথিবী '76
40 নক্ষত্রলোকের দেবতাত্মা '76
41 পঞ্চাশোর্ধ্বে '76
42 পথের কাঁটা '76
43 চীন-ভারত লঙ মার্চ '77
44 হংসেশ্বরী '77
45 প্যারাবোলা স্যার '77
46 ঘড়ির কাঁটা '78
47 কুলের কাঁটা '78
48 আনন্দস্বরূপিণী '78
49 লিন্ডবার্গ '78
50 তিমি-তিমিঙ্গিল '79
51 কিশোর অমনিবাস '80
52 ভারতীয় ভাস্কর্যে মিথুন '80
53 গ্রামোন্নয়ন কর্মসহায়িকা '80
54 গ্রামের বাড়ি '80
55 অরিগামি '82
56 লা-জবাব দেহলী অপরূপা আগ্রা '82
57 না-মানুষের পাঁচালী '83
58 সুতনুকা একটি দেবদাসীর নাম '83
59 সুতনুকা কোন দেবদাসীর নাম নয় '83
60 রাস্কেল '84
61 Immortal Ajanta '84
62 Erotica in Indian Temples '84
63 রোদ্যাঁ '84
64 ষাট-একষট্টি '84
65 মিলনান্তক '85
66 নাক উঁচু '85
67 ডিজনেল্যান্ড '85
68 উলের কাঁটা '86

70 পুরবেয়াঁ '86
71 প্রবঞ্চক '87
72 অ-আ-ক-খুনের কাঁটা '87
73 পয়োমুখম্ '87
74 না-মানুষী 'বিশ্বকোষ'-এক '88
75 অচ্ছেদ্যবন্ধন '88
76 না-মানুষের কাহিনী '88
77 সারমেয় গেণ্ডুকের কাঁটা '89
78 ছয়তানের ছাওয়াল '89
79 হাতি আর হাতি '89
80 আবার সে এসেছে ফিরিয়া '89
81 ছোঁবল '89
82 রূপমঞ্জরী-এক '90
83 না-মানুষী 'বিশ্বকোষ' (দুই) '90
84 কাঁটায় কাঁটায়-এক '90
85 কাঁটায় কাঁটায়-দুই '90
86 গাছ-মা '91
87 মান মানে কচু '91
88 আম্রপালী '91
89 লেঅনার্দোর নোটবই... '91
90 স্বর্গীয় নরকের দ্বার...'91
91 এমনটা তো হয়েই থাকে '92
92 রিস্তেদারের কাঁটা '92
93 কৌতূহলী কনের কাঁটা '93
94 'যাদু এ তো বড় রঙ্গ'-র কাঁটা '93
95 'অভি নী-ধাতু অল'-এর কাঁটা '93
96 ন্যায়নিষ্ঠ ন্যাসনাশীর কাঁটা '93
97 দ্বি-বৈবাহিক কাঁটা '94
98 যমদুয়ারে পড়ল কাঁটা '94
99 বাস্তুশিল্প '94
100 এক. দুই.. তিন... '95
101 রানী হওয়া '95
102 হিন্দু না ওরা মুসলিম '95

"সন্তান মোর মার।"

এক

1989 সাল। আষাঢ় মাস। ভাগলপুরের গঙ্গা এখনো কূল ছাপায়নি। বর্ষা সবে নেমেছে। বঙ্গোপসাগরের বার্ষিক আশীর্বাদ মৌসুমী মেঘের বাহন হয়ে এসে পৌঁছেছে গাঙ্গেয় উপত্যকায়। ভাগলপুরেও। দু-হাজার বছর আগে যখন ভাগলপুরের নাম ছিল চম্পানগরী, তখনো যেমন আকাশ কালো করে ছুটে আসত মেঘের দল, আজও তাই আসে।

আজ জুম্মাবার। শেষ দুটো পিরিয়ড অফ। তেজনারায়ণ জুবিলি কলেজ থেকে বেলা তিনটে নাগাদ রওনা হলেন প্রফেসর জামাল উদ্দীন চৌধুরী-সাহেব। এক হাতে ঝোলা ব্যাগ অপর হাতে ছাতা। এখন অবশ্য বৃষ্টিটা ধরেছে। পথেঘাটে ছোপ ছোপ জল।

প্রফেসর চৌধুরী অবশ্য বাস্তবে 'প্রফেসর' নন, এতদিনে রিডার। তবে পাড়া-বেপাড়ার সবাই ওঁকে ডাকে ঐ 'প্রফেসর' নামে। পনের বছর আছেন এই কলেজে। বহুদিনের প্রাচীন কলেজ। শতবার্ষিকী হয়ে গেছে দু বছর আগে। বর্তমানে ভাগলপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদিত কোয়েডুকেশন কলেজ। ওঁর বয়স যে চল্লিশের বেড়া ডিঙিয়েছে তা হঠাৎ দেখলে বোঝা যায় না। মুখে চাপ দাড়ি, অথচ গোঁফটা কামানো। মাথার চুল কাঁধের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। বাবরি ধরনের। পাক ধরেনি এখনো। কুচকুচে কালো। সেই কালো চুলের সঙ্গে মানানসই তালশিরের সফেদ টুপি। কলেজে উনি ইংরেজি পড়ান। এই কলেজেরই ছাত্র; এই ভাগলপুর থেকেই ইংরেজিতে এম. এ. করেছেন। ওঁর হাতব্যাগে একটি বই—পাবলিক লাইব্রেরির। ইচ্ছে, বাড়ি ফেরার পথে বইটি বদল করে নতুন একখানা ইংরেজি উপন্যাস নিয়ে যাবেন। শনি-রবি ছুটি। অকৃতদার একা মানুষ। বাড়িতে দ্বিতীয় প্রাণী নেই। সময় কাটে না।

কলেজ থেকে বার হয়ে ছাতাটা খুললেন। বৃষ্টি নেই। কিন্তু রোদের তেজ আছে। রাস্তাটা পার হয়ে উত্তরমুখো বাস স্টপেজে এসে দাঁড়ালেন।

সেখানে আগে থেকেই দুটি ছাত্রী লেডিজ ছাতা মাথায় বাসের জন্য অপেক্ষা করছিল। ওদের বাঁ-হাতে বই। ডানহাত তুলে কপালে ছুঁইয়ে বললে, আদাব, স্যার!

'নমস্তে, সার' শুনতে অভ্যস্ত চৌধুরী-সাহেব একটু চমকে উঠলেন।

প্রতিনমস্কার করে বললেন, আদাব। তোমরা দুজন তো ফোর্থ ইয়ারের। নয়?

কলেজে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ইদানীং এত বেড়ে গেছে যে, প্রত্যেকের নাম আর আগেকার জমানার মতো স্মরণে রাখতে পারেন না।

নিকটবর্তিনী বললে, আমার নাম জহুরা। এ ফতিমা। আমরা দুজনেই ফোর্থ ইয়ারের। তবে ইংলিশ অনার্স নয়।

চৌধুরীসাব হেসে বললেন, সেটা না বললেও চলবে। অনার্সের ছাত্রছাত্রীদের প্রত্যেককেই নামে চিনি। তা তোমাদের তো কোনদিন এই রুটের বাসে যেতে দেখেছি বলে মনে পড়ছে না।

জহুরা বললে, না স্যার, আমরা একটু অন্য দিকে থাকি। আজ আমাদের এক অসুস্থ বন্ধুকে দেখতে জেনারেল হাসপাতালে যাচ্ছি —ভিজিটিঙ আওয়ার্স চারটে থেকে সাড়ে ছয়টা। ওর সঙ্গে দেখা করে যে যার বাড়ি যাব।

কলেজে কোএডুকেশন। চৌধুরী মেয়েটিকে প্রশ্ন করলেন, ফোর্থ ইয়ারে পাস-অনার্স মিলিয়ে এখন কতজন ছাত্রী পড়ে?

জহুরা তার বান্ধবীর দিকে তাকায়। সে নিরুত্তর শ্রাগ করে। জহুরা বলল, ঠিক সংখ্যাটা বলতে পারব না, স্যার। তবে মনে হয়, জনাকুড়ি।

—তার মধ্যে কতজন মুসলমান?

এবার উত্তর দিতে জহুরাকে কোন অসুবিধা ভোগ করতে হল না। বললে, এই আমরা দুজনই।

চৌধুরী-সাহেব ঝুঁকে পড়ে বাস রাস্তার শেষ দিগন্তের দিকে তাকিয়ে দেখলেন। কোনও বাস আসছে না। বিপরীত পথের দক্ষিণমুখী একটি সাত নম্বরের বাস রাস্তার ও প্রান্তে এসে দাঁড়ালো। যাত্রী নামল না কেউ। উঠল কিছু। বাসটা ছাড়ল।

চৌধুরী বললেন, তোমরা কি জান, সারা ভারতে সব জাতের নারীদের মধ্যে সাক্ষরতার অনুপাত প্রায় চল্লিশ শতাংশ? সে হিসাবে মুসলমান নারীদের সাক্ষরতার অনুপাত কত হবে আন্দাজ করতে পার?

দুজনেই নেতিবাচক মাথা নাড়ল। চৌধুরী বললেন, এগারো শতাংশ। অথচ ভাগলপুরের এই আমাদের কলেজে দেখা যাচ্ছে মুসলিম ছাত্রীর অনুপাত সে হিসাবেও কম।

ফতিমা বলে, শুধু একটা ইয়ার ধরে হিসাবটা করা কিন্তু ঠিক স্টাটিসটিকাল বাস্তবানুগ হচ্ছে না, স্যার।

—করেক্ট! কিন্তু আমি গোটা কলেজের ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা নিয়ে এই স্যাটিসক্সটিক্সটা আগেই কষে দেখেছি। সর্বভারতীয় সাক্ষর মহিলাদের ক্ষেত্রে মুসলমান সাক্ষর মহিলার শতাংশ যেক্ষেত্রে আটাশ,—চল্লিশে এগারো, শুধু ভাগলপুর জেলায় তা আটত্রিশে ষোলো। আর আমাদের কলেজে সব ইয়ার মিলিয়ে ছাত্রী সংখ্যার মাত্র তের শতাংশ মুসলমান। ছয় শতাংশ খ্রীস্টান, আর বাদ বাকি একাশি শতাংশ হিন্দু! তার মানে গোটা ভারতের তুলনায়, গোটা জেলার তুলনায় ভাগলপুর শহরে মুসলমান পরিবারেরা স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে তত উৎসাহী নয়। হিসাব তাই বলছে না?

"সন্তান মোর মার।"

ওরা কোন জবাব দিল না। উৎসাহ দেখালো না এ বিষয়ে নিয়ে আলোচনাটা চালিয়ে যেতে। এদিকে বাসের কোনও পাত্তা নেই। চৌধুরী বললেন, এক কাজ করা যাক। একটা অটো নিয়ে, চল, আমরা তিনজনেই জেনারাল হস্‌পিটালে চলে যাই। ওখান থেকে আমি পায়ে হেঁটে লাইব্রেরিতে চলে যাব। সেখানেই যাচ্ছি আমি। লাইব্রেরিটা হাসপাতাল থেকে মিনিট দশেকের পায়ে-হাঁটা দূরত্বে।

ছাত্রী দুজন রাজি হল। চৌধুরী একটা অটো রিক্‌শাকে ডাকলেন। কিছুটা দরাদরি করে তিনজনে উঠে বসলেন। জহুরা বসল মাঝখানে। অটো রিক্‌শাটা ছাড়ল। কথোপকথন চালিয়ে যেতে চৌধুরী প্রশ্ন করেন, তোমাদের বান্ধবীর কী হয়েছে? আই মিন, অসুখটা কী জাতীয়?

জহুরা জবাব দিল না। ফতিমার দিকে আবার তাকালো। সে ও-পাশ থেকে বলল, ঠিক জানি না, স্যার। শুনেছি পয়েজনিং কেস!

—পয়েজনিং! কেউ ওকে বিষ খাইয়েছে? বধূহত্যা?

—না, স্যার! ও...মানে, ঠিক জানি না...শুনেছি, সুইসাইড করতে চেয়েছিল।

এর পর প্রতিবর্তী প্রেরণায় যে প্রশ্নটা ওঠার কথা প্রফেসর চৌধুরী সেটা উচ্চারণ করলেন না। জানতে চাইলেন না—কোন্ অসহ্য হেতুতে একটি তরুণী এই রূপরসশব্দ-গন্ধস্পর্শময় পৃথিবীর সব আকর্ষণ হারিয়ে 'বামির হাতে দীপশিখাটির' মতো একেবারে নিঃশেষে মুছে যেতে চেয়েছিল।

জহুরা এবার নিজে থেকেই বলে, আপনি হয়তো ওকে চিনবেন, স্যার। বছরতিনেক আগে আমাদের সঙ্গে পড়ত। ফার্স্ট-ইয়ারেই বিয়ে হয়ে যায়। কলেজ থেকে নাম কাটিয়ে সংসার করতে যায়।

—কী নাম বল তো?

—স্মৃতিলেখা দ্বিবেদী!

—ইয়েস! আই রিমেম্‌বার। স্মৃতিলেখা। বেশ ফর্সা, মিডিয়াম হাইট, বোধহয় বাবুপুর থেকে ডেলিপ্যাসেঞ্জারি করত।

জহুরা ঠোঁট বাঁকিয়ে বললে, তবে তো স্যারের সব কিছুই মনে আছে। মানে ওর গায়ের রঙটা পর্যন্ত।

শ্যামাঙ্গী জহুরার এ কথার মধ্যে কোন অভিমান ছিল কি না ভ্রূক্ষেপই করলেন না অধ্যাপকমশাই। জবাবে বললেন, হ্যাঁ, সব কিছুই মনে আছে, কারণ ওর দাদাও ছিল আমার ছাত্র। বিশ্বনাথ তোমাদের চেয়ে দু বছরের সিনিয়ার। একসঙ্গে ভাইবোনে বাবুপুর থেকে বাসে করে কলেজে আসত। তা স্মৃতিলেখা হঠাৎ...

মাঝপথেই থেমে যান। অটোরিক্‌শাটা এসে হাসপাতালের গেটের বাইরে দাঁড়াল।

চৌধুরী ওদের পয়সা মেটাতে দিলেন না। ওরা দুজন জানত স্মৃতিলেখার কেবিন নম্বর। ফলে কাউকে কিছু জিজ্ঞাসা না করেই ওঁরা এসে পৌঁছলেন ফিমেল ওয়ার্ডের দ্বিতলে।

দুর্ভাগ্য ওঁদের। কেবিনের সামনে একটা বোর্ড ঝোলানো আছে : 'নো ভিজিটার্স অ্যালাওড'!

ছাত্রী দুজন বললে, বৃথাই দৌড়াদৌড়ি হল। সোমবারে আবার এসে খোঁজ নেব বরং। চৌধুরী বললেন, তোমরা তাহলে যাও। এখানে আমার একটি ছাত্র ডাক্তার হিসাবে চাকরি করে। এলাম যখন তখন দেখে যাই, সে আছে কি না।

এবার ওঁর ভাগ্য ভাল। ডক্টর কুমার ঘরেই ছিলেন। ভিজিটার্স স্লিপ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ডক্টর কুমার একেবারে ঘর ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে এলেন, আসুন স্যার! আপনি আবার স্লিপ দিয়েছেন কেন? সোজা নক্ করে ঘরে ঢুকতেন।

চৌধুরী বলেন, তাই কি পারি? তুমি যে তখন কোনও রোগিণীকে পরীক্ষা করছ না তা বাইরে থেকে কী করে বুঝব?

—যা হোক। কী খাবেন বলুন, চা-কফি না ঠাণ্ডা? তার আগে বলুন, হাসপাতালে এসেছিলেন কেন? কোন আত্মীয়-টাত্মীয় কি অসুস্থ হয়ে অ্যাডমিটেড হয়েছেন?

—হ্যাঁ। তবে আত্মীয় নয়, ছাত্রী : স্মৃতিলেখা দ্বিবেদী। অবশ্য বিয়ের পর এখন নিশ্চয়ই দ্বিবেদী উপাধি নয় ওর।

—পয়েজনিং কেস? অ্যাটেম্পটেড্ সুইসাইড?

—সেই রকমই তো শুনেছি। ঠিক জানি না।

—কেসটা ঠিকই শুনেছেন। নামটা ভুল!

—তার মানে?

—মেয়েটি প্রচুর পরিমাণে স্লিপিং পিল খেয়ে আত্মহত্যা করতেই চেয়েছিল। তবে ওর নাম স্মৃতিলেখা নয়—শুধু 'দ্বিবেদী' উপাধিটাই বদলায়নি—বিয়ের পর ওর গোটা নামটাই পালটে গেছিল, স্যার। হাসপাতালে যে রোগীটি এখন মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা কষছে তার নাম : জুলেখা আহ্‌মেদ।

—আই সি! তার মানে ও একটি মুসলমান ছেলেকে সাদি করেছিল।

—তাই করেছিল। আর সেই অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করতেই পরশু দিন সুইসাইড করতে চেয়েছিল!

প্রফেসর চৌধুরী নীরব রইলেন। ডক্টর কুমার নিজে থেকেই বললে, আয়াম সরি স্যার। যদি আপনার মনে আঘাত দিয়ে থাকি! কিন্তু আমি যা বলেছি তা নির্জলা সত্য! মেয়েটি জীবনে একটিই ভুল করেছে : একটি মুসলমান ছেলেকে ভালবাসা।

চট করে উঠে দাঁড়ালেন অধ্যাপক চৌধুরী। বললেন, তুমি ব্যস্ত মানুষ। বেশিক্ষণ

তোমাকে বিরক্ত করা উচিত হবে না।

—না, স্যার। বসুন! আপনি আমার উপর রাগ করেছেন। কিন্তু পুরো কেস-হিস্ট্রিটা শুনলে আর আমার উপর রাগ করতে পারবেন না।

—তুমি কি এখন আমাকে ওর পুরো কেস হিস্ট্রিটা শোনাতে চাও?

—না, স্যার। আমি নই। তবে ঐ মেয়েটির দাদা এসে বসে আছে কাল থেকে—সারাদিন খায়নি-দায়নি, বাড়িও যায়নি। তার বোন বাঁচল কি মরল তা সে না জেনে যাবে না। রাত্রিতে ও বাড়ি ফেরেনি। সেও বোধহয় আপনার ছাত্র। তাকে ডেকে পাঠাচ্ছি। সেই আপনাকে কেসটা বলবে। আমি বরং আবার ক্ষমা চেয়ে নিই—যদি আমার কথায় আঘাত পেয়ে থাকেন।

ডক্টর কুমারের আর্দালি ভিজিটার্স ওয়েটিং রুম থেকে ডেকে নিয়ে এল বিশ্বনাথ দ্বিবেদীকে। চুল উস্কো-খুস্কো। গায়ে ময়লা হাফশার্ট। বোতামগুলো লাগানো নয়। পরনে জিন্‌স্‌-এর প্যান্ট, পায়ে চপ্পল। একদিনেই বেচারি বাজে-পোড়া তালগাছের মতো হয়ে গেছে। অধ্যাপক চৌধুরীকে সে চিনতে পারল ভালই। দু হাত তুলে নমস্কার করে বললে, আপনি স্যার, লেখাকে দেখতে এসেছেন? খবর পেলেন কার কাছে?

জামালুদ্দীন সে-কথার জবাব দিলেন না। ওর একটি বাহুমূল দৃঢ়মুষ্টিতে ধরে ডক্টর কুমারকে বললেন, ঠিক আছে। আজ চলি। কাল বিকালে এসে জেনে যাব জুলেখা কেমন আছে।

ওর বাহুমূল ধরে আকর্ষণ করে বললেন, আয় বিশ্বনাথ।

বাইরে এসে বললেন, ডাক্তার কুমার বলল, তুই কাল থেকে এখানে পড়ে আছিস্‌। বাড়ি যাসনি! কেন?

—বাড়িতে এখন কেউ নেই, স্যার। সদরে তালা দিয়ে আমার বউ বাপের বাড়ি চলে গেছে বাচ্চাটাকে নিয়ে।

—আই সি! আজ খেয়েছিস কী?

—খেতে ইচ্ছে করছে না স্যার, কয়েক কাপ চা খেয়েছি শুধু।

—বুঝেছি। আয় আমার সঙ্গে।

ওকে নিয়ে রাস্তায় নামলেন। কাঁধে ব্যাগ, এক হাতে ছাতা, অপর হাতে দৃঢ়ভাবে তখনো ধরা আছে ছাত্রের বাহুমূল। রাস্তার কলে তখনো জল ছিল। বললেন, মুখ-হাত ভাল করে ধুয়ে নে।

ঝোলা ব্যাগ থেকে ওঁর তোয়ালেটা বার করে দিলেন। চিরুনিটাও।

সামনেই একটা মিষ্টান্ন-ভাণ্ডার। ছাত্রকে নিয়ে এসে বসালেন। বৃদ্ধ দোকানির কাছে গিয়ে নিম্নস্বরে জানতে চাইলেন, আমি বসে খেলে আপত্তি হবে কি?

দোকানি—তার মাথায় ছোট ছোট চুল, পিছনে টিকি, চোখ তুলে দেখল। বললে, না, না আপত্তি কিসের? তবে আপনারা ঐ কেবিনে গিয়ে বসুন।

জামালউদ্দীন দেখলেন। পর্দা-ঝোলানো একটি কেবিনের ব্যবস্থাও আছে। তার উপর একটি নোটিস বোর্ডে লেখা : জেনানা।

উনি বলতে গেলেন ওঁর সঙ্গে কোনও মহিলা নেই; কিন্তু দোকানি ওঁর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললে, বিশিষ্ট মেহ্‌মানদের জন্য ঐ কেবিনটি সংরক্ষিত। জেনানা সঙ্গে থাক-না-থাক।

চৌধুরী-সাহেব হাসলেন। বুঝলেন ব্যাপারটা। মাথায় অর্কফলার বিজয় বৈজয়ন্তী সত্ত্বেও লোকটা মুসলমান খদ্দেরকে ফেরাতে চায় না—মুসলমানপ্রীতিতে নয়—ব্যবসায়িক হেতুতে। তাই কেবিনের মাথায় যদিও লেখা আছে 'মহিলা', তবু ঘরটা অন্য প্রয়োজনেও ব্যবহৃত হয়। যেমন, চৌধুরী-সাহেবের মতো মৌলবাদী সাজ-পোশাকে যারা পথে-ঘাটে ঘোরা-ফেরা করেন। যাঁদের দেখলেই বোঝা যায়, 'নেড়ে'! তালশিরের টুপিতে, দাড়িতে!

বিশ্বনাথকে নিয়ে উনি মহিলা কেবিনে গিয়ে বসলেন। দোকানের ছোকরা চাকর ফ্যানটা খুলে দিল, টেনে দিল পর্দাটা। দোকানের বৃহত্তর অংশে যেসব হিন্দু মেহ্‌মান বসেছেন তাঁদের চোখের আড়ালে পড়লেন ওঁরা দুজন।

চৌধুরী ছয়খানা করে হিঙের কচুরি, আলুর দম আর জিলাপির অর্ডার দিলেন।

বিশ্বনাথ বললে, অ্যাত কে খাবে?

উনি সে কথার জবাব না দিয়ে বললেন, জুলেখার খসম্ কোথায়?

—লেখার কোনও স্বামী নেই, স্যার!

—মারা গেছে? লেখা কি বিধবা?

—না, না, মারা যাবে কেন? রসিদ লেখাকে তালাক দিয়ে দিয়েছে।

—রসিদ? ওর স্বামীর নাম রসিদ? কী করত সে?

—আজ্ঞে হাঁ। রসিদ আহমেদ্। রাজপুরে ওদের আদিবাড়ি। ও এই ভাগলপুরেই একটা গ্যারেজে কাজ করত। ওর বাবার মটোরগাড়ি সারানোর রিপেয়ারিং গ্যারেজ আছে। ও নিজে মটোর মেকানিক। অটোমোবাইল এঞ্জিন রিপেয়ারিঙের কাজ জানত। ভাল ফুটবলও খেলতো—সেন্টার হাফে। কী করে ওদের প্রেম মহব্বৎ হয়েছিল জানি না। লেখা তো আমার সঙ্গেই বাবুপুর থেকে বাসে করে আসত। কিন্তু একসঙ্গে ফিরত না। ও একটা কোচিং ক্লাসে পড়ত। আসলে সেটা মিছে কথা। ও কলেজ পালিয়ে রসিদের সঙ্গে ম্যাটিনি শো দেখত। ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে যাওয়ায় বাবা একদিন লেখাকে ধরে বেধড়ক পিটল। ব্যস্! পরদিনই সে হাওয়া! থানা কেস নিলই না। থানা অফিসার ছিলেন

মুসলমান। তাঁর যুক্তি লেখা প্রাপ্তবয়স্কা।

ইতিমধ্যে খাবার এসে গেছে। চৌধুরী-সাহেব রাতের খাবার ঐ দোকানেই সেরে নিলেন। বাড়িতে অবশ্য হাতে গড়া রুটি আর তরকারি বানানো আছে। নষ্ট হবে না। সেটা দিয়ে কাল নাস্তা সারা যাবে। উনি জানতে চাইলেন, ওরা সাদি করেছে, কতদিন আগে?

—বছর দুই।

—তারপর? রসিদ ওকে তালাক দিল কেন?

—সেটা স্যার, ঠিক জানি না আমি। লেখা খুব বড় জাতের কোন অন্যায় করেছিল নিশ্চয়।

—তারপর? সেই দুঃখেই কি ও বিষ খেয়েছে?

—সেটা তো আছেই। তাছাড়াও ওর ভোগান্তি তো বড় কম হয়নি। দোরে দোরে ভিখারির মতো ঘুরেছে। কেউ ঠাঁই দেয়নি।

সব কথা বিশ্বনাথ জানে না। কারণ বাড়ির সঙ্গে—বাবা, মা, দাদা-বৌদির সঙ্গে ওর নিজেরও সদ্ভাব নেই। ওর অপরাধ—ব্রাহ্মণ সন্তান হওয়া সত্ত্বেও সে প্রেমে পড়ে কলেজের এক সহপাঠিনীকে বিবাহ করেছে। মেয়েটি অব্রাহ্মণ, জাতে উগ্রক্ষত্রিয়। ফলে বাবুপুরের পৈত্রিক ভিটা ছেড়ে ও চলে এসেছে, অগতির গতি ভাগলপুর শহরে। এখানে একটা প্রেস-এ প্রুফ রিডার। ওর স্ত্রী অবশ্য স্কুলটিচারির একটা কাজ পেয়েছে। বিশ্বনাথ স্পষ্ট করে বলেনি, তবে চৌধুরী-সাহেব আন্দাজ করে নিলেন—যেহেতু গৃহিণীর উপার্জন কর্তার চেয়ে বেশি, তাই ঘরওয়ালীর ইচ্ছানুযায়ীই বিশ্বনাথকে দুনিয়াদারী করতে হয়। ওদের একটি সন্তানও হয়েছে। কয়েক মাস বয়স। ওর স্ত্রী এখনো মেটার্নিটি লিভে!

চৌধুরী জানতে চাইলেন, তো সদর দরজায় চাবি দিয়ে তোর বউ কোথায় গেছে? এত রাগই বা হল কেন তার?

—লেখা ভাল হয়ে উঠলে তাকে আমাদের বাড়িতে আশ্রয় দেব বলেছিলাম বলে। গেছে বাপের বাড়ি।

মর্মাহত হলেন চৌধুরী-সাহেব। হিন্দু-মুসলমানের সম্প্রীতির জন্য তিনি অনেক চেষ্টা করেছেন, অনেক নির্যাতনও সয়েছেন। এ বিষয়ে তাঁর মতাদর্শ অত্যন্ত উদার। তাই এ খবরে ওঁর মনটা খারাপ হয়ে গেল।

আহারান্তে বললেন, তুই আমার বাড়িতে চল। জানিসই তো আমি একা থাকি!

সে-কথা জানা ছিল না বিশ্বনাথের। তবু বলল, আপনার কোন অসুবিধা হবে না তো?

—কিসের অসুবিধা? আমি একা মানুষ। আমার একটা নেয়ারের খাট আছে। বাড়তি

মশারীও আছে। তুই বাইরের ঘরে শুবি। রাতের খাবার তো মোটামুটি হয়েই গেল। কাল সকালে দুজনে নাস্তাপানি সেরে আবার হাসপাতালে এসে খবর নেব—জুলেখার অবস্থার কোনও পরিবর্তন হয়েছে কি না।

বিশ্বনাথ রাজি হয়ে গেল। বলল, কাল রাতে দু-চোখের পাতা এক করতে পারিনি, স্যার। হাসপাতালের ঐ ওয়েটিং 'হলে' কী মশা! এক একটা চড়াইপাখির মতো!

হাসলেন চৌধুরী-সাহেব ওর উপমাটা শুনে।

দুই

জামালুদ্দীন চৌধুরীর আবাসস্থল শহরের একান্তে। গঙ্গার ধারে। জায়গাটার নাম 'বড়িবিবিমহল্লা'। কোন্ নবাব, বা আমীর-ওমরাহের বড়বিবির স্মৃতিবিজড়িত তার হদিস পাওয়া যায় না। কিন্তু ঐ মহল্লাটা মুসলমান-অধ্যুষিত। বিশ-পঁচিশটি দ্বিতল ও ত্রিতলবাড়ি। এক এক মোকামে তিন-চারটি পরিবার। মহল্লার একদিকে গঙ্গা, বাকি তিনদিকে হিন্দু পাড়া। জামালসাহেব থাকেন স্থানীয় এক হেকিমের দ্বিতল মোকামের একতলায়। দুখানি ঘর নিয়ে। একতলায় অবশ্য তিনটি কামরা— তৃতীয়টি হেকিম সাহেবের দাওয়াখানা।

জামালুদ্দীন হেকিম-সাহেবের ভাড়াটিয়া এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু মাসিক কত ভাড়া দেন সেটা হিসাব করতে হলে একটা জটিল অঙ্কের মাধ্যমে তা নির্ধারণ করতে হবে। প্রথম কথা, হেকিম-সাহেব থাকেন দ্বিতলে—স্ত্রী-পুত্রবধূ-নাতি এবং এক স্বামীত্যক্তা কন্যাকে নিয়ে। পুত্রটি পাটনায় চাকুরিরত—মাঝে মাঝে সপ্তাহান্ত কাটিয়ে যায়। অধ্যাপক মশায়ের নাস্তা এবং রাতের আহার্য উপর থেকে নিয়ে আসে হেকিম সাহেবের সাত বছরের নাতি আবদুল—যে নাকি আবার চৌধুরী-সাহেবের ছাত্র। স্কুলে পড়ে—কিন্তু সকালে বা সন্ধ্যায় তাকে পড়তে আসতে হয় অধ্যাপক মশায়ের কাছে। ফলে জামালসাহেব ঠিক ভাড়াটিয়া নন, বলা যায় পেয়িং গেস্ট। আবার ওদিক থেকে তিনি 'আতালিখ' অর্থাৎ রেসিডেনশিয়াল প্রাইভেট টিউটার।

জামাল-সাহেবের আদি বাড়ি চান্দেরী গ্রামে। ভাগলপুর শহর থেকে প্রায় বিশ কিলোমিটার দূরে। ভাগলপুর থেকে সুলতানগঞ্জ বা মুঙ্গের যাবার পাকা সড়কের ধারে পাশাপাশি তিনটি চাষীপ্রধান বর্ধিষ্ণু গ্রাম। বাবুপুর, চান্দেরী আর রাজপুর। বাবুপুর হিন্দুপ্রধান গ্রাম—অবশ্য গ্রামের একান্তে আট-দশ ঘর মুসলমানের বাস। অধিকাংশই মজুরচাষী—'হেঁদু' জোতদারের খেতে দৈনিক হারে মজুরি খাটে। চান্দেরী গ্রামটিতে

মুসলমান অধিবাসীর অনুপাত কিছু বেশি। শতকরা পঁচিশ ঘর মুসলমান। এদের অবস্থা অপেক্ষাকৃত ভাল। কারণ এরা অধিকাংশই জোলা বা তাঁতি। নিজস্ব তাঁত খুব অল্প লোকেরই আছে। সুতার যোগান দেয় রাজপুর গ্রামের মহাজনেরা। তৈরি মাল নিয়েও যায় তারা—হাটবাজারে বেচতে। রাজপুর পুরোপুরি মুসলমান গ্রাম। হিন্দু একঘরও নেই। এভাবে মেরুকরণ হয়েছে স্বাধীনতার ঠিক পূর্বযুগে। 1945-এর ভাগলপুর দাঙ্গার পর। অবশ্য তারপর এই দীর্ঘ চারদশক এ অঞ্চলে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা আর হয়নি। ওরা শান্তিতেই বাস করে পাশাপাশি গ্রামে।

জামালুদ্দীনের বাপজান চান্দেরী গাঁয়ের নামকরা লোক : পীরসাহেব। 'পীর' ঠিক নন, তিনি হচ্ছেন প্রাক-স্বাধীনতা যুগের মহা শক্তিধর 'সাঁইপীরের' খাদিম অর্থাৎ সেবক। সাঁইপীরের আজ্ঞাবহ এক জোড়া জিন ছিল ; তাদের মাধ্যমে তিনি অনেক বুজুর্গের মোজেজা দেখিয়ে গেছেন। অর্থাৎ দিব্যশক্তির ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রমাণ। জামালের আব্বাজান তাঁরই খাদিম। দাবি করতেন, পীরবাবা তাঁকে উত্তরাধিকার সূত্রে ঐ জিনজোড়া উপহার দিয়ে গেছেন। সেই সুবাদে আব্বাজান মাথায় রেখেছিলেন পিঙ্গল জটা, পরনে গেরুয়া লুঙ্গি। মুসলমান সমাজের অনেকেই তাঁর ফুঁ-পাড়া পানি, কবচ-মাদুলি নিয়ে যেতেন। সেটাই তাঁর উপার্জন। আব্বাজান সন্ন্যাসী ছিলেন না তা বলে। জামালুদ্দীনের আম্মাজানের বেহেস্ত গমনের আগেই—যখন তিনি শয্যাশায়ী, উত্থানশক্তিরহিতা, তখনই তিনি জামালের বিমাতাকে নিকা করে ঘরে এনেছিলেন। তখন জামালের বয়স আট।

জামাল তাঁর বাপকে শ্রদ্ধা করতে পারেননি কোনদিনই। বাল্যকাল থেকেই তাঁর মনে হত তাঁর রোগজীর্ণা জননী উপেক্ষিতা। বাপের ঐ সব ঝাড়ফুঁক, জলপড়া আর মাদুলি কবচেও তাঁর আস্থা ছিল না। জননীর পরলোকগমনের সঙ্গে সঙ্গে মাকে মাটি দিয়েই সংসার ত্যাগ করেছিলেন জামাল। তখন তাঁর বয়স দশ।

প্রথমে এক ট্রাক-ড্রাইভারের সাগরেদি। পেটচুক্তি—বিনা মাহিনায়, তাঁকে নানান কাজ করতে হত। গাড়ি ধোয়া থেকে ড্রাইভার-সাহেবের দেহে তৈলমর্দন। কয়েক মাসের মধ্যেই সে কাজ ছেড়ে চলে আসেন ভাগলপুরে। একটি মুসলমান হোটেলে ছোকরা চাকরের কাজ করতে। সেখান থেকে চলে আসেন এক উকিলবাবুর মোকামে। অ্যাডভোকেট জলিল সাহেবের বাড়ির চাকর হিসাবে।

এখানেই তাঁর ভাগ্য ফিরে যায়। অ্যাডভোকেট-সাব ওঁর বুদ্ধিসুদ্ধি দেখে চাকরের পদ থেকে উন্নীত করলেন সংবাদবহের পদে—মেসেঞ্জার পিয়ন। অচিরেই উকিলবাবুর নজর হল ঐ নিরক্ষর ছেলেটা নিজের চেষ্টায় হিন্দিটা শিখে ফেলেছে— সে সাক্ষর! জলিলুদ্দীন গুণীর কদর করতে জানতেন, নিঃসন্তান ভদ্রলোক ওঁকে ভালও বেসে

ফেলেছিলেন। কোথাও কিছু নেই একদিন ধেড়ে বয়সে জামালকে স্কুলে ভর্তি করে দিয়ে এলেন। বললেন, তুই লেখা-পড়া শেখ। তোকে আমি উকিল বানিয়ে ছাড়ব।

উকিল অবশ্য হতে পারেননি জামাল-সাহেব—চেষ্টাও করেননি। উনি যেবছর এম. এ. পাস করেন সেবছর বেহেস্তে চলে যান জলিলুদ্দীন অ্যাটর্নি-সাব।

উকিলবাবুর বিষয় সম্পত্তি অবশ্য কিছুই পাননি তিনি। সে-সব দখল করেছে তাঁর রিস্তেদারেরা, আইন মোতাবেক। কিন্তু জামালুদ্দীন তাঁর পালকপিতাকে আজও সমান শ্রদ্ধা করেন। তাঁর প্রয়াণ-তিথিতে আজও জামালসাহেব একদিনের জন্য ছুটি নেন। সমস্ত দিন উপবাস করেন। সূর্যোদয়ের আগে ভাগলপুরের জামা-মসজিদে পৌঁছে যান ফজরের নামাজে যোগ দিতে। ফিরে আসেন সন্ধ্যার নমাজের পর। দিনটি বিকিয়ে দেন মৌনভাবে ঈশ্বর চিন্তায়—'ইত্তেকাফ' করে—ঐ প্রয়াত আত্মার শান্তিকামনায়, শ্রদ্ধাবিনম্র হৃদয়ে।

* * *

বিশ্বনাথকে নিয়ে এলেন বড়িবিবি মহল্লায় নিজের মোকামে। বললেন, বিশু, তুই বাইরের ঘরে নেয়ারের খাটটা পেতে নে। মশারী খাটিয়ে শুয়ে পড়। তোকে খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছে।

বিশ্বনাথ বলে, স্যার, লেখার কী হবে? ওর তো কোথাও ঠাঁই হবে না!

জামালসাহেব বললেন! আল্লাতালার দুনিয়াটা কি এতই ছোট? রসিদ ওকে 'তালাক' দিয়েছে বলে ওর জীবনটাই কিছু বরবাদ হয়ে যায়নি। ওকে বোঝাতে হবে, মনে সাহস ফিরিয়ে আনতে হবে। বাঁচবার সদিচ্ছাটা ওর মনে জাগ্রত করতে হবে। তুই কার কাছে খবর পেলি?

বিশ্বনাথ যা এলোমেলোভাবে বললে তা থেকে এটুকু বোঝা গেল যে, রসিদ যখন জুলেখাকে 'তালাক' দেয় তখন ওরা ছিল রাজপুরে। গ্রামের বাড়িতে। কী একটা উৎসবের ছুটিতে ওরা সবাই গাঁয়ের বাড়িতে গিয়েছিল। সেখানেই—যেটুকু শুনেছে বিশ্বনাথ—জুলেখা কী একটা জঘন্য অপরাধ করে ফেলে। ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে যায়। পুত্রবধূকে তো দৈহিক শাসন করা যায় না—তাই রসিদের বাবা, আলিজান, পাঁচ মেহমানের সামনে রসিদের গালেই বসিয়ে দেয় এক বিরাশি-সিক্কার থাপ্পড়। বলে, হেঁদু মেয়ে সাদি করার সখ মিটেছে? যা — দূর হয়ে যা তোরা দুটোই!...রসিদের সমস্ত আক্রোশটা গিয়ে পড়ে জুলেখার উপর। সে এক উঠোনভর্তি মেহ্‌মানের সামনে তিন তিনবার 'তালাক' উচ্চারণ করে তার স্ত্রীকে বর্জন করে।

—তারপর? এক উঠোনভর্তি মানুষ তারপর কিছু করল না?

—কী করবে? রসিদ ওকে তালাক দেবার পর তো সে আর আলিজান সাহেবের পুত্রবধূ নয়। পরিবারের দৃষ্টিতে সে এক 'বেগানা' মেয়ে। তাই ওরা তাকে বাবুপুর গ্রামে

পৌঁছে দিয়ে আসে।... বাকিটা কাল বলব, স্যার! আমার ভীষণ ঘুম পাচ্ছে। গতকাল দু-চোখের পাতা এক করতে পারিনি।

—ঠিক আছে। তুই শুয়ে পড়।

লাইব্রেরি থেকে বইটা বদলে আনা হয়নি। এত সন্ধ্যা রাতে ওঁর শোওয়ার অভ্যাস নেই। বিশ্বনাথ শুয়ে পড়ার পর উনি বাইরের বারান্দায় একটা ক্যাম্বিসের ইজিচেয়ার পেতে বসলেন। এই বারান্দা থেকে গঙ্গা দেখা যায়। সন্ধ্যা হয়ে গেছে। তবু বেশ কিছু নৌকা ভাসছে মাঝগঙ্গায়। অধিকাংশই মাছমারাদের নৌকা। অনেকে সারারাত নদীতেই থাকবে, পরদিন ভাগলপুর বাজারে টাটকা মাছের জোগান দিতে।

জামালসাহেব বিশ্বনাথের অসমাপ্ত কাহিনীর শেষাংশটা কল্পনায় সম্পূর্ণ করতে থাকেন।

চোখের উপর দেখতে পান : অবগুণ্ঠিতা একটি নতমুখী বালিকাবধূর পিত্রালয় প্রত্যাবর্তনের দৃশ্য। 'বালিকাবধূ' অবশ্য ঠিক বলা যায় না ওকে। স্মৃতিলেখা জহুরা-ফতিমার সহপাঠিনী—তার বয়স আঠারো-বিশ হবেই। তবু মাত্র দু-বছর হল বিয়ে হয়েছে তার। বিবাহিত জীবনের হিসাবে সে দুই বছরের বালিকা—দাম্পত্যজীবনে হাঁটি হাঁটি পা-পা শিখতে গিয়ে আছাড় খেয়ে পড়েছে। রাজপুর গ্রামের আট-দশজন নিশ্চয় ওকে বাসে করে নিয়ে এসেছিলেন বাপের বাড়ি, বাবুপুরে। মাইলতিনেকের দূরত্ব। বাসে অনেকেই হয়তো কৌতূহলী হয়েছিল—একটি স্ত্রীলোক-চোরকে কি সবাই থানায় ধরে নিয়ে যাচ্ছে?...তারপর? বাবুপুর স্টপেজে পৌঁছে হয়তো স্মৃতিলেখাই অবগুণ্ঠনের ভিতর থেকে নিম্নকণ্ঠে বলেছিল, আর আপনাদের আসতে হবে না। আমি নিজের বাড়ি চিনে যেতে পারব!...কিন্তু বাসে করে এতদূর যারা এসেছে তারা কি রাজি হয়েছিল? তামাশাটা না দেখে ফিরে যেতে? 'তামাশা' বইকি! হেঁদু গাঁয়ের বামুনের মেয়ে! প্রেম-মহব্বতের খেল দেখিয়ে বাড়ি ছেড়ে পালালো! বাপ গেলো থানায়—খেদিয়ে দিল বড় দারোগা। সেই বিদ্যেধরী আজ 'তালাক' পেয়ে গাঁয়ে ফিরে এসেছে। বামুনবাড়িতে তার অভ্যর্থনাটা কী জাতের হল সেই তামাশা না দেখে কি ওরা ফিরতে পারে?

তারপর কি মেয়েটি ফিরে আসে ভাগলপুরে?—ছোড়দার কাছে? বিশ্বনাথ দ্বিবেদীর আশ্রয় ভিক্ষা করতে? বিশ্বনাথের স্ত্রী কি ননদকে ঘরে ঢুকতে দিয়েছিল? না কি দোরগোড়া থেকেই হাঁকিয়ে দিয়েছিল?

এভাবে একটি স্নেহাস্পদা ছাত্রীর লাঞ্ছনার কাল্পনিক দৃশ্য মনে মনে আঁকতেও খারাপ লাগল। উনি উঠে চলে গেলেন গঙ্গার ধারে।

* * *

পরদিন সকালে উঠেই বিশ্বনাথ তাড়াহুড়ো করে হাসপাতালে চলে গেল। নাস্তাপানি

না সেরেই।

চৌধুরী-সাহেব পীড়াপীড়ি করলেন না। বিশ্বনাথের আপত্তির হেতুটা তিনি বুঝে উঠ্‌তে পারলেন না। উগ্রক্ষত্রিয় বংশের এক সহপাঠিনীকে বিবাহ করেছে বলেই সে যে তার 'বামনাই-মৌলবাদের' সম্পূর্ণ ঊর্ধ্বে উঠতে পেরেছে তার প্রমাণ এখনো পাননি। কাল মিষ্টান্ন ভাণ্ডারে এক টেবিলে খাওয়া অথবা সহোদর ভগ্নীকে বাড়িতে ঠাঁই দিতে চাওয়ার কথা জানা থাকা সত্ত্বেও।

কিছু পরীক্ষার খাতা দেখার কাজ বাকি ছিল। সারাটা দিন তাতেই কেটে গেল। আজকের দিনটাও বর্ষণমুখর। বর্ষা ক্রমে জাঁকিয়ে নামছে। বিকেলের দিকে বৃষ্টিটা ধরল—বিদায়ী সূর্য একবার মুখ দেখালেন পশ্চিমাকাশে। ঘড়ি দেখলেন চৌধুরী-সাহেব। চারটে বাজে। ছাতাটা নিয়ে রওনা হয়ে পড়লেন। হাসপাতালের দিকে।

প্রথমেই গেলেন ডক্টর কুমারের কাছে। শুনলেন, রোগিণীর জ্ঞান ফিরেছে। বিপদের আশঙ্কাও আর কিছু নেই। তবে দুর্বল খুব। আরও দু-চারদিন হাসপাতালে রাখা হবে। কোন নতুন উপসর্গ না হলে বুধবার সকালে ওকে বাড়ি যেতে দেওয়া যেতে পারে।

চৌধুরী জানতে চাইলেন, ওকে হাসপাতালে নিয়ে এসেছিল কে? ভর্তিই বা করালো কে? তার চেয়ে বড় কথা, জেনারেল ওয়ার্ডে না রেখে ওকে তোমরা দেখছি ফিমেল ওয়ার্ডের কেবিনে রেখেছ। খরচটা কে দিচ্ছে?

ডক্টর কুমার বললেন, তা তো জানি না, স্যার! আমার জানার কথাও নয় অবশ্য। আমার কোন কৌতূহলও হয়নি।

—কিন্তু আমার হয়েছে, কুমার। তুমি কি খবরটা আমাকে জানাতে পার?

—শিওর!

এমার্জেন্সিতে ফোন করলেন। তারা বলতে পারল না। রিসেপশনেও নয়। কুমার বললেন, একটু বসুন, স্যার। আমি জেনে এসে আপনাকে জানাচ্ছি। চা-য়ের কথা বলি?

—না, থাক। চা আমি দিনে দুবারই খাই।

—আমার উপর রাগ করে বলছেন না তো?

—না। রাগ করব কেন? ও বুঝেছি! সেই তোমার কালকের কথায়? না। কুমার। সে জন্য আমি রাগ করিনি। যাও, জেনে এস। আমি অপেক্ষা করছি।

ডক্টর কুমার মিনিটদশেকের মধ্যেই ফিরে এলেন। বললেন, এমার্জেন্সির রেকর্ড অনুযায়ী ওকে অজ্ঞান অবস্থায় সাইকেল রিকশা করে পৌঁছে দিয়ে যায় পাড়ার লোক। একজন নাম-ঠিকানা-বয়স ইত্যাদি জানায়। কেবিনভাড়াও সে অগ্রিম দিয়ে গেছে সাতদিনের।

—কী নাম লোকটার?

—রসিদ আহমেদ।

—আই সি! কে হয় সে জুলেখার?

—না, সম্পর্ক কিছু নেই। প্রতিবেশী বোধহয়।

—তাহলে খুব উদার প্রতিবেশী বলতে হবে! অতগুলো টাকা! লোকটা আর আসেনি খোঁজ নিতে? তার প্রতিবেশিনী বাঁচল কি মরল জানতে?

ডক্টর কুমার মেদিনীনিবদ্ধ দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ কী যেন ভেবে নিয়ে বললেন, লোকটার উপাধি আহ্‌মেদ! তার মানে কি রোগিণীর প্রাক্তন স্বামী?

চৌধুরী-সাহেব উঠে দাঁড়ালেন। বললে, আমার তাই মনে হয়। যাকে ভালবেসে বিয়ে করা জুলেখার জীবনের সবচেয়ে বড় ভ্রান্তি বলে মনে কর তুমি! মনে হয় সেই ছেলেটিই।

ডক্টর কুমার কোন জবাব দিলেন না। চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন।

চৌধুরী জানতে চাইলেন, 'নো ভিজিটার্স' বোর্ডটা কি এখনো টাঙানো আছে ওর ঘরে? না হলে একটু দেখা করে যেতাম।

—না, স্যার। আজ পেশেন্ট ভালই আছে। যান, দেখা করে আসুন। তবে ওকে বেশি কথাবার্তা বলতে দেবেন না। ওর শরীর এখনো দুর্বল! আপনি নিজেই বেশি কথাবার্তা বলবেন।

—থ্যাঙ্কস, ডক্টর।

সিঁড়ি বেয়ে উঠে এলেন দ্বিতলে। চিহ্নিত কেবিনের সামনে থমকে দাঁড়ালেন। মনে হল ঘরের ভিতর একজন দর্শনার্থী ইতিপূর্বেই প্রবেশ করেছে। নিশ্চয় বিশ্বনাথ। উনি ইতস্তত করছিলেন। হঠাৎ কানে গেল রোরুদ্যমানা একটি স্ত্রীলোকের কণ্ঠস্বর : "কেন? কেন? কেন? এভাবে বাঁচিয়ে তুললেন আমায়? কে বলেছিল দয়া দেখাতে? আমি তো সুযোগ পেলেই আবার বিষ খাব। অনর্থক এভাবে টাকা নষ্ট করতে কে বলেছিল আপনাকে?"

চৌধুরী-সাহেব নিজেকে সংশোধন করলেন। সম্ভবত বিশ্বনাথ নয়, ঘরের ভিতর যে আছে, তার নাম 'রসিদ আহমেদ'। তার কণ্ঠস্বর শোনা গেল না কিন্তু। বরং পরক্ষণেই চমকে উঠলেন জুলেখার তীব্র তিরস্কারে : ছিঃ! আমাকে ছুঁয়ো না তুমি! তুমি না মুসলমান? জান না। 'তালাক' দেবার পর তুমি আমার কাছে পরপুরুষ!

চৌধুরী-সাহেব মনস্থির করলেন। হাফ-সুইং ডোর ঠেলে ভিতরে যেতে চাইলেন। এ জাতীয় উত্তেজনা রোগিণীর স্বাস্থ্যের পক্ষে মারাত্মক। কিন্তু তার পূর্বেই তাঁকে ঠেলে ঘরের ভিতর ঢুকে গেলেন একজন সিনিয়ার নার্স। সম্ভবত জুলেখার উচ্চকণ্ঠ শুনেই তিনি ছুটে এসেছেন। তিনিও পুরুষটিকে ভর্ৎসনা করলেন, আপনার কোন কাণ্ডজ্ঞান নেই? বলে গেলাম না যে, ওঁকে উত্তেজিত করবেন না? যান, বাইরে যান। আমি ওঁকে ঘুমের

ইন্‌জেকশান দেব।

পরমুহূর্তেই নতমস্তকে কেবিন থেকে বার হয়ে এল বছর ত্রিশের একজন স্বাস্থ্যবান নওজোয়ান। বিশ্বনাথ বলেছিল ও ভাল ফুটবল খেলত। এখন নিশ্চয়ই খেলে না। কিন্তু শরীরে একবিন্দু মেদ জমেনি। ছয় ফুটের মতো লম্বা। পরনে প্যান্ট আর বুশশার্ট।

কেবিন থেকে বের হতেই চৌধুরী বললেন, প্লিজ, মিস্টার রসিদ আহ্‌মেদ! আপনার সঙ্গে দু-একটা খুব জরুরী কথা ছিল।

রসিদ ওঁকে আপাদমস্তক দেখে নিয়ে বললে, এক্সকিউজ মি, স্যার। আপনার সঙ্গে আমার পরিচয় আছে বলে তো মনে পড়ছে না?

—না নেই। আমার নাম ডক্টর জামালুদ্দীন চৌধুরী। আমি তেজনারায়ণ জুবিলি কলেজে ইংরেজির অধ্যাপক। স্মৃতিলেখা, আইমিন জুলেখা, আমার ছাত্রী ছিল। ওর দাদা বিশ্বনাথ দ্বিবেদীও আমার প্রাক্তন ছাত্র।

—ও বুঝেছি! আদাব। আপনি কি জুলেখার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন?

—তাই এসেছিলাম। কিন্তু নার্স ওকে এখন ঘুমের ইন্‌জেকশান দিচ্ছেন—ওকে এখন ডিসটার্ব করব না। আপনি যদি কাইন্ডলি.....

—আমার সঙ্গে আপনার কী প্রয়োজন?

—সেটা ব্যাখ্যা করার উপযুক্ত স্থান কি এই হাসপাতালের ফিমেল ওয়ার্ড?

—অলরাইট। আসুন। আমরা নিচে যাই।

নেমে এলেন দুজনে। হাসপাতালের সামনে লোকজনের ভিড়। ভিজিটিং-আওয়ার্স চলছে। মানুষজন আসছে-যাচ্ছে। মেওয়াওয়ালা, ডাবওয়ালা এমন কি ফুচকা বাটাটাপুরির অস্থায়ী দোকান। এখানে কথাবার্তা হতে পারে না। সামনের মিষ্টান্ন ভাণ্ডারেও যেতে চাইলেন না আজ। রাস্তাটা পার হয়ে একটা পার্কে ঢুকলেন। বৃষ্টিতে কিছু কিছু জল জমেছে। তবে বিদায়ী সূর্যের শেষ আশীর্বাদে পার্কের বেঞ্চিগুলো আর ভিজে নেই। ঘটনাচক্রে একটি খালি পাওয়া গেল। দুজন গিয়ে বসলেন। রসিদ আহ্‌মেদ বললে, এবার বলুন? কী জানতে চাইছিলেন?

—যে কোন কারণেই হোক আপনি আপনার ভূতপূর্বা স্ত্রীকে 'তালাক' দিয়ে দিয়েছেন। শরিয়তী কানুনে জুলেখা এখন আপনার কাছে একজন নিঃসম্পর্কিতা 'মহিলা'। আপনি জানেন, মাত্র দুবছর আগে যে মেয়েটি মুসলিম ধর্ম গ্রহণ করেছে সেই মেয়েটির ঐ কথাটা কী পরিমাণে মর্মান্তিক সত্য! ওর চোখে আপনি পরপুরুষ। তবু মনে হচ্ছে, নির্জন কেবিনে আপনি ওর হাত ধরেছিলেন....

—আপনি কি সেজন্য আমার কাছে কৈফিয়ৎ তলব করছেন?

—করলেও সেটা অন্যায় হত না। একজন মুসলমান হিসাবে, একজন ভারতীয়

নাগরিক হিসাবে আমার কর্তব্য দেখা যে, কোন ভারতীয় নারীর দেহ তার অনিচ্ছায় কোন পরপুরুষ যাতে স্পর্শ না করে! কিন্তু সে প্রশ্ন আমি তুলছি না। আমি একথাও জানতে চাইছি না—জুলেখার কোন্ অপরাধে আপনি তাকে এতবড় মর্মান্তিক শাস্তি দিলেন—একথা জেনেও যে, সেই কট্টর হেঁদুর হতভাগিনী মেয়েটার এ দুনিয়ায় আর কোথাও দাঁড়াবার ঠাঁই নেই।

—তবে কী জানতে চাইছেন আপনি?

—ঠিক যে কথা পাঁচমিনিট আগে জানতে চেয়েছিল জুলেখা! কেন ওকে হাসপাতালে নিয়ে এলেন? কেন কেবিন ভাড়া অগ্রিম জমা দিলেন? কেন ওকে শান্তিতে মরতে দিলেন না?

রসিদ রুখে ওঠে, ও মরলেই কি আপনি খুশি হতেন?

—আমি হতাম কি না সেটা প্রশ্ন নয়, মিস্টার আহ্‌মেদ। জুলেখা হত। তার সব জ্বালা-যন্ত্রণা নিমেষে জুড়িয়ে যেত। একজন স্পোর্টসম্যানের জীবনসঙ্গিনী হবার সৌভাগ্য লাভ করেছিল যে মেয়েটি, তাকে বাকি জীবন ফুটপাতের ধারে বসে ভিক্ষা চাইতে হত না। এটা কি কম বড় প্রাপ্তি?

রসিদ মাথা নিচু করে কী যেন ভাবল। তারপর বলল, আপনি আন্দাজ করতে পারেন, ও কতবড় অপরাধ করেছিল?

—না, পারি না। সে কথা আমি শুনতেও চাই না। নিশ্চয় খুবই গুরুতর অপরাধ। শুনেছি, সে জন্য পাঁচ মেহ্‌মানের সম্মুখে আপনার আব্বাজান আপনার গায়ে হাত তুলেছিলেন। এবং আপনি হিতাহিতজ্ঞানশূন্য হয়ে স্ত্রীকে 'তালাক' দিয়েছিলেন। তার অপরাধটা কী, আমি জানতে চাই না, আমার কোন কৌতূহল নেই। দ্যাটস্ এ ক্লোজড চ্যাপটার! সে অন্যায় করেছে, আপনি শাস্তি দিয়েছেন। ব্যস!

—তাহলে কী আপনার জিজ্ঞাস্য?

—আগেই তা বলেছি। জুলেখার উত্থাপিত প্রশ্নটার জবাব আপনি তাকে দিয়ে আসেননি। সেটা আমাকে বলুন। ও একটু ভাল হলে ওকে আমি জানিয়ে দেব। এজন্যই আপনাকে এই একান্তে ডেকে এনেছি।

রসিদ উঠে দাঁড়ায়। বলে, তার দরকার হবে না, প্রফেসর-সাহেব! সেটা সুযোগমতো আমিই জুলেখাকে জানিয়ে দেব।

চৌধুরীও উঠে দাঁড়ান। জোরের সঙ্গে বলেন, না! নো! অ্যান্ এম্‌ফ্যাটিক : নো! আমি আপনাকে সাবধান করে দিচ্ছি, মিস্টার রসিদ আহ্‌মেদ! আপনি আমার ছাত্রীর সঙ্গে ভবিষ্যতে কোনদিন দেখা করতে আসবেন না। একান্তে কোনও কথা বলার চেষ্টা করবেন না। সেটা শরিয়তি কানুন বিরুদ্ধ। আমি আপনাকে আবার সাবধান করে দিচ্ছি।

আমি ভাগলপুর জামা-মসজিদের বড়া-ইমাম মৌলানা নাসিরুদ্দীন আফান্দির কাছে আপনার নামে ফরিয়াদ আনব। শরিয়তি কানুনে আপনার কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করব!

—আপনি কি আমাকে ভয় দেখাচ্ছেন?

—নিশ্চয় নয়। আপনি মস্ত অ্যাথলেট। অসীম আপনার দৈহিক ক্ষমতা! ভয় দেখাব কেন? তবে টি. ভি. সিরিয়ালের ঐ টিসম্‌টিসম্‌ মারপিট নয়—জামা মসজিদের বড়া ইমামের শরিয়াতি ' নসিহত'-কে যদি ভয় করেন তাহলে—আবার আপনাকে সাবধান করে দিচ্ছি : আপনার প্রাক্তন স্ত্রীর সঙ্গে যোগাযোগের কোন চেষ্টা করবেন না। আপনি যদি চান, কলেজে আমার সঙ্গে দেখা করবেন। কেবিনভাড়া আপনি যা দিয়েছেন তা আমি ইন্‌স্‌টল্‌মেন্টে শোধ করে দেব। আমার আর্থিক সঙ্গতি অল্প। অনেক দান-খয়রাত করতে হয় আমাকে। তাই একলপ্তে এতগুলো টাকা দিয়ে দিতে পারব না।

নতমস্তকে রসিদ অনেকক্ষণ কী ভাবল। তারপর বলল, আগামী সপ্তাহে ওকে হাসপাতাল থেকে রিলিজ করে দেবে। ওকে কীভাবে রিহ্যাবিলিটেট করা যায় তা কি আপনি ভেবেছেন, প্রফেসর চৌধুরী?

—দ্যাটস্‌ নান্‌ অব্‌ য়োর বিজনেস!

তিন

সাতদিন পরের কথা। এ সাতদিনে ভাগলপুরের গঙ্গা দিয়ে অনেক জল সমুদ্রের দিকে চলে গেছে। আবার গাঙ্গেয় উপত্যকার ছোটখাটো নদীপথে বর্ষার জলধারা এসে জমেছে গঙ্গায়। মা গঙ্গা ভাদ্রে প্রতিবছর কূলছাপিয়ে শহরে ঢুকে পড়েন। দু পাশের গ্রাম বন্যার জলে ভাসতে থাকে। আশ্বিনের সেই অভিশাপ অন্তর্হিত হয়ে গেলে দেখা যায় ধানের জমিতে মা গঙ্গার পলিমাটির আশীর্বাদ। এ খেলা চলেছে স্মরণাতীত কাল ধরে।

বিশ্বনাথের স্ত্রী রত্না ফিরে এসেছে বাপের বাড়ি থেকে। ফলে বিশ্বনাথ দ্বিবেদী আর অনিকেত নয়। ননদের ঝামেলা ওকে সইতে হবে না এ কথা জানতে পারার পর রত্না তার মরদকে মাফ করে দিয়েছে। একরাত হাসপাতালে দু-রাত জামাল-স্যারের বাড়িতে বাস করে সে চলে গিয়েছিল শ্বশুরবাড়ি। শ্বশুরমশাই একটু ধমকের সুরেই বলেছিলেন, বাবাজীবন, তোমার নষ্টা ভগ্নী যে পাপ কাজ করেছে তার জন্য তুমি কেন নিজের জাত খোয়াতে বসেছিলে, বল তো? যে মেয়ে কুলত্যাগিনী তার তো ঐ রকম পরিণাম হবেই! রত্না তো বুদ্ধিমতীর মতো কাজ করেছে—ঘরে তালা দিয়ে সোজা আমার কাছে চলে

এসেছে।

বিশ্বনাথ 'রাম-গঙ্গা' কিছুই বলেনি। মেয়ে-বউকে নিয়ে বাড়িতে ফিরে এসেছে। দরজার সামনে পড়ে আছে তিনদিনের খবরের কাগজ আর পলিথিন ব্যাগে টকে-যাওয়া দুধ। মেঝেতে ধুলোর আস্তরণ। সারাটা দিন গেল সাফ করতে। সুযোগমতো রত্না জানতে চাইল—শেষ পর্যন্ত লেখা গেল কোথায়? নাকখৎ দিয়ে শ্বশুরবাড়িতেই তো?

বিশ্বনাথ বললে, না। মুসলমান মেয়েদের দুর্ভাগ্য তাদের হেঁদু বহিনদের চাইতে কিছু বেশি। আমাদের ঝগড়া হয়, মিটমাটও হয়—ওদের একবার তালাক হয়ে গেলে তার ফেরার পথ থাকে না। ওর 'শ্বশুরবাড়ি' বলে এখন কিছু নেইই। ও সেখানে যাবে কী করে?

—তাহলে? বাবুপুর থেকে তো ঝাঁটালাথি খেয়ে ফিরে এসেছে। তাহলে লেখা গেল কোথায়? হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাবার পর?

বিশ্বনাথ গম্ভীর হয়ে বললে, ঐ হাসপাতালের সামনেই ফুটপাতে বসে গেছে।

—ফুটপাতে বসে গেছে! সেখানে বসে কী করছে?

—নষ্টা, কুলত্যাগিনী মেয়েরা অন্তিমে যা করে — ভিক্ষে!

রত্না পুরো দশ সেকেন্ড তার স্বামীর দিকে নির্নিমেষ তাকিয়ে রইল। বুঝতে পারল না — ও সত্য বলছে না বানিয়ে। একটু নরম সুরে বললে, অমন করে বলছ কেন? মোছলমানকে বিয়ে করেছে, জাত দিয়েছে — 'নষ্টা' সে হতে যাবে কেন?

—কথাটা তোমার বাবাকে বুঝিয়ে বল। বিশেষণটা তিনিই প্রয়োগ করেছিলেন প্রথম। আমি গুরুজনের কথা 'রিপিট' করছি শুধু।

রত্না বুদ্ধিমতী। বুঝে নিল, বর্তমান পরিস্থিতিতে এ নিয়ে আর বেশি ঘাঁটাঘাটি করা ঠিক নয়। ননদিনী হতচ্ছাড়ির শেষ গতিটা কী হল তা দুদিন পরেই জানা যাবে। বিশ্বনাথ নিজে থেকেই বলবে। আপাতত ও প্রসঙ্গটা চাপা দেওয়াই সুবুদ্ধির পরিচায়ক। তিন দিন বিরহের পর ঐ মর্মান্তিক বিষয় নিয়ে আর আলোচনা করা ঠিক নয়। সে গা ধুতে গেল।

* * *

জুলেখা চিনতে পেরেছিল দর্শনমাত্র। আদাব জানিয়ে বলেছিল, ছোড়দা ও বেলা বলে গেছিল ও বৌদিকে আনতে যাবে। বিকালে আসবে না। আরও বলেছিল, আপনি আসবেন আজ, আমার সঙ্গে দেখা করতে।

—জহুরা বা ফতিমা আর আসেনি?

—হ্যাঁ, ওরাও এসেছিল কাল। অনেক গল্প করল কলেজের।

জামাল-সাহেব বলেন, তোমার ছোড়দা বুঝি আজ তোমার ভাবীকে আনতে গেছে? বেচারির খুব ভোগান্তি গেল কদিন, সদর দরজার চাবি না থাকায়। এক-পোশাকে—না

স্নান, না মুখ ধোওয়া—

জুলেখা আজ পিঠে বালিশ দিয়ে আধশোয়া হয়ে বসেছে। মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললে, হ্যাঁ ছোড়দা বলছিল ওর পকেটে পয়সাও তেমন ছিল না। আপনার বাড়িতে আশ্রয় না পেলে ওকে খুবই আতান্তরিতে পড়তে হত....

—কেন? সোজা শ্বশুরবাড়িতে চলে গেলেই পারত। ওর স্ত্রী তো আর ওকে 'তালাক' দিয়ে যায়নি!

জুলেখা জবাব দিল না।

চৌধুরী-সাহেব একটু অপেক্ষা করে বললেন, মিস্টার আহমেদের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে। কিছু কথাও হয়েছে।

জুলেখা চমকে ওঠে। অবাক হয়ে তাকায়। জানতে চায়, কবে? কোথায়?

—ও যেদিন তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। তুমি ওকে একটা প্রশ্ন করেছিলে: কেন সে তোমাকে বাঁচালো। ও জবাব দেবার সুযোগ পায়নি। মেট্রন এসে ওকে ঘর থেকে বার করে দেন....

—আপনি কেমন করে জানলেন?

—আমি দরজার বাইরেই অপেক্ষা করছিলাম। মিস্টার আহমেদ আমাকে প্রশ্ন করেছিলেন, তোমাকে হাসপাতাল থেকে রিলিজ করে দেবার পর তুমি কোথায় যাবে!

জুলেখা বালিশঢাকাটা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে বললে, আপনি কী বললেন, স্যার?

—আমি বলেছিলাম, 'দ্যাটস্ নান্ অব য়োর বিজনেস্।' ঠিক বলিনি?

জুলেখা সে প্রশ্নের জবাব দিল না।

একটু অপেক্ষা করে বললেন, তুমি কিছু বলছ না যে, জুলেখা? আমি ঠিক বলিনি?

—হ্যাঁ, তা তো বলেছেন। কিন্তু প্রশ্নটার পুরোপুরি জবাব তো ওটা হল না। তার কোন অধিকার নেই ও বিষয়ে প্রশ্ন করার। কিন্তু আমার কাছে যে সেই চিন্তাটাই.....

বাধা দিয়ে জামাল-সাহেব বললেন, শোন লেখা! আমি নিজে বিয়ে-সাদি করিনি। তাই যখনই দেখি কোথাও দাম্পত্যকলহ চরমে উঠেছে তখন একটাকে ধরে নিয়ে আমার বাড়ি আটক করি। রত্না-বিশ্বনাথের দাম্পত্যকলহ মিটেছে। এখন আমি এসেছি তোমাকে নিয়ে যেতে।...না, না, তুমি অমন করে আমার দিকে তাকিও না, জুলেখা। আমি তোমাকে কিন্তু অযাচিত দান-খয়রাত করছি না। আমি দুনিয়ায় একা—এক্কেবারে একা। বাবা-মা-ভাই-বোন—কেউ নেই আমার। এক কাপ চা খাওয়ার ইচ্ছে হলে আমাকে উঠে গিয়ে বানাতে হয়। তুমি আমার সংসারে গিয়ে থাকবে? ছোটবোনের অধিকারে? আমাকে রেঁধে খাওয়াবে, আমার ঘরদোর সাফা রাখবে, আমার ইলেকট্রিক বিল জমা দিয়ে আসবে। সব, স—ব কাজ তোমাকে দিয়ে করাব আমি। তোমাকে আমি দয়া দেখাচ্ছি

না। তুমিই আমাকে দয়া করছ—কারণ মা-মাসি-বৌদি-ছোটবোন—বড় হয়ে আমি কখনো কোন স্ত্রীলোকের ভালবাসা পাইনি। তুমি আমার সেই অপূর্ণতা পূর্ণ করে দেবে? আসবে লেখা? আমার নুন্নিমুন্নি বোন হয়ে।

জুলেখা স্তব্ধ বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকল। ওর চোখ দুটো জলে ভরে এল। ওর মনে হল, কী আন্তরিক ওঁর কণ্ঠস্বর! অস্ফুটে বললে, সারাটা জীবন?

—নিশ্চয় নয়। তোর কী বয়েস? আমার কাছে পড়তে আসে অনেক ছেলে, তাদের কেউ তোকে পছন্দ করলে, তাদের কাউকে তুই পছন্দ করলে, আমি চেষ্টা করে দেখব। একজন অন্যায় ভাবে তোকে তালাক দিয়েছে বলেই তোর জীবনটা কিন্তু বরবাদ হয়ে যায়নি।

নতনেত্রে জুলেখা বললে, না, স্যার! ও আমাকে অন্যায়ভাবে তালাক দেয়নি। আমার অপরাধটাও ছিল ক্ষমার অযোগ্য। আপনার কাছে স্বীকার করব। আপনি আলিম, আপনি নূর মহম্মদের খাদিম : মনে করুন এ আমার তওবা। খ্রীস্টানদের কনফেশনের মতো।

জামালুদ্দীন বলেন, কী প্রয়োজন? আমি সেই বেদনাদায়ক কাহিনীটা শুনতে চাইনে। আমি না শুনেই মেনে নিচ্ছি অপরাধটা ছিল অত্যন্ত গুরুতর। নইলে তোর শ্বশুর, আলিজান সাহেব, পাঁচ মেহেমানের সামনে উপযুক্ত পুত্রকে চাপটাঘাত করতেন না; আর রসিদও আত্মজ্ঞান হারিয়ে তোকে তালাক দিত না।

জুলেখা নতনেত্রে বললে, প্রয়োজনটা আপনার নয়, স্যার। প্রয়োজনটা আমার। আপনি নিষ্ঠাবান মুসলমান—রোজা-নামাজ করেন—আল্লাতালার মুবারকীতে সামান্য ট্রাক ড্রাইভার থেকে কলেজের অধ্যাপক হয়েছেন। আপনিই তো দেবেন আমাকে পথের নির্দেশ। বুঝিয়ে বলবেন—কী আমার অপরাধ, কেন এটা অপরাধ। শাস্তি আমাকে দেওয়া হয়েছে—নির্বাসন দণ্ড ; তার পরিবর্তে আমি মৃত্যুদণ্ড বেছে নিয়েছিলাম ; কিন্তু এই বিচারে আত্মপক্ষসমর্থনে আমার কিছু বলার আছে কি না কেউ তা কোনদিন জানতে চাইবে না? আপনিও না?

জামাল বলেন, বেশ বল্। কী বলতে চাইছিলি?

* * *

আলিজানের মটোর রিপেয়ারিং গ্যারেজটা মশল্লাচকের শেষ প্রান্তে, বড়রাস্তার ধারে। নানান জাতের গাড়ির মেরামতির কাজ হয়। রঙ হয়, আপ্‌হোলসট্রির কাজ হয়, এমনকি ইঞ্জিন রিবোরিঙের কাজও হয়। সে কাজটায় রসিদ আহমেদ আলিম। নিখুঁতভাবে সিলিন্ডারের মাপ রিঙের মাপের সঙ্গে মিলে যায়। স্টার্ট দিলে মনে হয় নতুন গাড়ি। একটু শব্দ নেই, একটু ঝাঁকি নেই। আলিজানের গ্যারেজের সুনাম এতদূর ছড়িয়ে পড়েছিল যে, সুলতানগঞ্জ, মুঙ্গের অথবা পাটনা থেকেও লোকে এঞ্জিন খুলে এখানে রিবোরিঙ

করতে পাঠাতো!

বাপ-বেটা ভাগলপুরেই থাকত। জুলেখা থাকত গ্রামের বাড়িতে। রসিদের দাদা রহমৎ সেখানে সংসারের কর্তা। ওদের কিছু জমি ছিল। ভাগে চাষ করাতো। রসিদ প্রতি শনিবার রাত্রে গ্রাম আসত, সোমবার ভোরে ভাগলপুরে ফিরে যেত। রহমতের দুই বিবি, তিন-চারটি সন্তান। জুলেখাই তাদের দেখ্‌ভাল করত। পাক্‌ঘরের দায়িত্বটা তার ছিল না। তবে রহমতের এক জোড়া মোষ আর একজোড়া বলদের দেখভাল করতে হত জুলেখাকে। রহমতের দ্বিতীয়া বিবি সাইদার ছোট বাচ্চাটা মায়ের বুকের দুধ খাওয়া ছেড়ে দেবার পর রহমৎ একটি এঁড়ে বাছুর সহ দুধেলা গাই কিনে এনেছিল পাঁচশ টাকায়। বুধবারে গাইটার জন্ম হয়েছিল বলে তার নাম 'বুধি'। বাছুরটাও নাকি জন্মেছে বুধবারে। তাই জুলেখা তার নাম দিয়েছিল 'বুদবুদ'। বুধির বাচ্ছা বুধে জন্মেছে বলে। কুমারী জীবনেও দ্বিবেদী-বাড়িতে তাকে গো-মাতার সেবাযত্ন করতে হয়েছে। গরু-মোষকে সে ভয় পায় না। কিশোরী বয়সে—মায় কলেজে ভর্তি হয়েও—ও ঘুম ভেঙে উঠে পড়ত ভুক্কো তারা ডোবার আগে। গো-মাতার সেবা সমাপ্ত করে—গো-দোহন করে, সবাইকে জাব্‌না মেখে দিয়ে তবে যেত স্নান করতে। দুটো নাকে-মুখে গুঁজে ছুটতো নয়টা আটান্নোর ভাগলপুর-মুখো বাস ধরতে।

ফলে শ্বশুরবাড়িতে এসে গো-সেবায় অসুবিধা হয়নি তার। প্রথম প্রথম মোষ-জোড়াকে একটু ভয় পেত। ক্রমে তাও সহে গেল। গোয়ালের সব জন্তুই নতুন মানুষটার পোষ মানল। সবচেয়ে বেশি বুদবুদ। ওর বোধহয় নতুন শিং ওঠার জন্য মাথা চুলকাতো। জুলেখার নিতম্বদেশটি ঢুঁ মারার প্রশস্ত স্থান মনে করত সে। থাপ্পড়ও খেত সেজন্য।

তারপর বিনা মেঘে বজ্রাঘাত। জুলেখা জানতে পারল। রহমৎ সবৎস গাভীটিকে ক্রয় করেছিল আগামী উৎসব দিনের কথা স্মরণে রেখে। বুধির দুধও ক্রমে ফুরিয়ে আসছে। আগে যেখানে দিনে সাত-আট সের দুধ দিত, এখন সেখানে দু-বেলায় দেড় সের হয়--কি-না-হয়। আশ্বিনের প্রথম সপ্তাহে চান্দ্র মাসের হিসাবে পড়ছে জউল-হিজ্জহ মাসের দশম দিন—যে দিনটিকে বলা হয় ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উৎসব : ঈদ-উল্‌-অব্বহা। এই দিনে আমন্ত্রিত হয় নিকটআত্মীয়েরা, রিস্তেদারেরা, ধনাঢ্য ব্যক্তির মোকামে। সংলগ্ন কোন চিহ্নিত উন্মুক্ত প্রান্তরে—তার একটি বিশেষ অভিধা আছে—'ঈদগাহ্‌'—সেখানে ধার্মিক মুসলমানেরা সমবেত হন। প্রার্থনার সূত্রপাত হিসাবে ইমাম দুটি রাকাহ্‌ বা শ্লোক আবৃত্তি করেন এবং প্রার্থনান্তে খুৎবা বা ভাষণ দান করেন। এই ভাষণে ইমাম ঈশ্বরের মাহাত্ম্যের সঙ্গে কুরবানির তাৎপর্যটা বুঝিয়ে দেন। খুৎবা সমাপ্ত হলে সমবেত সবাই ঈদ্‌গাহ থেকে আমন্ত্রণকর্তা ধনবান ব্যক্তির গৃহে সমবেত হন। পরিবারের কর্তা তারপর একটি ভেড়া অথবা গরু, কিংবা ছাগল বা, উট

বলি দেন। পশুটিকে মক্কার দিকে মুখ করে বলিদান করা হয়। শরিয়তি রীতিতে হালাল করা পশুটির মাংস তিনভাগে বিভক্ত করা হয়। একভাগ প্রদান করা হয় আমন্ত্রিত মেহ্‌মানদের। এক-তৃতীয়াংশ রবাহূত দরিদ্রদের, বাকি এক-তৃতীয়াংশ গৃহস্বামীর।

উৎসবের আগের সপ্তাহে জুলেখা নিতান্ত ঘটনাচক্রে জানতে পারল আগামী সপ্তাহে উৎযাপিত হবে 'বকরহ্‌ ঈদ' বা 'কুরবান ঈদ'। আর কুরবানি করা হবে ঐ বুদবুদকে!

এটা সহ্য করতে পারল না প্রাক্তন স্মৃতিলেখা দ্বিবেদী। সে গোপনে তার স্বামীকে সনির্বন্ধ অনুরোধ করল বুদবুদের পরিবর্তে একটি বড় পাঁঠা কিনে আনতে। তার হাতে ধরল, পায়ে ধরল। রসিদ রাজি হল না। রসিদের যুক্তি অকাট্য : পাঁঠার মৃত্যুযন্ত্রণা কি বাছুরের চাইতে কম?

জুলেখা বোঝাতে চেয়েছিল, না! কিন্তু আমার যদি কোন সন্তান থাকত তবে তার মৃত্যুযন্ত্রণা অন্তত আমার চোখে বিশ্বের আর যে কোন শিশুমৃত্যুর চেয়ে বেশি শোকাবহ! 'বুদবুদ'কে আমি যে অ্যাতটুকু বয়স থেকে....

রসিদ বলেছিল, মুসলমান ধর্মে যখন দীক্ষা নিয়েছ, মুসলিমের জরু হয়েছ, তখন ওসব হেঁদু সেন্টিমেন্ট তোমাকে ত্যাগ করতে হবে। একথা আমার সামনে দ্বিতীয়বার উচ্চারণ কর না। তাতে গুনাহ্‌ হয়।

সোমবার সকালে আলিজান আর রসিদ ভাগলপুরমুখো রওনা হবার সঙ্গে সঙ্গে জুলেখা বুধি আর বুদবুদকে দড়ি খুলে নিয়ে ঈদগাহ্‌ মাঠের ওপ্রান্তে চলে যায়। ঈদগাহ্‌ মাঠটাই দুই ধর্মীয় সম্প্রদায়ের সীমানা। ওদিকে হিন্দু পল্লী। মহেশ্বরপ্রসাদ তেওয়ারি গ্রামের একজন ধনবান মাতব্বর। তাঁর কন্যাটি জুলেখার সঙ্গে একসঙ্গে ভাগলপুর কলেজে এককালে পড়তে যেত—এক বাসেই যেত—তাই ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব। বকরহ-ঈদের ছুটিতে সে বাড়িতেই ছিল। জুলেখা সব কথা খুলে বলে। গোহত্যা বন্ধ করতে মহেশ্বরপ্রসাদ এককথায় নগদ হাজার টাকা দিয়ে জুলেখার কাছ থেকে বুধি আর বুদ্‌বুদকে কিনে নেন। পাকা রসিদও সংগ্রহ করে রাখেন।

উৎসবের আগের দিন রসিদ আর আলিজান পাঁচ রিস্তেদার সহ এসে উপস্থিত হল গ্রামে। পরদিন বকরহ্‌-ঈদ। এতক্ষণ সব জেনেবুঝেও রহমৎ কিছু বলেনি। যার গরু সে অপেক্ষা করছিল যার জরু তার আগমনের।

বাকি ঘটনা জামাল, সাহেবের জানা।

জুলেখা বলল, বলুন স্যার, আমি কি কিছু অন্যায় করেছি?

জামাল বললেন, এই হাসপাতালে বসে এ আলোচনার শেষ হবে না। আমি বরং তোমার রিলিজ-এর এন্তাজাম করতে যাই। আজই তোমাকে নিয়ে যাব আমার বাড়িতে। সেখানে যথেষ্ট সময় পাওয়া যাবে এ নিয়ে আলোচনা করবার

চার

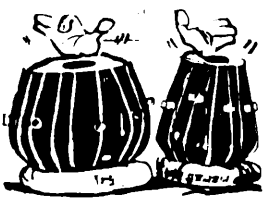

আজ দুদিন হল জুলেখা এসেছে বড়িবেগম মহল্লায়। হেকিম-সাহেবকে জামালুদ্দীন সব কথাই খুলে বলেছেন। হেকিম-সাহেব একটু গোঁড়া—ধর্মবিষয়ে। তিনি শিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত। অর্থাৎ ইমামদের দৈবী চরিত্রে বিশ্বাসী এবং পয়গম্বরের শিক্ষার ব্যাখ্যাতা হিসাবে ইমামদের অভিমতকে প্রামাণ্য মনে করেন। এ সব ব্যাপারে 'ইজ্‌তিহাদ' বা ব্যক্তিগত বিচারবুদ্ধির কার্যকারিতায় অবিশ্বাসী।

'তালাক' প্রথার যৌক্তিকতা তিনি মেনে থাকেন। 'শাহবানু' মামলায় সুপ্রিম কোর্টের রায়টাকে তিনি অন্তর থেকে মানতে পারেননি। লোকসভা সেটা খারিজ করে দেওয়ায় তিনি খুশি।

হেকিম-সাহেবের মতে তালাক হচ্ছে স্বামী-স্ত্রীর নিজেদের ব্যাপার। বাইরের লোকের এ-বিষয়ে কোন বক্তব্য থাকতে পারে না। মুসলমান পুরুষের এ শরিয়তি অধিকার চিরকাল ছিল, আছে, থাকবে!

জামাল-সাহেব এ নিয়ে তর্ক করেননি। বলেছেন, সে যাই হোক! মেয়েটির কোন মাথা-গোঁজার আশ্রয় নেই দেখে ওকে আপনার বাড়িতে নিয়ে এসেছি। আপনি যদি দয়া করে আবদুলকে আমার নিচের ঘরে শোবার অনুমতি দেন, তাহলে আমি বাইরের ঘরে খাটিয়া পেতে শুতে পারি। আর জুলেখা যখন এখানেই থাকছে তখন একটা স্টোভ আর কিছু বাসনপত্র কিনে নিয়ে আসতে পারি। ঐ বারান্দার কোণটায় আপনার যদি আপত্তি না থাকে—একটা পোর্টেবল গ্যাসের উনানে আমাদের দুজনের রান্নাবান্না.....

হেকিম-সাহেব বলেছিলেন, তাতে আমার ঘোরতর আপত্তি আছে। বাড়িতে আমরা এতগুলি প্রাণী। একটি মানুষ বেড়েছে বলে আমাদের পৃথগন্ন হাতে হবে কেন? জুলেখা আমার বড় কন্যার চেয়ে বয়সে ছোট। সে আমার কন্যাপ্রতিম—কন্যাই। সে আমার সংসারে দোতলায় থাকবে। এজন্য আপনাকে খাটিয়া পেতে বাইরের ঘরে শুতে হবে কেন?

জামাল নিম্নস্বরে বলেছিলেন, তাহলে ওর খাওয়া-থাকা বাবদ..

—কেন? ও কি পটের বিবি? সংসারের পাঁচটা কাজ ও করবে না? আমার আর একটি বেটি থাকলে তাকে যা কাজকর্ম করতে হত তাই ও করবে। আপনি বরং একটা কাজ করুন জামাল-সাহেব : ইন্‌স্টলমেন্টে একটা সিঙ্গার মেশিনের পা-কল কিনে ফেলুন। আমার মেয়ে সারিনা খুব ভাল সেলাই-ফোঁড়াই জানে। আমার একজন বন্ধু কলিমুদ্দীন মোস্তাফার একটা দর্জির দোকান আছে; উনি নিজেও খুব ভাল দর্জি। ওঁর

স্ত্রী আমার মরিজ—বাতের ক্রনিক পেশেন্ট। জুলেখাকে সারিনা সেলাইয়ের কাজ শিখিয়ে দেবে। অবসর মতো দুজনে মেশিন চালাবে। আপনি তো জানেনই, সারিনার খসম ওকে নেয় না—তালাকও দেয়নি অবশ্য। যাহোক, দুজনেই তাহলে স্বনির্ভর হয়ে উঠবে। কলিমুদ্দীন কাজ জোগাবে, মজুরি মেটাবে!

জামাল-সাহেব বলেছিলেন, এ তো অতি উত্তম প্রস্তাব।

'বকরহ্ ঈদ' বা কুরবান-ঈদের তাৎপর্যটুকু জামাল-সাহেব একদিন বুঝিয়ে দিয়েছিলেন জুলেখাকে, কোন এক বর্ষণক্লান্ত রবিবারের অপরাহ্ণে। সারিনা, তার আব্বা ও মাও উপস্থিত ছিলেন সেই অপরাহ্ণের আসরে। জামাল এতদিনে হেকিম-সাহেবের ঘরের লোক হয়ে গেছেন। তাঁর সম্মুখে বে-পর্দা উপস্থিতিতে কারও সঙ্কোচ হয় না। জামালুদ্দীন গোটা বড়বিবি মহল্লায় একজন বহু-সম্মানিত ব্যক্তি। সবাই জানে তিনি জিতেন্দ্রিয় এবং সাচ্চা মুসলমান। অধ্যাপক-মশাই বলেছিলেন :

ঈদ-ই-জ্জুহা বাস্তবে ইসলামের বৃহত্তম উৎসব : ঈদ্-উল-কবীর। এই উৎসব জ্বউল-হিজ্জহ্ চান্দ্রমাসের দশম দিনে অনুষ্ঠেয়। একসময় এই অনুষ্ঠানের সঙ্গে মক্কায় তীর্থযাত্রার সম্পর্ক ছিল। এই উৎসব পালনান্তে আরব ধার্মিকেরা মক্কাভিমুখে যাত্রা করতেন। বর্তমানে অবশ্য এটি মুসলিম ভ্রাতৃত্ববন্ধন দৃঢ় করার এবং বলিদান উৎসবের দিন হিসাবে গণনা করা হয়। এই অনুষ্ঠানের বিধি কোরানের সূরহ্ দ্বাবিংশতি থেকে অষ্টত্রিংশতিতে বিধৃত। কথিত আছে, হিজরার কয়েক মাস পরে মদিনায় অবস্থানকালে শেষ নবী হজরৎ মহম্মদ লক্ষ্য করেছিলেন যে, ইহুদিরা তাদের সপ্তম মাসের দশম দিনটি প্রায়শ্চিত্তের জন্য উপবাসের দিবস হিসাবে পালন করে। এই দিনটি মোশিকর্তৃক অর্থাৎ 'মোজেস্' কর্তৃক ইহুদিদের উদ্ধারের স্মারক হিসাবে স্মরণ করা হয়। এই সময় ইহুদিদের সঙ্গে মহম্মদের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। তাদের সিনাগগেও তিনি মাঝে মাঝে যেতেন। তিনি তাঁর অনুচরদের নির্দেশ দিলেন ইহুদিদের ঐ ধর্মীয় অনুষ্ঠানটি গ্রহণ করতে। কিন্তু পরবর্তীকালে ইহুদিরা তাঁর প্রবর্তিত সত্যধর্ম গ্রহণে অস্বীকার করলে তিনি পৃথকভাবে ঈদ-উল অজ্বহার প্রবর্তন করেন। এই অনুষ্ঠানে বলিদান উৎসবটি প্রতীকী—ঈশ্বরের প্রতি একনিষ্ঠ বিশ্বাসের ব্যঞ্জনা এই কুরবানি উৎসবে বিধৃত।

বাইবেলের পুরাতনবিধির সৃষ্টিখণ্ডে কথিত আছে মহাধার্মিক আব্রাহাম ঈশ্বরের প্রতি তাঁর একান্ত নিষ্ঠা প্রমাণিত করতে, তাঁর প্রীতি উৎপাদন মানসে নিজের পুত্র আইজাক্‌কে বলি দিতে উদ্যত হন। এ ঘটনাস্থল বাইবেল মতে মোরিহ্ জনপদ। ঈশ্বর আব্রাহামের ঐকান্তিকতায় সন্তুষ্ট হয়ে পুত্রের পরিবর্তে একটি পশুকে প্রেরণ করেন। ইসলামী ঐতিহ্য অনুযায়ী আব্রাহাম হচ্ছেন ইব্রাহিম। তাঁর ইস্‌হাক নামে এক পুত্র ছিল বটে, তবে যাকে তিনি বলি দিতে উদ্যত হন সেই পুত্রটির নাম ইস্‌মাইল। বলিদান স্থানটিও মোরিহ্ নয়,

মক্কার নিকটবর্তী মীনা পর্বত।

ঐতিহ্য-উপকথায় আরও বলা হয়েছে, ইব্রাহিম বলিদানের জন্য কয়েকবার ছুরিকাঘাত করেন বটে কিন্তু লক্ষ্যভ্রষ্ট হন। তখন তাঁর ক্রোড়স্থিত ইস্‌মাইল তাঁর আব্বাকে বলেন, "আপনি আমার দিকে দৃক্‌পাত করে আমাকে হত্যা করতে চাইছেন বলে স্নেহবশত বারে বারে লক্ষ্যভ্রষ্ট হচ্ছেন, বাপজান। আপনি দুই চক্ষু আবরিত করে আমাকে ছুরিকাবিদ্ধ করার উদ্যোগ করুন। তাহলেই আপনার ছুরিকা আমার পঞ্জর বিদ্ধ করবে।" এই কথায়, পুত্রের ঈশ্বরপ্রেমে মুগ্ধ হয়ে ইব্রাহিম দুই চক্ষু রুদ্ধ করে পুনরায় পুত্রকে বলিদানের উদ্যোগ করলেন। ঠিক সেই মুহূর্তেই গ্যাব্রিয়েল ইস্‌মাইলের পরিবর্তে একটি পশুকে ইব্রাহিমের ক্রোড়ে স্থাপন করলেন। ইব্রাহিম সে কথা না জেনে 'বিস্‌মিল্লাহি-আল্লাহ্‌ আকবর' পুকার দিয়ে ক্রোড়স্থিত জীবটিকে ছুরিকাবিদ্ধ করলেন। পরমুহূর্তেই চোখ খুলে দেখলেন তাঁর পুত্র অক্ষত—কুরবানি হয়েছে পশুটি।

হেকিম-সাহেব উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে ওঠেন, আল্‌হামদুলিল্লাহ্‌!

জুলেখা জানতে চায়, একটা কথা! ইব্রাহিম পুত্রভ্রমে যে পশুটিকে কুরবানি করেছিলেন সেটি কী জন্তু ছিল? ছাগল, গরু না উট?

হেকিম-সাহেব বিরক্ত হয়ে বললেন, তুই কাফেরের মতো প্রশ্নটা করেছিস্‌, জুলেখা! জীবটা কী ছিল সেটা এখানে প্রশ্ন নয়। মূল বক্তব্য ইব্রাহিমের ঐকান্তিকতা! ইসমাইলের আত্মোৎসর্গের সদিচ্ছা। আল্লাহ্‌-র প্রতি নিষ্ঠা!

জুলেখা বলে, সেটাতে তো আমি কোন সন্দেহ প্রকাশ করছি না। আমি বড়ভাইয়ের কাছে জানতে চাইছি কোরানে জীবটার কী নাম লেখা আছে।

জামালুদ্দীন বললেন, কোরান ধ্রুপদী আরবীতে রচিত। সে ভাষা আমি জানি না; ফলে, মূল কোরান আমি পড়িনি, জুলেখা। হজরত মহম্মদের প্রত্যক্ষ সাহচর্য যাঁরা পেয়েছিলেন তাঁদের মতে, কোরানের বাণীকে যুক্তির সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়োজন নেই, কারণ সেগুলি স্বয়ংসিদ্ধ।

জুলেখা বাধা দিয়ে বলে, আপনি আমার প্রশ্নটার সরাসরি জবাব দিন, স্যার, জন্তুটা কী ছিল? কোরানে কী লেখা আছে?

—সেই কথাই তো বলছি, জুলেখা। যুক্তির সাহায্যে উটকে বাদ দিতে হয়, কারণ কোন একজন মানুষ তার কোলের উপর একটা জ্যান্ত উটকে তুলতে পারে না। যুক্তির নিরিখে ওটা ছিল হয় দুম্বা অথবা ভেড়া, ছাগল, বা বাছুর। ঠিক কী ছিল তা জানি না। অনুবাদে আমি যা পড়েছি তা : 'পশু'!

হেকিম-সাহেব বললেন, পশুটা ছিল বাছুর। ভেড়া, ছাগল, বা দুম্বা নয়।

জুলেখা বললে, আপনি কী করে জানলেন?

—আমাকে মৌলানা সৈয়দ আবুল কাশেম আল-জবরীয়া সাব বলেছিলেন। তিনি আর্বী-ফার্সি দুটি ভাষাতেই ছিলেন আলিম। এবাদতিতে তিনি ছিলেন সর্বজনমান্য!

জুলেখা জানতে চায়, সেই মৌলানা-সাহেব আপনাকে কি বলেছিলেন, মূল ধ্রুপদী আরবী ভাষাতে যে কোরানের সংস্করণ পাওয়া যায় তাতে লেখা আছে যে, পশুটা বাছুর?

—না, তা অবশ্য বলেননি।

জুলেখা এদিকে ফিরে জামালকে প্রশ্ন করে, আপনার কী বিশ্বাস, স্যার?

জামাল-সাহেব বললেন, কোরানের ঐ বাইশ থেকে আটত্রিশ নম্বর সূরাহ্—যেখানে বকরহ্-ঈদের ঐ ঘটনার উল্লেখ আছে সেখানে পশুটার নাম লেখা আছে কি না আমি জানি না। আমার ধারণা সেটা ছিল : ভেড়া। মক্কা অঞ্চলে মেষপালক ছিল প্রচুর—গবাদিপশু অল্প। তাছাড়া আমার ধারণা—ভারতবর্ষ অধিকার করার পর থেকে বেশ কিছু অত্যাচারী বাদশাহ্ বা আমীর-ওমরাহ্ বিজিত প্রজাদের উৎপীড়ন করার মধ্যেই আমোদ পেতেন। যারা ধর্মত্যাগ করে সদ্ধর্ম গ্রহণ করতে রাজি হল না তাদের। তারাই 'জিজিয়া' কর প্রবর্তন করেছিল বা বিজাতীয়দের কাছ থেকে ঐভাবে অর্থ সংগ্রহ করত। তারাই পশুটাকে ছাগল-ভেড়া-দুম্বা থেকে গরুতে রূপান্তরিত করেছিল—একজাতের ধর্ষকামী মনোভাব থেকে। যেহেতু কাফেরদের চোখে গরু হচ্ছে গো-মাতা।

হেকিম-সাহেব প্রতিবাদ করেন, এটা সত্য নয়। কাফেরদের যুক্তি।

জুলেখা বলে ওঠে, যুক্তিটা যারই হোক, এ-কথা তো মানবেন যে, বকরহ্-ঈদ এ পশুটা গরুর পরিবর্তে পাঁঠা বা ভেড়া হলে কোরান-অবমাননার গুনাহ্ হয় না। যেহেতু কোরানে বলা হয়েছে—'পশু'। 'গরু' এ কথা লেখা নেই। সেটা মেনে নিলে হয়তো হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্বটা মেটাবার একটা ধাপ অতিক্রম করা যায়।

* * *

ইংরেজি অনার্সের কোন কোন ছাত্র—হিন্দু এবং মুসলমান—চিরকালই ছুটির দিনে জামাল-সাহেবের কাছে ইংরেজি সাহিত্য আলোচনার জন্য আসত। তাদের মধ্যে দু-একজন জুলেখার প্রতি উৎসাহ দেখালো। হেকিমসাহেব পর্দাপ্রথা মানলেও, জামালুদ্দীন সেটা আদৌ মানতেন না। উনি ছিলেন 'সুফী' মতে বিশ্বাসী—অর্থাৎ সুতাকাল্লাসীন বা লুকামা-পন্থীদের মতো শাস্ত্রীয় নির্দেশকেই একমাত্র প্রামাণ্য বলে মনে করতেন না—বিশেষ যেসব নির্দেশ সরাসরি কোরান বা হাদিসের নয়—মৌলভিদের নিজ নিজ ইন্টারপ্রিটেশান। তাঁর কাছে হজরত মহম্মদের আধ্যাত্মিক আবেগ এবং প্রত্যক্ষানুভূতির মূল্য ছিল অনেক বেশি। ফলে, তাঁর ছাত্রদের চা পরিবেশন করতে জুলেখা প্রায়ই বেপর্দা হয়ে বৈঠকখানায় আসত। জামাল-সাহেব ছাত্রদের সঙ্গে তার পরিচয় করিয়ে দিতেন।

কখনো কখনো বলতেন, বস না জুলেখা, আমরা কিট্‌স-এর 'এন্ডিমিয়ান' পড়ছি। শুনলে লাভ বৈ তোর ক্ষতি হবে না।

দু-একজন ওর প্রতি যে না ঝুঁকেছিল এমন নয়, কিন্তু জুলেখা কিছুতেই এগিয়ে এল না। উৎসাহিত হল না। সে সেলাই শিখে স্বনির্ভর হতে চায়।

তারপর একদিন। হেকিম-সাহেব ওঁকে জনান্তিকে ডেকে বললেন, প্রফেসর সাব, কিছু মনে করবেন না, একটা কথা আপনাকে জানাতে বাধ্য হচ্ছি। আপনি যখন কলেজে থাকেন, আবদুল স্কুলে, আমি মধ্যাহ্ন বিশ্রাম করি তখন জুলেখার সঙ্গে একজন পুরুষ গোপনে সাক্ষাৎ করতে আসে। সে 'কল-বেল' বাজায় না, বা দরজার কড়া নাড়ে না। আমার বেটি বলেছে। লোকটা নির্দিষ্ট সময়ে ঐ গাছতলায় এসে দাঁড়ায়। জুলেখা সদর খুলে দেয়। ছেলেটি কখনো একঘণ্টা, কখনো দুঘণ্টা কাটিয়ে চলে যায়।

জামাল-সাহেব বললেন, সম্ভবত বিশ্বনাথ। মানে জুলেখার দাদা।

—না প্রফেসর-সাব, বিশ্বনাথ দুবেকে আমি চিনি। সে দু-একবার আমার ডাক্তারখানায় এসেছে। নিজের পরিচয় দিয়েছে। আমি ভিতরে খবর পাঠিয়েছি। জুলেখা এসে তার সঙ্গে কথা বলেছে। এ ছেলেটি আরও দীর্ঘকায়, বলিষ্ঠ! এ অন্য একজন।

অধ্যাপকমশাই গম্ভীর হয়ে গেলেন। বললেন, ঠিক আছে, আমি জুলেখাকে জিজ্ঞাসা করে জানব। যথাকর্তব্য করব। আপনাকেও জানাব। এটা তো ভাল কথা নয়। ওকে 'নসিহত' করতে হবে। ভর্ৎসনা।

প্রশ্নমাত্র জুলেখা স্বীকার করল : হ্যাঁ, রসিদই। তবে বিশ্বাস করুন, স্যার—ও কোনদিন আর আমাকে ছোঁয়নি।

—তা তো বুঝলাম। কিন্তু তোমার সঙ্গে তার সব সম্পর্ক যখন চুকে গেছে তখন সে আমার বাড়িতে আসে কেন? আর লুকিয়েই বা আসে কেন?

—ও আপনাকে কিছু বলতে চায়। খুব জরুরী কথা। সাহস পাচ্ছিল না। আমি বলেছি, ভয়ের কিছু নেই। আপনার সঙ্গে কলেজে দেখা করতে বলেছি। কাল জুম্মাবার, আমি জানি আপনার ছুটি বেলা তিনটেয়। ওকে বলেছি, কলেজের গেট-এ অপেক্ষা করতে।

পাঁচ

জুম্মাবার কলেজ ছুটির পর উনি বেরিয়ে এসে দেখলেন, গেটের কাছে রসিদ দাঁড়িয়ে আছে। নত হয়ে সে আদাব জানালো। জামাল-সাহেব বললেন, জুলেখা বলছিল তুমি আমাকে কিছু বলতে চাও?

'তুমি' সম্বোধনে কোনও সঙ্কোচ হল না এবার। বয়সে রসিদ ওঁর চেয়ে দশবছরের ছোট। রসিদ বলল, হ্যাঁ, স্যার, আপনি যদি অনুগ্রহ করে শোনেন। আর আমাকে সাহায্য করেন।

—কী বিষয়ে সাহায্য?

—স্যার, এভাবে প্রশ্নোত্তরের মধ্যে দিয়ে আমরা যদি অগ্রসর হতে থাকি তাহলে ভুল বোঝাবুঝির আশঙ্কা আছে। আসুন আমরা কোথাও গিয়ে বসি। আমার সমস্যাটা আপনাকে খুলে বলি। আপনি যদি আমাকে এই জটিলতা থেকে উদ্ধার পেতে সাহায্য করেন তাহলে আমি চিরকৃতজ্ঞ হয়ে থাকব....না, না স্যার, বাধা দেবেন না...আমি জানি আপনার প্রশ্নটা কী। তাই দুটো কথা প্রথমেই বলে রাখি। প্রথম কথা : আমি অনুতপ্ত। রাগের মাথায় অত্যন্ত অসংযমী হয়ে আমি এ অভিশাপ নিজেই সৃষ্টি করেছি। সেজন্য আমি জুলেখার কাছে ক্ষমাও চেয়েছি—হাত-ধরে ক্ষমা চাইতে পারিনি, যেহেতু আমার স্পর্শকে সে গুনাহ্ বলে মনে করে। দ্বিতীয় কথা : আমি আপনাকে যা বল্‌ব তা জুলেখা জানে। বস্তুত তার পরামর্শ মতোই আমি আপনার সাহায্য চাইতে এসেছি, স্যার!

—বেশ চল, এসব আলোচনা কোন রেস্তোরাঁ বা হোটেলে ভালভাবে করা যাবে না। কলেজে কতকগুলি ছোট ঘর আছে—গ্রুপ-ডিস্‌কাশানের জন্য। তার একটাতে গিয়ে আমরা বসি।

—আপনার অশেষ মেহেরবানি, স্যার!

রসিদ যে প্রস্তাব দিল তাতে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন জামাল-সাহেব।

কিন্তু প্রস্তাবটা পেশ করার আগে সে সমস্যাটা বিস্তারিত জানিয়েছে। জুলেখাকে 'তালাক' দিয়ে সে মর্মান্তিক অনুতপ্ত! কাণ্ডজ্ঞানহীন হয়ে এই কাজটা করে বসেছে। পাঁচ মেহ্‌মানের সম্মুখে আব্বাজানের থাপ্পড় খেয়ে সে হিতাহিতজ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিল।

পরে জেনেছে, এজন্য জুলেখাকে চূড়ান্ত অবমাননা সইতে হয়েছে। গ্রামের কয়েকজন—সঙ্গে ছিলেন ওর দাদা রহমৎ—জুলেখাকে তার বাপের ভিটেতে পৌঁছে দিয়ে আসে। কিন্তু বাপের বাড়ির লোকেরা ওকে বাড়িতে ঢুকতে দেয়নি। তাঁদেরও দোষ

দেওয়া যায় না। তাহলে হয়তো গ্রাম-পঞ্চায়েত ওঁদের একঘরে করত, অর্থাৎ জাতিচ্যুত। ততক্ষণে সন্ধ্যা হয়ে গেছে, শেষ বাসটাও চলে গেছে। ফলে একটা রাত জুলেখাকে বাধ্য হয়ে কাটাতে হয়েছে পিতৃগৃহে—গৃহে নয়; গোয়ালঘরে। ওর মা মাটির সরায়, মাটির গেলাসে ওর রাতের খাবারটা পৌঁছে দিয়েছিল চোখের জলে ভাসতে ভাসতে। একটা বাক্যবিনিময়ও করতে পারেনি গৃহপ্রত্যাগতা কন্যার সঙ্গে—কারণ সমাজের তরফে পাহারাদার খাড়া দাঁড়িয়েছিল, যাতে ব্রাহ্মণের জাত কোনকর্মেই না খোয়া যায়।

জুলেখার ছোট বোন স্বাতীলেখা কিছু ভিজে খড় জ্বালিয়ে দিয়ে গেল গোয়ালের কাছে পিঠে—যাতে ধোঁয়া হয়। মশার কামড় কম সইতে হয়।

জুলেখা একবস্ত্রে গৃহত্যাগ করেছিল। তার দ্বিতীয় পোশাক ছিল না যে, বদল করবে। নাকছাবিটা বাদে সারা দেহে এক রতি সোনা ছিল না।

পরদিন ভোর রাতে স্বাতীলেখা গোয়ালঘরে দিদির তত্ত্বতালাশ নিতে এসে দেখেছিল—একরাশ দগ্ধ ভস্মের মাঝখানে খড়ের বিছানা শূন্য। অপরাধী মেয়েটা বাপের বাড়ি থেকে শেষ বিদায় নেবার আগে সেই গোয়ালঘরে যদি দু-ফোঁটা চোখের জল ফেলে থাকে তাহলে তাও শুকিয়ে গেছে। পড়ে আছে মাটির সরায় অভুক্ত খাদ্য।

আশ্চর্য! গোয়ালে যে গরুটি সারারাত ওর সঙ্গ দিয়েছে—কৈশোরকাল থেকে যার সেবা করে এসেছে জুলেখা—তার জন্য জাব্‌না মেখে রেখে যেতে ভোলেনি কিন্তু।

পরদিন অভুক্ত, অস্নাত বিতাড়িতা মেয়েটি একবস্ত্রে এসে উঠেছিল তার ছোড়দার বাড়িতে। ভোরবেলাকার প্রথম বাসে। ভাগলপুরে। ভাগ্যক্রমে বাড়ি ছাড়ার আগে আঁচলের খুঁটে গোটা দুই দশটাকার নোট বেঁধে রওনা হয়েছিল। বুধি আর বুদ্‌বুদ্‌কে বিক্রয় করে যে হাজার টাকা পেয়েছিল তা থেকেই। বাকি ন শো আশিটাকা রেখে এসেছে ওর শোবার ঘরে আলমারিতে।

ছোড়দার বাড়ির চৌকাঠ অতিক্রম করতে পারেনি।

দোরগোড়া থেকেই ফিরে আসে। হাঁটতে হাঁটতে চলে আসে মশল্লাচকে। যেখানে ওর শ্বশুরমশায়ের মটোর মেরামতির কারখানা। কয়েকজন মজদুর—হিন্দু এবং মুসলমান—ওকে 'ভাবিজী' ডাকে। তাদের সাহায্য নিতেই এসেছিল। দুর্ভাগ্যবশত গ্যারেজ তালাবন্ধ। ঈদ-এর ছুটি।

জুলেখা পর পর চারটি ডাক্তারখানা থেকে অল্প অল্প পরিমাণে ঘুমের ওষুধ 'কাম্পোজ' কিনে নেয়। বিনা প্রেস্‌ক্রিপশানে কোনও ডিস্‌পেনসারিই ওকে একপাতা বেচতে রাজি হয়নি। তারপর রাস্তার কলের জলের সঙ্গে বড়িগুলো গলাধঃকরণ করে

পার্কের বেঞ্চিতে গিয়ে শুয়ে পড়ে।

অধ্যাপকমশাই প্রশ্ন করেন, এত বিস্তারিত খবর তুমি পেলে কী করে?

—জুলেখাই বলেছে।

—তুমি হাসপাতালে ওর সঙ্গে দেখা করতে কেন এসেছিলে?

রসিদ চট-জলদি জবাব দেয়, নাকছাবিটা ফেরত দিতে।

—নাকছাবি! মানে?

রসিদ বুঝিয়ে বলে ব্যাপারটা। গরু-বাছুরের দাম বাবদ জুলেখার বিক্রয়লব্ধ প্রায় হাজার টাকা সে ধরিয়ে দেয় ওর দাদা রহমতের হাতে। বলে, একজোড়া পাঁঠা কিনে নিয়ে এসে ধর্মীয় কারনামা সেরে ফেল। আমি চললাম...

রহমত ওর হাত চেপে ধরে বলেছিল, নালায়েকের মতো বাতচিৎ করিস্ না রসু! জুলেখা আর তোর জরু নয়। সে কোথায় গেল তা তোকে দেখতে হবে না।

দাদার হাত ছাড়িয়ে সে চলে এসেছিল বাবুপুর গ্রামে। ওর শ্বশুরবাড়িতে। সেখানে পাড়ার ছেলেদের হাতে বেশ দু-চার ঘা খেতে হয়। তবে খবর পায় জুলেখা সেখানে নেই। চলে আসে ভাগলপুরে। প্রথমে বিশ্বনাথের বাড়ি, তারপর গ্যারেজে। রিপেয়ারিং গ্যারেজ সুনসান্। তবে দারোয়ান আছে। সে দরজা খুলে ছোটহুজুরকে ঢুকতে দেয়। রাতের জন্য একটা খাটিয়া পেতে দেয়। মশারি খাটিয়ে দেয়। পরদিন সকালেই সে খবর পায় সামনের পার্কে একটি মেয়ে আত্মহত্যা করে মরে পড়ে আছে। ও ছুটে যায়। জুলেখা বেঁচে আছে কি না বুঝতে পারে না। যা হোক, প্রতিবেশীদের সাহায্যে সে ওকে হাসপাতালে পৌঁছে দেয়। এমার্জেন্সি জানায় মেয়েটি জীবিতা। তাকে ভর্তি করে নেওয়া হয়। রসিদই নামধাম লেখায়। নিজের পরিচয় দেয় না, বলে রিস্তেদার। তার নামধাম লিখে নিয়ে দু-একজন সাক্ষী রেখে এমার্জেন্সির ছোকরা ডাক্তার জুলেখার নাকছাবিটা খুলে তার হাতে দেয়।

এবার অধ্যাপকমশাই জানতে চান, তুমি কি অনুতপ্ত? মানে, তুমি কি মনে কর, জুলেখাকে তালাক দেওয়া তোমার অন্যায় হয়েছে?

—হ্যাঁ, স্যার। তাই মনে করি আমি। প্রচণ্ড রাগের মাথায় দিগ্‌বিদিগ জ্ঞানশূন্য হয়ে ওকে আমি তালাক নিয়ে বসেছি।

—বুঝলাম। কিন্তু তুমি কি জান যে, জুলেখা তার কৃতকার্যের জন্য অনুতপ্ত নয়?

—হ্যাঁ, স্যার, তাও জানি। এ ব্যাপারটা নিয়ে আমি একজন ধার্মিক মুসলমান মৌলানার সঙ্গে আলোচনা করেছি। তাঁর মতে 'বকরহ্-ঈদ'-এ যে গো-শাবককেই কুরবানি করতে হবে এমন কোনও শাস্ত্রীয় নির্দেশ নেই। উনি একথাও বলেন যে, অনেক মৌলবাদী ধর্মীয় নেতার মতে কুরবানির পশুটি গরু না হলে চলবে না। তিনি সে মত

মানেন না। তাছাড়া তিনি বললেন, "তুই তো জানতিস তোর বউ হিঁদু ঘরের মেয়ে। তোর মহব্বতে দিওয়ানা হয়ে সে সব কিছু ছেড়ে তোর ঘর করতে এসেছে। আর পরিবর্তে তুই তোর জিদ্দিবাজিটা ছাড়তে পারলি না? ওর কয়েক হাজার বছরের জিন-বাহিত সংস্কারটাকে অস্বীকার করলি?" আমি, স্যার, ওঁর কথা সর্বান্তঃকরণে মেনে নিয়েছি। যতদিন বেঁচে থাকব আমি গো-হত্যা করব না, গো-মাংস ভক্ষণ করব না। জুলেখা মাংস খায়। কিন্তু গো-মাংস খেতে পারে না। ও যা খায়, আমিও এবার থেকে তাই খাব।

জামাল-সাহেব বললেন, তোমার এই সিদ্ধান্তটা বড় দেরি করে নেওয়া হচ্ছে না, রসিদভাই?

—সেটা স্যার নির্ভর করছে, আপনার সিদ্ধান্তের উপর। অর্থাৎ আপনি আমাদের দুজনকে এই বিপদ থেকে রক্ষা করতে স্বীকৃত কি না—তার উপর!

—তার মানে? কী বলতে চাইছ তুমি?

রসিদ এইবার তার প্রস্তাবটা পেশ করে :

শরিয়তি কানুনে কোন পুরুষ তার স্ত্রীকে 'তালাক' দেবার পর সম্পর্ক ছেদ হয়ে যায় বটে; কিন্তু একটি বিকল্প ব্যবস্থা আছে তাদের পুনর্বিবাহের। যদি ঐ তালাকপ্রাপ্তা রমণীকে কোনও দ্বিতীয় পুরুষ নিকা করে তিন মাস শয্যাসঙ্গিনী হিসাবে গ্রহণ করে তারপর 'তালাক' দেয়। অর্থাৎ এ-ক্ষেত্রে জুলেখাকে একজন দ্বিতীয় পুরুষ নিকা করবে—তার যদি ইতিপূর্বেই বিবাহ করা চার বিবি জীবিতা না থাকে। তারপর তারা দুজন তিনমাস স্বামী-স্ত্রী হিসাবে বাস করবে। প্রতি রাত্রেই যে দুজনকে এক শয্যায় শয়ন করতে হবে সে রকম কোনও বাধ্যবাধকতা নেই। তবে এই বিবাহকালের মধ্যে জুলেখাকে তিনবার ঋতুমতী হতে হবে। সে প্রয়োজনে তিন চান্দ্রমাসের সময়কাল বর্ধিতও হতে পারে। তারপর জুলেখার দ্বিতীয় স্বামী জুলেখাকে 'তালাক' দিলে জুলেখা মুক্তি পাবে। তখন সে আবার তার প্রথম স্বামীকে বিবাহ করতে পারে।

জামাল-সাহেবকে এত কথা বুঝিয়ে বলার প্রয়োজনই হল না, তিনি এসব আইন-কানুন সম্বন্ধে অবহিত। বললেন, এজন্য কিছু লুচ্চা-জাতের কারবারী পাওয়া যায়, যারা কিছু অর্থের বিনিময়ে তালাকপ্রাপ্তাকে তিনমাসের জন্য শয্যাসঙ্গিনী করতে রাজি হয়ে যায়। সাময়িক একটি শয্যাসঙ্গিনীও জুটল, কিছু উপার্জনও হল। তুমি কি সেই ব্যবস্থা করছ রসিদ?

—ন্যা, স্যার! জুলেখা তাতে রাজি নয়। তার বক্তব্য : তার খসম্ হিতাহিতজ্ঞানশূন্য হয়ে তাকে 'তালাক' দিয়েছে—এতে তার কী অপরাধ? সে কেন তার স্বামীর হঠকারিতার জন্য তিনমাস বেশ্যাবৃত্তি করবে?

"সন্তান মোর মার।"

জামাল-সাহেব প্রতিবাদ করেন, বেশ্যাবৃত্তি কেন বলছ রসিদ? সে তো রীতিমতো সর্বসমক্ষে ওকে 'নিকা' করবে!

রসিদ বললে, সে যুক্তিটা, স্যার, আপনি-আমি মানছি, কিন্তু জুলেখার কয়েক হাজার বছরের জিনবাহিত কাফের-খুন মানতে রাজি নয়। ওর দৃষ্টিভঙ্গিতে 'নিকা' করুক বা না-করুক অর্থের বিনিময়ে তিন চান্দ্রমাসের জন্য যে খদ্দের ওর নারীদেহটা উপভোগের ধর্মীয় অনুমতি পাচ্ছে তার সঙ্গে রেড-লাইট এলাকার কোনও খদ্দেরের বিন্দুমাত্র প্রভেদ নেই।

—তাহলে?

—এ-ছাড়া আরও একটা মুশকিল আছে, স্যার। অনেক ক্ষেত্রে চুক্তিবদ্ধ হয়েও তিনমাস পরে পুরুষটি 'তালাক' দিতে রাজি হয় না। ব্ল্যাকমেলিং শুরু করে। শরিয়তি কানুনের মাধ্যমেও তাকে বাধ্য করা যায় না, আদালতের মাধ্যমেও নয়। লোকটা যদি জুলেখাকে তিনমাস পরে 'তালাক' দিতে রাজি না হয় তাহলে তাকে খুন করা ছাড়া জুলেখাকে বন্দীদশা থেকে মুক্ত করা যাবে না। তাই নয়?

—বুঝলাম। তাহলে তোমরা কী চাইছ?

—আপনি স্যার, আমাদের দুজনকে মুক্তি দিন। আপনি নিজেই জুলেখাকে নিকা করুন—তিন মাসের জন্যে!

অধ্যাপক মশাই নিজের অজান্তেই চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ান। বলেন, এ-সব কী বলছ রসিদভাই? আমি যে জুলেখাকে নিজের বহিনের মতে দেখি—

—জানি। আমি ছাড়া এ কথা জুলেখাও জানে। তাই সে রাজি হয়েছে। পুরো তিন-তিনটে মাস আপনার শয্যায় শয়ন করতে। আমরা দুজনেই বিশ্বাস করি : আপনি সরিফ, আপনি শীরীন! ইব্‌তিজাল আর খিয়ানৎ আপনার কাছে হারাম! আমরা দুজনেই বিশ্বাস করি তিনমাস পরে আপনি জুলেখাকে খিলাৎ দেবেন আমার মত বেঅকুফ, নাদান নফরকে! মাত্র তিনমাসের জন্য আপনি ওকে আপনার কলিজা ঘেঁষে শয়নের অনুমতি দিন, স্যার! জুলেখা সরমে একথা বলতে পারছিল না বলেই আমাকে আপনার দ্বারে ভিক্ষা চাইতে আসতে হল। বেরোদানে ইসলাম! আপনার মুবারকী আমরা দুজন জিন্দেগীভর বিস্মৃত হব না, স্যার!

ছয়

পরবর্তী পরিচ্ছেদগুলি লিপিবদ্ধ করার পূর্বে একটা ব্যক্তিগত 'কৈফিয়ত' দেবার প্রয়োজন বোধ করছি। সেটা হচ্ছে এই যে, এই কাহিনী লিপিবদ্ধ করার মূল অনুপ্রেরণা যে ভদ্রলোকের কাছ থেকে পেয়েছি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা। তিনি আমাকে ভাগলপুর দাঙ্গার কথা বিস্তারিত বলেন এবং অনুরোধ করেন, "এ নিয়ে লিখুন মিস্টার সান্যাল। আপনার ঐ গোয়েন্দা কাহিনী অথবা দুশো বছর আগে যে, মহিলা নারীমুক্তির প্রথম উদ্‌গাতা হিসাবে কীর্তি রেখে গেছেন তাঁর কথা পরে লিখলেও চলবে। একদল রাজনীতি-ব্যবসায়ী ধর্মান্ধতাকে মূলধন করে ভারতবর্ষের রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করতে চাইছে। এখন যদি আপনারা, শিল্পী-সাহিত্যিকরা, রুখে না দাঁড়ান তবে ভারতীয় সংস্কৃতি বলতে আর কিছু অবশিষ্ট থাকবে না। আপনি লিখুন ভাগলপুর দাঙ্গার কথা—সেখানে সাম্প্রদায়িক বিভেদবুদ্ধিকে চূর্ণ করে কী ভাবে দুই সম্প্রদায়ের মানুষ মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল—লিখুন অযোধ্যার বাবরি মসজিদ ধ্বংসের বর্বরতার কথা, গুজরাটের সেই অনবদ্য কাহিনীটি।"

আমি ডক্টর খইরনারের উপদেশ মেনে নিয়েছিলাম। তাই লিখতে বসেছি সেইসব মানুষের কথা যাঁরা সাম্প্রদায়িক বিভেদবুদ্ধির উপরে উঠে ভারতবর্ষের প্রাণসত্তাকে পুনর্জীবিত করতে চেয়েছিলেন।

1989 সালে, মহরমের মাসে, বিহারের ভাগলপুর শহরে যে ভয়াবহ দাঙ্গা হয় তাতে প্রায় আড়াই হাজার মানুষ প্রাণ দেন। এর প্রায় পঁচানব্বই শতাংশই মুসলমান। সরকার একটি তদন্ত কমিশন বসান। সম্প্রতি তার রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে; 11.3.95 তারিখের আনন্দবাজারে এই নিয়ে সম্পাদকীয় ছিল : **লজ্জাকর ভাগলপুর উপাখ্যান**। বলা হয়েছে:

> ভাগলপুরের জেলাশাসক, পুলিশসুপার, রাজ্যপুলিশের একজন ডি.আই.জি. এবং স্বয়ং আই.জি. এই দাঙ্গার জন্য দায়ী!! যখন এক সম্প্রদায়ের উন্মাদ দাঙ্গাবাজরা অন্য সম্প্রদায়ের নিরীহ নিরস্ত্র জনসাধারণের উপর চড়াও হইয়াছে তখন তাহাদের নিরস্ত্র ও নিবৃত্ত করার পরিবর্তে এই অফিসারেরা তাহাদের উস্‌কানি দিয়াছেন এবং আক্রান্তরা সুরক্ষা চাহিলে অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া থাকিয়াছেন। দাঙ্গার সম্ভাবনা জানিয়াও পাটনার রাজ্যসরকারের কর্তাব্যক্তিরা সমগ্র পরিস্থিতির প্রতি অপরাধমূলক ঔদাসীন্য ও নিস্পৃহতা দেখাইয়াছেন বলিয়াও রিপোর্টে অভিযোগ করা হইয়াছে। স্বাধীনতার পর এ দেশে যখনই বড় কোনও সাম্প্রদায়িক হানাহানির ঘটনা ঘটিয়াছে, তখনই তাহার তদন্তে কমিশন

নিযুক্ত হইয়াছে। কিন্তু তদন্ত রিপোর্টগুলি কদাচিৎ জনসমক্ষে প্রকাশ করা হইয়াছে।.....দোষী ব্যক্তিরা শেষপর্যন্ত শাস্তি পাইল কি না, এ সংশয়ও জনমনে জাগিয়াছে।...ভাগলপুর দাঙ্গার রিপোর্টেও দেখা যাইতেছে রক্ষক পুলিশ অফিসারেরাই ভক্ষকের ভূমিকা লইয়াছিলেন। তাহাদের মধ্যে ভাগলপুর রেঞ্জের আই.জি.-র ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। দাঙ্গাবাজ হিন্দু মৌলবাদীদের হাতে আক্রান্ত, তাড়া খাওয়া এক সংখ্যালঘু জনতার সামনে দাঁড়াইয়া তিনি প্রকাশ্যে হুম্‌কি দিয়াছিলেন, এখানে তিনি আর একটি কারবালার প্রান্তর বানাইয়া ছাড়িবেন।...উল্লেখ্য, এই লোকটিই মাত্র কয়দিন আগে বিহার পুলিশের ডি.জি. নিযুক্ত হইয়াছেন এহং তাঁহাকে পুলিশ প্রশাসনের শীর্ষে রাখিয়া বিহার বর্তমানে বিধানসভার নির্বাচনে যাইতেছে।

তসলিমা নাসরিনের লেখা 'লজ্জা' উপন্যাসটার কথা এই প্রসঙ্গে আপনাদের মনে পড়ে যাচ্ছে তো? খুবই স্বাভাবিক। আমার কিন্তু মনে পড়ে গেল বোম্বাই থেকে প্রকাশিত একটি পত্রিকায় (Communalist Combat, Aug-Sept, 1994) এক সাংবাদিকের কাছে দেওয়া ডক্‌টর সুরেশ খইরনারের-এর একটি সাক্ষাৎকারের কথা। বোম্বাইয়ের নিগৃহীত মিউনিসিপ্যাল কমিশনার জি. আর. খইরনারের সঙ্গে এঁর কোন সম্পর্ক নেই। ইনি কলকাতার বাসিন্দা, থাকেন ফোর্ট উইলিয়ামের ভিতর একটি কোয়ার্টার্সে এবং সমাজ-কল্যাণমূলক একাধিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তিনি যুক্ত। এঁরই উৎসাহে এই রচনাটি লিখেছি। বোম্বাইয়ের সাংবাদিককে দেওয়া তাঁর দীর্ঘ বিবৃতির বেশ কিছুটা অংশ এখানে অনুবাদ করে পরিবেশন করতে চাই—কারণ আমাদের মতে একমাত্র ডক্‌টর খইরনার প্রদর্শিত পথেই সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি গড়ে ওঠা সম্ভব। ধীরে ধীরে, ধাপে ধাপে। জ্ঞানীগুণী মানুষদের ধরে নিয়ে এসে পদযাত্রার আয়োজন করলেই আমাদের কর্তব্য শেষ হয়ে যায় না।

রচনাটির শিরোনাম : **Burying the Hatchet.**

সম্পাদক-সাক্ষাৎকারের মুখবন্ধে লিখেছেন, "অযোধ্যাবিরোধ থেকে উদ্ভূত 1989-এর ভাগলপুর শহরের দাঙ্গায়—সরকারি হিসাব অনুসারেই—মৃতের সংখ্যা ছিল এক হাজার ; আর তার নব্বই শতাংশই মুসলমান। মৃতের সংখ্যাটির অপেক্ষা ভয়াবহ ছিল সাম্প্রদায়িক দানবদের নৃশংসতার ভয়ঙ্করতা। পশ্চিমবঙ্গালা থেকে সমাজসেবীর একটি দল ওখানে গিয়ে দীর্ঘদিন ধরে কাজ করেন, দাঙ্গাবিধ্বস্ত নিষ্পাদপ শ্মশানে নূতন বিশ্বাস ও সম্প্রীতির বীজ বপন করেন। এখন সেগুলি অঙ্কুরিত চারাগাছ হয়ে উঠেছে। ডক্‌টর খরইনারের এই সাক্ষাৎকারে সেই কাহিনীটি বিধৃত।" ডক্টর খইরনার বলছেন—

"হিন্দু না ওরা মুস্‌লিম?"

ভাগলপুরে ভয়াবহ দাঙ্গাটা হয়েছিল 1989-এর অক্টোবরে। আমি ও আমার কয়েকজন সহকারী বন্ধু সেখানে প্রথম গিয়ে পৌঁছাই প্রায় ছয়মাস পরে। কলকাতা থেকে। ভাগলপুর জেলার অনেকগুলি গ্রাম আমরা ঘুরে ঘুরে দেখেছি। কেউ একশ, কেউ তিনশ গ্রামে গেছি। গণহত্যার ছয়মাস পরেও আমরা স্বচক্ষে দেখেছি অর্ধদগ্ধ মনুষ্যদেহাবশেষের স্তূপ। কুঁড়েঘরে রক্তের শুকিয়ে যাওয়া দাগ, অথবা জনহীন শূন্য কুটিরের ভিতর তরোয়ালের কোপে ছিন্নভিন্ন তোষক, বালিশ—শূন্যগর্ভ বাক্স-পেঁটরা।

আক্রমণকারীরা বিধর্মীদের হত্যা করেই ক্ষান্ত হয়নি। শূন্যগৃহে অগ্নিসংযোগ করে গেছিল। কয়েকশত বছরের পুরাতন মস্‌জিদ ধ্বংস করে সেখানে গড়ে তোলা হয়েছে হনুমানজী অথবা দুর্গা মাঈর মন্দির। আমাদের সবচেয়ে যেটা বিস্মিত করল তা এই যে, ঘটনার এতদিন পরেও মৌলবাদী হিন্দু দাঙ্গাবাজদের মনে এতটুকু অনুশোচনা জাগেনি। অনেকেই অনায়াসে বললে, "মুসলমানেরা তো সব ব্লাডি বাস্টার্ড! যা করা হয়েছে তাই ছিল ওদের প্রাপ্য। সুযোগ পেলে যা করেছি, তা আবার করব!"

ওদিকে দাঙ্গার সেই ভয়াবহ হাহাকার থেকে যেসব মুসলমান রক্ষা পেয়েছে তারা এখন একটি মাত্র স্বপ্ন দেখে : প্রতিশোধ! কড়ায়-গণ্ডায়! অনেকে একই কথা আমাদের বলল : "বাবুমশাইরা! আপনারা কলকাতা থেকে এসেছেন? আমাদের উপকার করতে? একটিমাত্র পথ আছে! বড় কর্তাদের কাছে তদ্বির তদারক করে আমাদের জন্য কিছু গান-লাইসেন্স বার করে দেন। ব্যস্! বাদবাকি কাজ আমাদের!"

গোটা এলাকায় ছোট ছোট 'ঘেট্টো' গড়ে উঠেছে। অস্থায়ী ছাপড়া। এখানে ওখানে। উইঢিপির মতো। যেসব গ্রাম হিন্দুপ্রধান সেখান থেকে মুসলমানেরা সপরিবারে সরে এসেছে মুসলিম-অধ্যুষিত গ্রামে এবং ভাইসি-ভার্সা! এই জাতীয় সাম্প্রদায়িক মেরুকরণের শেষ পরিণতি যে কী, তা সুধীজন মাত্রেই অনুমান করবেন!

কলকাতায় ফিরে এসে আমরা নিজেদের মধ্যে গভীরভাবে আলোচনা করলাম। কীভাবে অগ্রসর হওয়া উচিত? অভিজ্ঞ সমাজসেবী দাদারা বললেন, "সর্বপ্রথম শান্তি-পদযাত্রার আয়োজন কর। সাম্প্রদায়িক শান্তি-সমাবেশ আর মিলাদ-সরিফ!" কিন্তু আমাদের মনে হল তাতে কিছু লাভ হবে না। ভাগলপুর দাঙ্গার মাত্র ছয়মাস পূর্বে বাবা আমতে ঐ ভাগলপুর শহরেই 'ভারত জোড়ো' পদযাত্রা তো করে গেছেন। ভারত তো দূরের কথা—ভাগলপুরই তাতে জোড়া

লাগেনি! তাহলে?

আমরা জানতাম : ঐসব প্রতীকী শুভেচ্ছা, মৌখিক উপদেশ বা সহানুভূতি নিরর্থক। সমস্যাটা ওদের, সমাধান ওদেরই করতে হবে। আমরা বড়জোর অনুঘটকের ভূমিকা নিতে পারি। পজেটিভ ক্যাটালিস্ট। প্রথম কাজ হচ্ছে জীবনে-জীবন যোগ করা। স্থির হল, অন্তত ছয়মাসকাল ধরে প্রতি মাসে আমাদের এক-একটি ছোট দল ওখানে যাবে। গ্রামে গ্রামে ঘুরবে। ওখানে বাস করবে। ওদের জীবনের ভাগিদার হতে হবে। এভাবেই শুরু হল কাজ।

প্রাথমিক পর্যায়ে তিনটি গ্রাম আমরা বেছে নিয়েছিলাম : বাবুপুর, চান্দেরী আর রাজপুর। তিনটিই ভাগলপুরের কাছাকাছি গ্রাম। বাবুপুর হিন্দুপ্রধান গ্রাম। সেখানে কোন প্রাণহানি হয়নি, কিন্তু বর্তমানে গ্রামে একটিও মুসলমান নেই। ওদের বাড়িগুলো হয় অগ্নিদগ্ধ অথবা তার সদর দরজা হাট করে খোলা। জনমানবশূন্য। চান্দেরী ঐ ত্রয়ীর সবচেয়ে দুর্ভাগা গ্রাম। সেখানে হিসাবমতো পঁয়ষট্টি জন মুসলমান নিহত হয়েছিল একরাত্রে। যুবক-প্রৌঢ়-বৃদ্ধ নর ও নারী। মৃতদেহগুলি ফেলে দেওয়া হয়েছিল সংলগ্ন ঝিলে। যারা প্রাণে বেঁচেছিল তারা আশ্রয় নিয়েছিল রাজপুরে। সেটি মুসলমানপ্রধান গ্রাম।

প্রথম প্রথম আমরা এই তিনটি গ্রামে বারে বারে যেতাম। আমাদের মনে হল, যদি বাবুপুরের বাস্তুচ্যুত দশ-পনের ঘর মুসলমান পরিবারকে তাদের ফেলে-আসা ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারি তাহলেই মস্ত বড় একটা কাজ হবে। কিন্তু প্রাথমিক বাধা হল বাবুপুরেরই হিন্দু মোড়লেরা। তারা ক্রমাগত বলতে থাকে—মুসলমানেরা সর্বদাই মারমুখী! সরকার ওদের সুয়োরানীর ছেলে বলে মনে করে। ওদের উচিত শিক্ষা হয়েছে। ওদের গাঁয়ে ফিরিয়ে নেওয়া হবে না!

আমরা নিজেদের চিন্তাভাবনা ওদের উপর আরোপ করতে চাইতাম না। তাহলে আমাদের কাজ ব্যাহত হবে। আমরা বরং সক্রেটিসের মতো নানান প্রশ্ন তুলে ওদের কাছে উত্তর শুনতে চাইতাম। আর উত্তর দিতে গিয়ে ওরা নিজেদের ভুলগুলো বুঝতে পারত। আমরা জানতে চাইতাম—তোমাদের এই রাজপুর গাঁয়ের ঐ দশ-পনের ঘর মুসলমানকে সরকার কী কী বাড়তি সুবিধা দিয়েছে যা তোমরা পাওনি? ঐ দশ-পনের ঘর মুসলমানের মধ্যে কজন ছিল সরকারি চাকুরে? মানে, গাঁয়ের চৌকিদার, সরকারি পিওন বা ডাক-হরকরা? অথবা গাঁয়ের স্কুলে, পোস্টাপিসে কিংবা সমবায় প্রতিষ্ঠানে চাকুরিরত? ওরা আম্‌তা আম্‌তা করত। স্বীকার করত ঐ বিতাড়িতদের অবস্থা ছিল হিন্দুদের তুলনায় আরও খারাপ। অশিক্ষিত অবজ্ঞাত প্রায় সবাই মজুরচাষী! পড়িলিখি ইনসান

নয়। এবং শেষ পর্যন্ত বলত, ওরা নিজেদের গাঁয়ের মুসলমান বাসিন্দাকে কোন বাড়তি সুবিধা পেতে দেখেনি বটে,তবে অমুক-দাদা বলেছেন, সরকার ওদের সুয়োরানীর ছেলেদের মতো নেকনজরে দেখেন।

ঐ অমুক-দাদা বহিরাগত কোন রাজনৈতিক দলের নেতা! বলা বাহুল্য কোন দলের। ক্রমে এ-কথা ওরাও নিজমুখে স্বীকার করল : "মনিরুদ্দি, বসির, কামাল—ওরা মানুষ খারাপ ছিল না! ওদের অবস্থা ছিল আরও খারাপ। অধিকাংশ দিনই একবেলা খেত। অথবা উপবাস। তবে অমুকদা কিন্তু বললেন...." মুসলমানদের জমায়েতেও আমরা বৃথা সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করতাম না। প্রথম প্রথম আমরা নিশ্চুপ শুনে যেতাম ওদের নির্যাতনের কথা, আত্মীয়-বিয়োগের দুঃখের কথা। ক্রমে, ধীরে ধীরে আমাদের যুক্তিগুলো ওরা নিজেরাই শুনতে চাইল। আমরা ওদের মুখ দিয়েই বলাবার চেষ্টা করলাম যে, দু-দশটা বন্দুকের লাইসেন্স যোগাড় করে দিলেই সমস্যাটা মিটবে না! হেঁদুরাও তা জোগাড় করবে। ফলে গতবার ছিল টাঙি, রাম-দা, তলোয়ার—আগামী বার হবে বন্দুকের লড়াই! ওরা স্বীকার করল : জী? হক কথা! এটা কোন সমাধান নয়।

দু-পক্ষই জানত না—আমরা কাজে নামার আগেই আর একটা কাজ করেছিলাম: রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার করে একটি সরকারি আদেশ জারি করিয়েছিলাম—কী হিন্দু, কী মুসলমান কেউ কোন পরিত্যক্ত জমি, বাড়ি বা ভস্মীভূত ধ্বংসস্তূপ কিনে নিতে পারবে না! এটা ওরা জানত না। ফেলে আসা জমি-বাড়ি বেচতে গিয়ে আদালতে জানতে পারে। এই প্রাথমিক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল বলেই আমরা শেষ পর্যন্ত হিন্দু ও মুসলমান গ্রামবাসীদের নিজ নিজ ভিটায় ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছিলাম।

ভাগলপুর শহরে আমরা বেশ কিছু মানুষের সন্ধান পেয়েছিলাম—হিন্দু এবং মুসলমান—যারা নিজেদের প্রাণের ঝুঁকি নিয়েও বিধর্মী নরনারীকে বাঁচিয়েছে। আশ্রয় দিয়েছে, নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দিয়েছে। অধিকাংশই হিন্দু এবং প্রায় অশিক্ষিত নিরস্ত্র সাধারণ মানুষ—রিক্‌শাওয়ালা, দোকানদার, বাসের কন্ডাকটার, গঙ্গার পারানি নৌকার মাঝি। আমরা তাদের মাঝে মাঝে ধরে নিয়ে আসতাম আমাদের মুসলিম ভাইদের জমায়েতে।

ডক্‌টর খইরনার সংবাদপত্রের প্রতিনিধির কাছে বলেননি, কিন্তু তাঁর দলের একজন আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছিল—এ ব্যবস্থায় দু-জাতের উপকার হয়েছিল। প্রথম কথা, সেই দুর্যোগরাত্রিতে উন্মাদ নরপিশাচদের হাত থেকে সে সব মুসলমান তাঁদের জান-মান বাঁচাতে পেরেছিলেন তাঁরা তাঁদের রক্ষাকারীদের স্বচক্ষে দেখে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতেন।

সমাজসেবী দলের প্রতি বিশ্বাসযোগ্যতা বৃদ্ধি পেত। জানের পরোয়া না করে যারা বিধর্মীকে বাঁচাতে চেয়েছিল তাদের নিয়ে জমায়েতে খুব নাচানাচি করতেন—তাদের মিঠাই খাওয়াতে চাইতেন। অন্যদিকে যেসব 'অমুকদাদা' সাম্প্রদায়িকতাকে মূলধন করে রাজনীতি ব্যবসায়ে অবতীর্ণ হয়েছিল ওসব গ্রামে তাঁদের যাতায়াতটা কমে গেল। তাঁরা ক্রমেই আবাঞ্ছনীয় বাহিরের লোক বলে গ্রামে চিহ্নিত হয়ে যেতে থাকেন। আবার ফিরে আসা যাক সাক্ষাৎকারের প্রসঙ্গে :

ভাগলপুর শহরের অবস্থাটা বুঝতে পারবেন এই কথা থেকে : ট্রেনে বা বাসে কেউ যদি রাত আটটার পর শহরে এসে পৌঁছতো তাহলে স্টেশন-প্ল্যাটফর্মে বা বাসস্ট্যান্ডে রাতটা কাটিয়ে পরদিন সকালে বাড়ি ফিরত। সন্ধ্যার পর গোটা শহরটা হয়ে যেত জঙ্গলের রাজত্ব—গণহত্যার ছয়মাস পরেও। কিছু রাজনীতি-ব্যবসায়ী আর তাঁদের তাঁবে কর্মরত পুলিশ ও প্রশাসন নির্বিকার। বস্তুত তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতাতেই অপরাধজীবী মস্তানেরা ছিল রাতের ভাগলপুরের হর্তকর্তাবিধাতা। আমরা দু-দলের মানুষকেই বোঝাতে চাইতাম : এভাবে কতদিন চলবে? ভাগলপুর শহরের লক্ষ লক্ষ মানুষ এককাট্টা হয়ে ঐ দু-দশজন গুণ্ডাকে কব্জা করতে পারবে না? এ কি হয়? শেষ পর্যন্ত ওরা রাজি হয়ে গেল। প্রতিটি মহল্লায় গড়ে উঠল এক একটি শান্তিরক্ষা বাহিনী। তাতে সব জাতের মানুষকেই ওরা গ্রহণ করেছে : হিন্দু,—ব্রাহ্মণ, যাদব, ভুঁইহার, রাজপুত; মুসলমান—শিয়া ও সুন্নি। অপরাধজীবী মস্তানদের পৃষ্ঠপোষকেরা ধীরে ধীরে সংযত হলেন। কারণ ক্রমে ক্রমে গোটা শহরে এইরকম দেড়শটি শান্তিবাহিনী গড়ে উঠল—প্রতিটি মহল্লায়। মস্তানেরা সড়ে পড়ল—কেউ রাঁচি, কেউ ধানবাদ, নতুন এমপ্লয়ারের সন্ধানে। এখন ভাগলপুর শহরে মাঝরাতে কোন যাত্রী ট্রেনে বা বাসে এসে পৌঁছলে রিকশা নিয়ে বাড়ি চলে যায়।

আমাদের 'অপারেশন ভাগলপুর' চরম সাফল্যলাভ করল অযোধ্যায় বাবরি-মসজিদ ধ্বংসের পর। আশ্চর্যের কথা নয়? সাম্প্রদায়িক স্পর্শকাতর ভাগলপুর শহরে বা সংলগ্ন গ্রামে তার কোন প্রতিক্রিয়াই হল না—অর্থাৎ বিরূপ প্রতিক্রিয়া। প্রতিবাদ সভা হয়েছিল—হ্যাঁ দুবারই। বাবরি মসজিদ ধ্বংসের পর এবং বোম্বাই বিস্ফোরণের পর। সভায় হিন্দু বক্তারা নিন্দা করলেন অযোধ্যায় বাবরি মসজিদ যারা রাজনৈতিক কারণে ধ্বংস করেছিল সেই মৌলবাদী হিন্দুদের এবং সেই সওয়ালের জবাব দিলেন মুসলমান বক্তার দল রাজনৈতিক কারণে যেসব মৌলবাদী মুসলমান বোম্বাই বিস্ফোরণ ঘটিয়ে ছিল, তাঁদের। এটা 1993-এর ঘটনা। সব শেষে জানাই, অধিকাংশ গ্রামেই বাস্তুচ্যুত মুসলমান পরিবার—ঐ

মনিরুদ্দি, বসির, কামালের দল—জরু-গরু নিয়ে ফিরে এসেছে। যে-যার বাপ-পিতেমোর ভিটেতে। আল্লাতালার কাছে তারা তাদের হেঁদুভাইদের জন্য আজ মোনাজাত করে।

*　　*　　*

জানি, অন্তত আন্দাজ করতে পারি, আপনারা এবার আমাকে কী জাতের প্রশ্ন করবেন। আপনারা জানতে চাইবেন : ভাগলপুরে ওঁরা যে অসম্ভবকে সম্ভব করলেন তা কি আমরা বাস্তবায়িত করতে পারি না এই হবু-কল্লোলিনী কলকাতা শহরে? প্রতিটি মহল্লায় মিলিত হিন্দু-মুসলমানের শান্তিরক্ষা বাহিনী গঠন করে? কসবায়, বানতলায়, বিরাটিতে, রাজাবাজার আর এইচ. এম. কলিমুদ্দীন-ছায়েবের এলাকায় সেই কী-যেন-নাম কানা গলিটায়, যেখানে অনধিকার প্রবেশ করার দুর্মতি হয়েছিল ডি.সি.পোর্ট বিনোদ মেহ্‌তার?

আজ্ঞে না, জবাব আমি দেব না। ডক্টর খইরনারের নিষেধ আছে। যার সমস্যা সে নিজেই সমাধান করবে। আমি কথা-সাহিত্যিক : ক্যাটালেটিক এজেন্টমাত্র। পজেটিভ ক্যাটালিস্ট!

আমি বরং আমার সেই খেই-হারানো গল্পটায় ফিরে যাই। সেই জামালুদ্দীন-জুলেখা-রসিদের ত্রিকোণাকৃতি কাহিনীতে।

সাত

না। তার আগে আপনাদের আর একটি দাঙ্গাবিধ্বস্ত জনপদের সত্যকাহিনী শোনাই। দুঃখের কথা, এসব খবর বাঙলা পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয় না। দাঙ্গার বীভৎসতা নেই, উদ্দীপনা নেই—এ কাহিনী পাঠক 'খাবে' না। আমি এ সত্যঘটনাটি প্রথম জেনেছিলাম আহমেদাবাদে, আমার পুত্রের বাড়িতে—একটি স্থানীয় ইংরেজি সংবাদপত্রের রবিবাসরীয়তে। পরে উদয় মহুরকার 'A Symbol of Hope' নামে একটি স্পেশাল রিপোর্ট প্রকাশ করেন 'ইন্ডিয়া টুডে'তে (15.2.1994, পৃঃ 85-88)। ঘটনাটা শুনুন :

আমেদাবাদ শহরের মাইল-পঞ্চাশ উত্তরে সিদ্ধপুর একটি প্রাচীন জনপদ। কোন্ বিস্মৃত অতীতে একজন জৈন সন্ন্যাসী নাকি এখানে সিদ্ধ হয়েছিলেন। এখন ওর চলতি নাম সিধ্‌পুর। লোকসংখ্যা বর্তমানে প্রায় পঞ্চাশ হাজার। একাশির আদমসুমারীতে হিন্দু গ্রামবাসী ছিল অর্ধেকের কিছু বেশি, একানব্বইতে তারা সংখ্যায় আধাআধির কিছু কম। হিন্দু ও মুসলমান মহল্লা সুচিহ্নিত। তবে ঐ! কোথাও-কোথাও এ সম্প্রদায়ের মানুষ

ওদের গাড়ুর ভিতর নাক গলিয়েছে, কোথাও ও সম্প্রদায় সেঁদিয়েছে এদের বদনায়! গ্রামে একটি প্রাচীন মন্দির আছে, আছে একটি মসজিদও। শতাব্দীর পর শতাব্দী ওরা মিলে-মিশে স্বচ্ছন্দে ছিল—তারপর কী যে হয়! হঠাৎ একদিন জ্বলে ওঠে সাম্প্রদায়িক আগুন! স্বাধীনতার পর তিন তিন বার সিধ্‌পুরে বড় জাতের দাঙ্গা হয়েছে। তার ভিতর একবার তো টানা বাইশ দিন এখানে কার্ফু জারি রাখতে হয়েছিল, মিলিটারির টহলদারিতে। দৈনিক দু-ঘণ্টা বাজার খুলত।

এই সিধ্‌পুরে স্বাধীনতা-উত্তরকালে চতুর্থবার বেধে গেল আবার একটি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। বাব্‌রি মসজিদ ধূলিসাৎ হবার ঠিক পরের দিন : 7.12.1992 তারিখে।

মুসলমান মহল্লা থেকে একটি উন্মত্ত জনতা আক্রমণ করল হিন্দুদের এলাকা। এরাও তৈরি ছিল। ফলে মারাত্মক কিছু ঘটল না। কিন্তু আক্রমণকারী দলের একটা দলছুট অংশ বেমক্কা পাঁচিল টপকে ঢুকে পড়ল মানুভাই দাভের ভদ্রাসনে।

দাভেরা সিধ্‌পুরের সম্ভ্রান্ত এবং সম্পন্ন বাসিন্দা। যৌথ পরিবার। ওঁরা তিনভাই—বুড়োকর্তা মানুভাই দাভে, বাহাত্তর, রাশভারী মানুষ। স্ত্রী বিয়োগের পর ধর্মকর্ম নিয়েই থাকেন। মেজভাই, ভোগীলাল, ছাপ্পান্ন; অকৃতদার। ব্যবসাপত্র নিয়ে ব্যস্ত, সংসারের সব দায়ঝক্কি তাঁর কাঁধে। বিশেষ প্রয়োজন না হলে সংসারের কাজে তিনি দাদাকে বিব্রত করেন না। আর ছোট মহেন্দ্রভাই না-না করতে করতে এই সম্প্রতি চল্লিশ বছর বয়সে সাদি করেছে। স্বজাতির এক স্কুল-মিস্ট্রেসকে। তার স্ত্রী মীরাবাঈ তখন সন্তান-সম্ভবা।

সেই দুর্যোগরাত্রে দাঙ্গা যখন থামল তখন দেখা গেল দাঙ্গাবাজেরা তরোয়ালের কোপে মহেন্দ্রভাইয়ের মুণ্ডুটা ঘাড় থেকে নামিয়ে দিয়ে গেছে। তার দেহটা সিঁড়ির চাতালে, মুণ্ডুটা সিঁড়ির নিচে গড়াগড়ি খাচ্ছে। একমাত্র তার গর্ভিণী স্ত্রী ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শিনী।

সিধ্‌পুরের বড় দারোগা করিৎকর্মা অফিসার। তেত্রিশ জনকে গ্রেপ্তার করে আনলেন। শুরু হল মামলা। নিম্ন আদালত তেত্রিশজনকেই দায়রায় সোপর্দ করল—অনধিকার প্রবেশ, বে-আইনি জনসমাবেশ, এবং দাঙ্গা! 'রায়টিং চার্জ!' আর প্রফেসর জামালউদ্দীন চৌধুরীর বিরুদ্ধে 'ডেলিবারেট মার্ডার চার্জ'।

মামলা চলছে। মাসের পর মাস। ইতিমধ্যে মীরার একটি কন্যাসন্তানও হয়েছে। মগনভাই বারোত ঐ তেত্রিশজনের অ্যাডভোকেট। মগনভাই আমেদাবাদের নামকরা উকিল। মানুভাইয়ের সমবয়সী এবং বন্ধুস্থানীয়। কিন্তু এ মামলায় তেত্রিশজন অপরাধীর পক্ষ গ্রহণ করায় ইদানীং দাভে পরিবারের সঙ্গে আর বিশেষ সদ্ভাব নেই। মগনভাই ইন্দিরা কংগ্রেসের একজন স্বনামধন্য রাজনীতিক—পূর্ববর্তী ইন্দিরা জমানায় গুজরাটের

সমবায় মন্ত্রী পর্যন্ত হয়েছিলেন। এই রাজনৈতিক প্রভাব আছে বলেই মুসলিম মোড়লেরা ঐ বিধর্মীকে মামলা পরিচালনার গুরুদায়িত্বটা দিয়েছে। অবশ্য মগনভাইয়ের জুনিয়র হিসাবে কাজ করছে তরুণ অ্যাডভোকেট উজির খান পাঠান। ঘটনাচক্রে তার তুলো-ব্যবসায়ী বাপজানের সঙ্গে মানুভাইয়ের ব্যবসাসূত্রে জান-পহচান আছে, আর সেজন্য উজির খান এই দাভে পরিবারের পরিচিত। বৃদ্ধ মানুভাইকে ছেলেবেলা থেকেই সে 'আঙ্কল' ডাকে।

মামলা এখন প্রায় অন্তিম পর্যায়ে। বাদী-প্রতিবাদী দু-পক্ষেরই যাবতীয় সাক্ষীর তালিকা শেষ হয়েছে। বাকি আছে পি. পি. আর ডিফেন্স কাউন্সেলের শেষ সওয়াল। এই সময় একদিন মগনভাই বারোত সিধ্‌পুরে এলেন তাঁর মক্কেলদের সঙ্গে শেষ পরামর্শ করতে। রুদ্ধদ্বার কক্ষে বিশ্বস্ত আট-দশজন প্রথমশ্রেণীর নেতাকে ডেকে বললেন, আমি যা বুঝেছি, দু-চারজন বেকসুর খালাস হলেও হতে পারে। কিন্তু বিশ-পঁচিশ জনেরই মেয়াদ হয়ে যাবে—দু-চারমাসের জন্য। কারণ 'রায়টিং চার্জ' আর অনধিকার প্রবেশের অপরাধটা প্রতিষ্ঠিত। আর আমার আশংকা প্রফেসর চৌধুরীকে বিচারক গিল্‌টি হিসাবেই রায় দেবেন। ফাঁসি হয়তো হবে না, তবে মনে হয় যাবজ্জীবনটা ঠেকানো যাবে না।

সবাই নতমস্তকে সংবাদটা হজম করে। শেষমেষ উজির খান বলে, কিন্তু প্রফেসর চৌধুরী তো বিকৃতমস্তিষ্ক—উনি তো স্বাভাবিক নন।

—সব সময় নয়। কখনো উনি সম্পূর্ণ নর্মাল। কখনো কখনো অবশ্য একেবারে উন্মাদের মতো আচরণ করেন। মহেন্দ্রভাইয়ের মৃত্যুমুহূর্তে তিনি কী ছিলেন তা কে বলবে? তাছাড়া উনি নিজেই বিচারককে কটুকথা বলে চটিয়ে দিয়ে বসে আছেন। হয়তো হায়ার-কোর্ট-এ শাস্তির বহরটা কমানো যাবে, যদি অবশ্য সেখানেও উনি কাঠগড়ায় উঠে পাগলামি না করেন।

উজির খান আবার বলে, কিন্তু স্যার, আপনি তো জানেন, তরোয়ালের কোপটা প্রফেসর জামালুদ্দীন চৌধুরী আদপেই মারেননি। তাঁর হাতে কোন অস্ত্রই ছিল না। বাড়ি থেকে খালি হাতে গেছিলেন তিনি।

মগনভাই দৃঢ়ভাবে মাথা নেড়ে বলেন, না! আমি তা জানি না। তোমরা বারে বারে সে কথা বলেছ—তুমি সেটা আর্গুও করেছ কিন্তু প্রতিষ্ঠা করতে পারনি। কারণ মৃতের স্ত্রী দু-দুবার আইডেন্টিফিকেশন প্যারেডে প্রফেসর চৌধুরীকে সনাক্ত করেছে।

উজিরভাই বিরক্ত হয়ে বলে, বড়াভাই! কী বলব? মীরা বহিন দু-বার ছেড়ে দু-হাজারবার সনাক্ত করলেও যেটা মিথ্যা সেটা তো আর সত্যি হয়ে যাবে না। আমি যে জানি, জামালুদ্দীন-সাহেবের হাতে তরোয়ালটা ছিল না। কোপটা তিনি মারেননি।

—কোন্ যুক্তিতে ও কথা বলছ উজির?

—যুক্তি-ফুক্তি বাদ দিন, স্যার! আমি যে জানি! আই নো ইট! মানে, আমি জানি—কে কোপটা মেরেছিল!

—জান? তুমি জান? কীভাবে জেনেছ? কে সে?

—সে আমার কাছে কবুল খেয়েছে। বলেছে, আমাদের দলের আর কেউ তখন ছিল না—শুধু ওরা দুজন! সে আমার হাতেপায়ে ধরে বলেছে, যেমন করে পারেন ওঁকে বাঁচান! বলেছে, মীরা দাভে ভুল বলছে। কোপটা প্রফেসর-সাহেব মারেননি। ওঁর হাতে তরোয়াল ছিলই না। শেষ কথা, ও বলেছে, কোপটা আমিই মেরেছিলাম।

মগনভাই গম্ভীর হয়ে বললেন, কে সে? আমাকে তার নাম বল?

উজিরখান মসজিদের বড়-ইমাম হাজী ইমামবক্সের দিকে তাকায়।

হাজী-সাহেব বললেন, সচ বাত মগনভাইসা'ব! কমবক্তটা আমার কাছেও কবুল খেয়েছে। 'তওবা' করেছে।

'তওবা' অনেকটা খ্রীস্টানদের 'কনফেশনের' মতো। পাদরি যেমন কনফেশনের কথা পাঁচজনকে বলতে পারেন না, মসজিদের ইমামও তেমনি কারও 'তওবা'-র কথা প্রকাশ্যে জানাতে পারেন না।

মগনভাই জানতে চাইলেন, সে এখন এঘরে আছে?

হাজীসাহেব তাঁর শাদা-দাড়িতে হাত বুলাতে বুলাতে বললেন, মাফ্ কিজিয়ে ওকিলসা'ব। য়ে বাৎ ম্যয়নে কহ নেহী সেকতা!

মগনভাই উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, তাহলে উজিরখানকেই শেষ সওয়ালটা করতে বলুন! আমাকে যখন আপনারা বিশ্বাস করতেই পারছেন না তখন আমাকে বিদায় দিন!

* * *

প্রফেসর জামালুদ্দীন চৌধুরী অহেতুক বিচারককে চটিয়ে দিয়েছিলেন। আদালত তাঁকে প্রশ্ন করেছিল, তিনি ঐ চার্জ শুনে নিজেকে কী মনে করছেন। দোষটা না নির্দোষ?

প্রফেসর-সাহেব জবাব বলেছিলেন, আমি জানি না!

—'জানি না' মানে?

—'জানি না' মানে জানেন না? I don't know! নাহং বেদ! ম্যয়নে নেহী জানতা!.....

বিচারক ধমকে উঠেছিলেন, ডোন্ট বি ফ্রিভলাস, প্রফেসর চৌধুরী! আদালত কীভাবে বিশ্বাস করবে যে আপনি নিজেই জানেন না : আপনি তরোয়ালের কোপটা মেরেছিলেন অথবা মারেননি!

—এ প্রশ্নের জবাব তো আমার দরখাস্তের সঙ্গে সংলগ্ন সাইকিঅ্যাট্রিস্টের সার্টিফিকেটেই আছে, য়োর অনার। আমি মাঝে মাঝে স্মৃতিশক্তি হারিয়ে ফেলি—খুব

বেশি উত্তেজিত হয়ে পড়লে। সেই ভাগলপুর দাঙ্গার পর থেকে। তখন আমার বাহ্যজ্ঞান লোপ পায়। এক্ষেত্রেও তাই হয়েছিল দাভে-সাহেবের মোকামে।

মগনভাই বাধা দিয়ে বলেছিলেন, প্রফেসর চৌধুরী। আপনি কোন ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করবেন না। আপনাকে যে প্রশ্ন করা হয়েছে শুধু তার জবাব দিন : ডু য়ু প্লীড্ গিল্‌টি অর নট-গিল্‌টি?

প্রফেসর মগনভাইয়ের দিকে ফিরে বলেছিলেন, প্লিজ কীপ কোয়ায়েট! আমার সঙ্গে বিচারকের যখন কথা হচ্ছে...

—আপনি কি ভুলে গেছেন যে, আমি আপনারই ডিফেন্স কাউন্সেল!

—না ভুলিনি, অ্যাডভোকেট মগনভাই বারোত, কিন্তু বিচারককে জিনিসটা বোঝানো দরকার!

বিচারক অবশ্য বুঝতে রাজি হননি। ওঁকে বসিয়ে দেন।

জামালুদ্দীন-সাহেবের এই মারাত্মক মানসিক অসুখটার সূত্রপাত ভাগলপুর রায়টের সময়। ভাগলপুর রায়টের মাস-চারেক আগে উনি পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সে প্রথম সাদী করেন—তালাক পাওয়া একটি মেয়েকে : জুলেখা। মানুষ ভাবে এক আর বাস্তবে ঘটনা ঘটে অন্যরকম। চৌধুরী-সাহেব ভেবেছিলেন জিনিসটা খুবই সহজ। রসিদ আহমেদের একটা গচ্ছিত ধনের জিম্মাদারী। মাস তিনেক তাকে 'সেফ্ কাস্টডি'তে রেখে যার ধন তাকে ফেরত দেওয়া। একটা হীরে-বসানো সোনার মুকুট হলে যেটা সম্ভবপর হত। এক্ষেত্রে তা হল না কারণ গচ্ছিত সম্পত্তি একটি সজীব পদার্থ। তার চেয়েও বড় কথা একটি উদ্ভিন্নযৌবনা রমণীর মন! প্রথম দিন-সাতেক কোন অসুবিধা হয়নি। তারপর একদিন বাইরের ঘরের ক্যাম্প-কটটা তুলতে তুলতে জুলেখা হঠাৎ বলে বসল, আজ থেকে, স্যার, আপনি ওঘরেই শোবেন। বাইরের ঘরে আপনার একা শোওয়া চলবে না।

জামাল-সাহেব অবাক হয়ে বলেছিলেন, কেন?

—ওপরের ওঁরা ব্যাপারটা জেনে গেছেন। কাল হেকিম-সাহেবের বিবি আমাকে আড়ালে ডেকে খুব ধমক দিয়েছেন। বলেছেন, এতে নাকি গুনাহ্ হয়!

জামাল-সাহেব বিব্রত হয়ে বলেছিলেন, কিন্তু ঐটুকু খাটে আমরা দুজন শোব কী করে। তাহলে ঐ ঘরেই বরং ক্যাম্পকটটা পাত!

জুলেখা মুখ লুকিয়ে হেসেছিল। বলেছিল, ঘরে ক্যাম্পখাট পাতবার জায়গা কোথায়? তা, আপনার কিছু অসুবিধা হবে না, স্যার, আমার শোয়ার ভঙ্গি খুব ভাল। আপনার গায়ে ছোঁয়া লাগবে না। এক কাতে সারারাত কেটে যায়।

বাস্তবে তা যেত না কিন্তু। দু-একদিনের ভিতরেই সেটা জামালুদ্দীন অনুভব করলেন। শুধু মন দিয়ে না, দেহ দিয়ে। হয়তো ঘুমের ঘোরে—কে জানে—জুলেখার একটি

অনাবৃত সুডৌল বাহু এসে পড়ত চৌধুরী-সাহেবের কণ্ঠ বেষ্টন করে। ভাদ্রের গরম—জুলেখা জ্যাকেট এবং বক্ষবন্ধনী খুলে রেখে শুতে আসত।

তারপর এক প্রচণ্ড বর্ষণমুখর রাত্রে—যখন দুরন্ত ঝটিকায় গাছের ডালপালা আছাড়ি-পিছাড়ি করছে, সিদ্ধাঙ্গনাদের আশঙ্কা হচ্ছে পবন পর্বতশৃঙ্গকে অপহরণ করতে উদ্যত, মুহুর্মুহু বিদ্যুৎচমকে বিস্রস্তবসনা জুলেখার যৌবনপুষ্ট তনুদেহ একবার নয়নগোচর হচ্ছে একবার তমিস্রায় হারিয়ে যাচ্ছে, তখন জলিল-সাহেব সংযম হারালেন। 'জ্ঞাতাস্বাদো'রাই পারে না স্থির থাকতে, অজ্ঞাতস্বাদো 'বিবৃতজঘনাং কো বিহাতুম্ সমর্থঃ'?

ঠিক তিনমাস অতিক্রান্ত হলে এসে উপস্থিত হল রসিদ আহমেদ। গচ্ছিত সম্পত্তি উদ্ধার মানসে। ততদিনে অধ্যাপক-মশাই বিবাহিত-জীবনে রীতিমতো অভ্যস্ত। তাঁর দৃঢ়বিশ্বাস, জুলেখার আত্মসমর্পণের তৃণমূলে ছিল একটি নিষ্কাম কৃতজ্ঞতাবোধ। কিন্তু সব কিছুরই তো বিবর্তন হয়। কখন সেই উদ্ভিন্নযৌবনার কৃতজ্ঞতাবোধ প্রেমে রূপান্তরিত হল—একান্তচারী দুটি নরনারীর স্বাভাবিক পরিণতিতে সে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল তা জুলেখা নিজেই জানে না। রসিদের আবির্ভাবে সে যে নিরঙ্কুশ ভাবে উৎফুল্ল হয়েছিল তা মনে হয়নি জামালউদ্দীন চৌধুরী-সাহেবের।

তবে কথার খেলাপ তিনি হতে দেননি। জুলেখার মতামত নেবার প্রশ্নই ওঠেনি। অনতিবিলম্বে জামাল-সাহেব জুলেখাকে মুক্তি—না, মুক্তি নয়, 'তালাক' দিলেন এবং রসিদ তাকে নিকা করে নিয়ে গেল প্রফেসর চৌধুরীকে অসীম কৃতজ্ঞতা জানিয়ে।

হেকিম-সাহেব ব্যাপারটা জানতেন। তিনি বিস্মিত হলেন না আদৌ। রসিদের কথা থেকে চৌধুরী-সাহেব জানতে পারলেন, রসিদ তার আব্বাজানের সঙ্গে তক্‌রার করে গৃহত্যাগ করেছে। রসিদ যে জুলেখাকে পুনর্বিবাহ করতে চায় এটা তার আব্বার পছন্দ হয়নি। রসিদ মাস-তিনেক আগে চলে গিয়েছিল ভারতের পশ্চিমপ্রান্তে—গুজরাটের একটি আধা-শহর আধা-গণ্ডগ্রামে। ওর এক দোস্ত সেখানে মটোর-গাড়ি মেরামতির দোকান খুলে বসেছে। বেশ জাঁকিয়ে ব্যবসা করছে; কিন্তু এঞ্জিন রিপেয়ারিঙের কাজ জানা দক্ষ মিস্ত্রি সে পাচ্ছিল না। রসিদ বিনা ক্যাপিটালে ঐ দোকানের এক-তৃতীয়াংশ লাভের শর্তে ওর কারখানায় যোগ দিয়েছে।

জুলেখাকে নিকা করে সে আহ্‌মেদাবাদে ফিরে গেল।

যাবার আগে জুলেখা জনান্তিকে জামাল-সাহেবকে ডেকে বলল, আপনাকে একটা কথা বলার ছিল। মানে, একটা অনুরোধ। বলুন, রাখবেন?

—বল? তোমাকে অদেয় আমার কিছুই নেই—সে কথা তো তুমি জান, জুলেখা।

—মানে,...ইয়ে...ওকে সব কথা বলবেন না।

—সব কথা? মানে?

—আহা! বোঝেন না যেন! ওর বিশ্বাস—আমরা দুজন—কীভাবে বলব?

—বুঝেছি, জুলেখা! না, আমি কোনদিন রসিদকে সে-কথা বলব না! সে তোমার খসম্, কিন্তু পুরো তিনটে মাস তো তুমি আমার বৈধ স্ত্রী ছিলে। স্বামী-স্ত্রীর গোপনকথা কি তৃতীয় ব্যক্তিকে বলতে হয়? তুমিও বল না!

ওরা দুজনে যেদিন আহ্‌মেদাবাদে ফিরে গেল সেদিন কী জানি কেন জুলেখা বুকফাটা কান্না কেঁদেছিল। সেকি শুধু কৃতজ্ঞতায়? না প্রিয়-বিয়োগের হিজরে (বিরহে)?

তার একমাসের মধ্যেই হল ভাগলপুরের বীভৎস দাঙ্গা! শুধু ভাগলপুর শহরেই হাজারের উপর মানুষ নিহত হল। আশপাশের গ্রাম নিয়ে গোটা জেলায় মৃতের সংখ্যা প্রায় আড়াই হাজার।

বড়াবিবি মহল্লায় হেকিম-সাহেবের মোকাম আক্রান্ত হয়েছিল। নিরস্ত্র প্রৌঢ় অধ্যাপকটি কাঠের একটা মশারির ছত্রী টেনে নিয়ে বাধা দিতে গিয়েছিলেন। তরোয়ালের এক কোপে সেটা দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেল! পাশ থেকে কে যেন প্রচণ্ড আঘাত করল ওঁর মাথায়—লাঠির বাড়ি। পড়ে গেলেন মেঝের উপর। উন্মত্ত নরপশুগুলো একে একে দ্বিখণ্ডিত করল ওঁর চোখের সামনে হেকিম-সাহেবকে, তাঁর স্ত্রী, পুত্র, পুত্রবধূ ও কন্যাকে। 'হর-হর, ব্যোম-ব্যোম' ধ্বনি দিতে দিতে। দুই কনুইয়ের ভর দিয়ে উনি উঠে বসতে চেয়েছিলেন। ওদের দলপতি ওঁর মাথায় দ্বিতীয়বার আঘাতে করে পেড়ে ফেলল।

দাঙ্গাবাজদের ধারণা হয়েছিল জামালসাহেব মৃত। মরলে মুক্তি পেতেন। পেলেন না। ছত্রিশ ঘণ্টা পরে পুলিশ এসে অচৈতন্য মানুষটাকে উঠিয়ে নিয়ে হাসপাতালে পাঠাল। প্রাণে বেঁচে গেলেন বটে ; কিন্তু মস্তিষ্কের কোন অজ্ঞাতরাজ্যে কী-একটা ওলট্-পালট্ হয়ে গেল। মাঝে মাঝে উনি উন্মাদ হয়ে যান। তখন তাঁর বাহ্যজ্ঞান থাকে না। আবার আপনিই অভিজ্ঞান ফিরে আসে।

রসিদ খবর পেয়ে এসেছিল। ততদিনে উনি হাসপাতলে থেকে ছাড়া পেয়েছেন। বড়াবিবি মহল্লার সেই শূন্য মোকামে ওঁকে ফিরে যেতে দেওয়া হয়নি। উনি ওঁর এক ছাত্রের বাড়িতে বৈঠকখানায় শয্যাশায়ী ছিলেন। ছাত্রটি কিন্তু হিন্দু! অর্থাৎ যে ধর্মের মানুষ ওঁর মাথায় লাঠির বাড়ি মেরেছিল সেই ধর্মেরই মানুষ!

রসিদ ওঁকে সিদ্ধপুরে নিয়ে গেল।

উনি তার বাড়িতে থাকতে রাজি হলেন না। কী জানি, মনের উপর যখন লাগাম থাকে না তখন যদি বিসদৃশ কিছু করে বসেন! কিন্তু জুলেখাও কিছুতে রাজি হল না ওঁকে অন্য বাসা ভাড়া করে থাকতে।

সে আজ প্রায় তিন বছর আগেকার কথা। এখন উনি অনেকটা সুস্থ। বাড়িতে প্রাইভেট টুইশানির ব্যবস্থা করেছেন। অনেকগুলি ছেলে আর মেয়ে—হিন্দু এবং

মুসলমান—প্রতিদিন ওঁর কাছে পালা করে ইংরেজি শিখতে আসে।

জুলেখার বিষয়ে যে ভয়টা পেয়েছিলেন, দেখা গেল সেটা অমূলক। জুলেখা ঐ তিনমাসের প্রসঙ্গ আদৌ ওঠালো না। উনিও সতর্কভাবে সেটা এড়িয়ে এসেছিলেন এই তিন বছর।

তারপর ধীরে ধীরে পরিবর্তন শুরু হল সিধ্‌পুরের মুসলমান সমাজের মধ্যে। কট্টর মৌলবাদী সম্প্রদায়ের একটি শাখা-অফিস ওখানে খোলা হল। তাদের অফিসে যিনি এসে বসলেন নেতৃত্ব দিতে সেই মৌলভি সা'বের বক্তব্য : তোমরা গোপনে অস্ত্রশস্ত্র বানিয়ে তৈরি হও! হেঁদুরা যদি বাবরি মস্‌জিদের একটা ইটও খুলে ফেলার চেষ্টা করে তাহলে সিধ্‌পুরে একটা কাফেরকেও বাঁচতে দেওয়া হবে না! বেরোদানে ইসলাম!

বাবরি মস্‌জিদ যেদিন ধ্বংস করা হল তার ঠিক পরের দিন মধ্যরাত্রে মৌলভি সা'ব-এর নেতৃত্বে এক সশস্ত্র জনতা গেল হিন্দু-মহল্লা আক্রমণ করতে। চৌধুরী সা'ব কিছুই জানতেন না। বাইরের বৈঠকখানা ঘরে প্রতিদিনের মতোই ঘুমাচ্ছিলেন। হঠাৎ ঘুম থেকে ওঁকে ডেকে তুলল জুলেখা। বলল, সর্বনাশ হয়ে গেছে! রসিদ কোথা থেকে একটা তরোয়াল জোগাড় করে আক্রমণকারী দলের সঙ্গে গেছে হিন্দু-মহল্লায়।

জামাল-সাহেব নিজের মনে ছিলেন এতদিন। মৌলভি-সাহেবের বক্তৃতা বা বক্তব্য শুনতে জমায়েতে একদিনও শামিল হননি। এখন জুলেখার মুখে শুনে তিনি রীতিমতো উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠেন। লুঙ্গিটা ছেড়ে প্যান্ট-শার্ট পরে খালি হাতেই রওনা দেন রসিদকে ফিরিয়ে আনতে।

তার পরের ঘটনাগুলো উনি ঠিক পর-পর মনে করতে পারেন না। এটুকু মনে আছে প্রৌঢ় মানুষটাকে পাঁচিল টপকে ঢুকতে হয়নি। আহত দ্বারপাল কাটা-সৈনিকের মতো পড়ে আছে খোলা গেটের একপাশে। ভিতরে মশাল হাতে কারা যেন ছোটাছুটি করছে। মাঝে মাঝে ভেসে আসছে মশালধারীদের রণহুঙ্কার : আল্লাহু আকবর!

জামাল-সাহেব বিনা বাধায় গিয়ে উপস্থিত হলেন একতলায় সিঁড়ির মুখে। দেখলেন, নগ্ন তরবারি হাতে রসিদ সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠছে। সিঁড়ির ল্যান্ডিঙে দাঁড়িয়ে আছে একজন মধ্যবয়সী যুবক—পরে জেনেছিলেন, তার নাম মহেন্দ্রভাই। তার হাতে—আশ্চর্য! একটা কাঠের মশারির ছত্রী! ঠিক যে-অস্ত্রটা তিনি একদিন নিজেই বেছে নিয়েছিলেন হেকিম-সাহেবের স্ত্রী-পুত্র-পরিজনকে রক্ষা করতে। আর সিঁড়ির মাথায় একজন সীমন্তিনী গর্ভিণী নারী! ঐ মশারির ছত্রীটাতেই সব ওলট পালট হয়ে গেল। মহেন্দ্রভাইয়ের মধ্যে নিজেকে আবিষ্কার করলেন প্রফেসর চৌধুরী। তিনি তিনলাফে পৌঁছে গেলেন ল্যান্ডিঙে। কিন্তু তার আগেই রসিদ একটা কোপ মেরেছে। মহেন্দ্রভাই'কে স্পর্শ করতে পারেনি। তরোয়ালের কোপে শুধু দ্বিখণ্ডিত হয়েছে কাঠের

ছত্রিটা—ঠিক যেমন হয়েছিল তাঁর ক্ষেত্রে। জামাল-সাহেব ঝাঁপিয়ে পড়লেন রসিদের উপর। তাকে বাধা দিতে। তার হাত থেকে তরোয়ালটা ছিনিয়ে নিতে। রসিদ তখন হত্যা-উন্মাদনায় বেদিল। এক প্রচণ্ড ধাক্কা মারল ওঁকে না চিনেই!

তারপর আর ওঁর খেয়াল নেই। উনি তরোয়ালটা কেড়ে নিতে পেরেছিলেন কি পারেননি। সিঁড়ির ব্যালাসট্রেডে মাথায় আঘাত লেগে উনি পড়ে গিয়েছিলেন কি পড়েননি, কিছুই স্মরণ হয় না। লোকমুখে শুনেছেন মহেন্দ্রভাইয়ের দ্বিখণ্ডিত মুণ্ডটা সিঁড়ির পাদদেশে পাওয়া গিয়েছিল। আর ঐ মৃতের স্ত্রী তাঁকে সনাক্ত করেছিল—সেটা আদালতে স্বকর্ণে শুনেছেন—হত্যাকারীরূপে। মীরাবহিন কখন অজ্ঞান হয়ে পড়ে গিয়েছিল—মহেন্দ্রভায়ের মৃত্যুর আগে না পরে—তাও ঠিকমতো নির্ধারিত হয়নি। তবে জামাল-সাহেবের ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি এবং তালশিরের টুপিটা মনে ছিল মেয়েটির।

দিন-তিনেক পরে উজির খান পাঠান এসে দেখা করল মানুভাইয়ের ভদ্রাসনে। উনি বাইরের ঘরে বসে আখ্‌বর পড়ছিলেন। আগন্তুককে দেখে কাগজ নামিয়ে রাখলেন। উজির খান নত হয়ে বললে, নমস্তে আঙ্কলজী! তবিয়ৎ তো ঠিক হ্যয় না?

মানুভাই দেখে নিলেন উজির খান একা এসেছে। তার হাতে একটা বড় সুটকেস। উনি ইজিচেয়ারে শুয়েছিলেন। সোজা হয়ে বললেন, আদাব অর্জ, ওকিলসা'ব। বৈঠিয়ে!

উজির এবার হিন্দি ছেড়ে গুজরাতি ভাষায় সবিনয়ে বললে, আমাকে চিনতে পারেননি আঙ্কলজ্ঞী! আমাকে 'আপনি আজ্ঞে' কিসের? আমি সেই...ইয়ে, উজির খান!

মানুভাই নেপথ্যের দিকে তাকিয়ে হাঁকাড় পারেন : শিউলাল!

শিউলাল উপস্থিত হলে তাকে দু-গ্লাস সরবৎ ফরমায়েশ করে আগন্তুককে বললেন, আপনাকে না-চিনব কেন ভকিলসা'ব? আদালতে তো কতবার দেখেছি! বলুন? কী বলতে এসেছেন?

উজির বুঝতে পারে নাতির বয়সী আগন্তুকের সঙ্গে উনি 'আপনি-আজ্ঞেই' করে যাবেন।

সে ইনিয়ে-বিনিয়ে অনেক যুক্তি-তর্ক দাখিল করল। হ্যাঁ, ঐ তেত্রিশজনই ওঁর ভদ্রাসনে বেআইনি প্রবেশ করেছিল, সচ্ বাৎ! উজির খান পাঠান এককথায় মেনে নিচ্ছে। অন্যায় করেছে ওরা। বেঅকুফ! লেকিন বদমাস নেহি। স্রেফ বুড়বক! জামাত উলেমার উগ্রপন্থী বাঁদরগুলোর কথায় উত্তেজিত হয়ে অন্যায় করেছে! মানুভাই মহানুভব! স্বয়ং গান্ধীজীর হাতে-গড়া মানুষ! সেবাগ্রামে মানুভাই বালখিল্য বাহিনীতে এককালে কাজ করেছেন, উজির খান জানে....আর তাছাড়া বিবেচনা করে দেখুন, প্রফেসর চৌধুরীর যদি ফাঁসিও হয় তবু মহেন্দ্রভাই তো আর ফিরে আসবে না?

বৃদ্ধ এতক্ষণ একমনে আইনজীবীর সওয়াল নির্বাক শুনে যাচ্ছিলেন। এবার শুধু বললেন, তো?

—আপনি ওদের 'মাফি' করে দিন, আঙ্কলজী! ভুল ভুলই। উত্তেজনায় বেমক্কা এসব করে বসেছে। আর সত্যিকথা বলতে কি, প্রফেসর সা'ব ঐ জঘন্য অপরাধটা করেনওনি।

মানুভাই বললেন, ভকিলসা'ব! আপনি একটা গল্‌তি করছেন। মামলা হচ্ছে স্টেট-ভার্সেস পার্টি! আমি তো স্রেফ এফ. আই. আর. লজ করেছি; আর হাঁ, আমার বহুরানী প্রধান সাক্ষী। সে স্বচক্ষে দেখেছে তার মরদকে তলোয়ারের কোপে দ্বিখণ্ডিত হতে! ব্যস! মামলার সঙ্গে দাভে পরিবারের এটুকুই তো সম্পর্ক, তাই নয় কি?

—জী না! আঙ্কেলজী! আপনি যদি আদালতের বাহিরে মামলাটা মিটিয়ে নিতে রাজি হন, তবে পুলিশ কেস চালাবেই না! পি.পি-সাহেব আমাকে বলেছেন, ডি.এস.পি-সা'ব আমাকে অ্যাশিওর করেছেন।

—আদালতের বাহিরে মামলা মিটানো! সেটা কী রকম?

উজীর খান পাঠান নতমস্তকে বললে, আমরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে চাঁদা তুলেছি! মহেন্দ্রভাইয়ের জীবন আমরা ফিরিয়ে দিতে পারব না; লেকিন মীরাবহিনের ঐ নুন্নিমুন্নি মেয়েটার বিয়ে একদিন আপনাকে দিতে হবে। সে দায় আমাদের—ভুল করে করে ফেলা অপরাধীদের! এই স্যুটকেসে চার লাখ টাকা আছে, আঙ্কেলজী। বিশ বরিষ পিছে মুন্নির সাদির সময়ে তা আধা কড়োরের উপর কিছু একটা হয়ে যাবে। আপনি মামলাটা তুলে নিন।

শিউলাল এই সময় একটা কাঠের ট্রেতে দু-গ্লাস সরবত নিয়ে বৈঠকখানায় প্রবেশ করে। মানুভাই উঠে দাঁড়ালেন। ভৃত্যকে বললেন, তুই এখানে দাঁড়িয়ে থাক। ভকিল-সা'ব যদি সরবৎটা পান করেন তো ভাল, না হলে ঐ নর্দমায় ঢেলে দিস্। উনি চলে গেলে সদর বন্ধ করে দিবি। আমি পূজাঘরে যাচ্ছি....

উজির খান পাঠানও উঠে দাঁড়ায়। বলে, আঙ্কলজী! একটা কথা বলে যান শুধু। চার লাখ টাকার অঙ্কটা কি ভুলে কম ধরেছি?

বৃদ্ধ টলতে টলতে দ্বার পর্যন্ত চলে গিয়েছিলেন। এ কথায় ঘুরে দাঁড়ালেন। বললেন, ভকিলসা'ব! জিন্দেগিভর হান্ড্রেড কাউন্ট সুতোই কেনাবেচা করেছি। ভ্রাতৃরক্তের বাজারদর তো আমার জানা নেই! মুঝে মাফ কিয়া যায়!

* . * *

পরদিন সকালে আহমেদাবাদ থেকে অ্যাডভোকেট মগনভাই এসে হাজির হলেন তাঁর মারুতি সুজুকি চালিয়ে। একা। আগের রাত্রেই সিধ্‌পুর থেকে ওঁর মক্কেলের দল উজির খানকে মুখপাত্র করে তাঁর সাথে গিয়ে দেখা করেছে। মানুভাই চারলক্ষ টাকা

খেসারত প্রত্যাখ্যান করায়।

মানুভাই দাভে তাঁর বহুদিনের পরিচিত অ্যাডভোকেট বন্ধুকে সাদরে আপ্যায়ন করে বসালেন। মগনভাই বোঝাতে থাকেন সিধ্‌পুরে আবার নতুন করে একটা দাঙ্গা বাধার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। বিজেপি লিডার গিরীশ থাপার বিশ্ব হিন্দু পরিষদের জনাছয়েক নেতাকে সঙ্গে নিয়ে এসে থানা গেড়েছেন। এদিকে জামায়েত উলেমার কয়েকজন নেতাও এসে হাজির। মগনভাই আরও বললেন, দাঙ্গাটা এবার হিন্দু-মুসলিমের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না—সেটা হয়তো হতে চলেছে সিয়া-সুন্নির দাঙ্গা!

—বহ্‌ কৈসে?

মগনভাই বুঝিয়ে বলেন, মীরা বহুরানী গলতি আদমীকে সনাক্ত করেছে। প্রফেসর সা'ব খুনটা আদৌ করেননি। তাঁর হাতে তরোয়াল ছিলই না। যে খুনটা বাস্তবে করেছে সে মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছে। ইতিমধ্যেই অনেকের কাছে কবুল করে বসে আছে। মুশকিল এই যে, প্রফেসর হচ্ছেন সুন্নি সম্প্রদায়ের আর ঐ গাড়োলটা সিয়া। ফলে এখন মুসলিম সম্প্রদায়ের ভেতরেই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধার উপক্রম!

মানুভাই সে কথায় কান না দিয়ে বললেন, তুমি ঠিক জান? প্রফেসর তরোয়ালের কোপটা মারেনি?

—হরগিজ!

—কে করেছে তাও জান?

—এতদিন জানতাম না। গতকাল রাত্রে কমবক্তটা আমার কাছেও নিজ মুখে কবুল করেছে। ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছরের একটা নওজোয়ান। পড়ি-লিখি আদমি, লেকিন আহাম্মক! বেওকুফটা একটা সাদিও করেছে বছরখানেক আগে!

মানুভাই একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিলেন একটি প্রস্তরনির্মিত মূর্তির দিকে। ওঁর বাইরের ঘরের কুলুঙ্গিতে। সমভঙ্গে দণ্ডায়মান আদিনাথ বা ঋষভনাথের শ্বেতপাথরের মূর্তিটি। হঠাৎ উনি সোজা হয়ে উঠে বসলেন। বললেন, মগনভাই! একটিমাত্র শর্তে আমি মামলা তুলে নিতে রাজি আছি।

—কী শর্ত?

—মিউনিসিপ্যালিটির অফিসটা দুই মহল্লার মাঝামাঝি। আজই বেলা দুটোর সময় আমি ওখানে যাব। বহুরানীকে সাথে নিয়েই যাব। ওদেরও আসতে বল। সর্বসমক্ষে প্রকৃত খুনী আমার বহুরানীর কাছে করজোড়ে মার্জনা চাইবে। আর আমি তার শাস্তির বিধান করব। ব্যস্‌!

মগনভাই সবিস্ময়ে বলেন, কী শাস্তি?

—ঘাবড়াচ্ছ কেন মগনভাই, আমি জজ-সাহেব নই। প্রাণদণ্ড বা কারাদণ্ড দেওয়ার

এক্তিয়ার আমার নেই! এই বুড়োর হাতের একটা থাপ্পড় কি সইতে পারবে না ঐ নওজোয়ান?

মগনভাই বললেন, না। তা নয়! তবে কথা হচ্ছে সর্বসমক্ষে কবুল করার কথা উঠছে কি না! 'মার্ডার চার্জ' বলে কথা!

—বহুৎখুব! ব্যস্! আমার শেষ কথা বলেছি। এখন তোমরা যা ভাল বোঝ।

* * *

বৃদ্ধ মানুভাই দাভের এই আজব শর্তটার কথা দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ল মহল্লা থেকে মহল্লায়। জামাত উলেমার নেতার ঘোর আপত্তি ছিল; কিন্তু স্থানীয় মুসলিম নেতৃবৃন্দ সে কথা শুনলেন না। বেলা দুটোর কিছু আগে শ্বেতাম্বরা বিধবাকে নিয়ে মানুভাই আর ভোগীলাল যখন মিউনিসিপ্যাল অফিসে এসে পৌঁছলেন তখন সেখানে লোকে লোকারণ্য। এস. ডি. পি. ও. কোথা থেকে খবর পেয়ে এক প্লেটুন পুলিশ নিয়ে এসে মিউনিসিপ্যালিটিটা ঘিরে ফেলেছেন। মাইক্রোফোন বসানো হয়েছে জনতা নিয়ন্ত্রণের জন্য।

লোকজনকে ভিতরে যেতে দেওয়া হয়নি, তা বলে। সংলগ্ন ফুটবল মাঠটায় শুধু মানুষ, মানুষ, আর মানুষ। হিন্দু-মুসলমান। পৃথক পৃথক জমায়েত! মিউনিসিপ্যাল চেয়ারম্যান-সাহেব এগিয়ে এসে ওঁদের তিনজনকে মিটিং রুমে নিয়ে গিয়ে বসালেন। শহরের জনা-বিশেক বিশিষ্ট মানুষ সেখানে উপস্থিত। এ-দলের এবং ও-দলের। তদুপরি এস.ডি.পি.ও. সভাধিপতি, বি.ডি.ও. এবং এস.ডি.ও.।

মাথায় আধো-ঘোমটা দিয়ে সদ্যোবিধবা মীরাবাঈ তার ভাশুরের পাশের সিটে এসে বসল। অ্যাডভোকেট মগনভাই এগিয়ে এসে বললেন, বহু-মা! তোমাকে একটু কষ্ট করে আমার সঙ্গে আসতে হবে। এস।

মীরাবাঈ প্রশ্নটা পেশ করার আগেই মানুভাই জানতে চাইলেন, কোথায়? কেন?

—পাশের ঘরে একটি বোরখা-পরা মুসলমান সদ্যবিবাহিতা বধূ বসে আছে। তার স্বামীই এসেছে কবুল খেতে। মীরা-মা রাজি হলে মেয়েটি মীরাকে জনান্তিকে কিছু বলতে চায়! এ-ঘরে সর্বসমক্ষে সে আসতে পারে না।

মানুভাইয়ের সম্ভবত আপত্তি ছিল; কিন্তু সেটা দাখিল করার আগেই প্রাক্তন স্কুল-টিচার সপ্রতিভভাবে মগনভাইকে বললে, চলুন!

মিনিট-দশেক পরে মীরাবাঈ এঘরে ফিরে এল। বসল তার আসনে।

জামাত উলেমার এক বৃদ্ধ নেতা উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, আস্সালামু আলাইকুম মানুভাই দাভেজী, ঔর ভোগীলাল দাভেজী...

মানুভাই ধমকে ওঠেন : আপনি থামুন! আপনি সিধ্পুরের বাসিন্দা নন! হাজী-

সাহেবের কিছু বক্তব্য আছে? তাহলে বলুন?

মস্‌জিদের বড়-ইমাম হাজী-সাহেব বলেন, জী! আপনি যা চেয়েছেন আমরা তাতে রাজি হয়েছি। অপরাধটা যে করেছে সে সর্বসমক্ষে কবুল খাবে। আপনার কাছে মার্জনা চাইবে। আপনি অনুমতি করলে, তাকে এখানে হাজির করি।

মানুভাই বললেন, করুন। তবে ওকে বলে দিন, মাফিটা চাইতে হবে আমার বহুরানীমার কাছে, আমার কাছে নয়। আর একটা কথা! আমি তাকে মাফ করব সে-কথা তো আমি বলিনি। বরং মগনভাইকে বলেছি, আমি তার শাস্তির বিধান করব।

বড়া ইমাম একটু অবাক হয়ে বললেন, সে কী! আপনি মাফ করে দেবেন এমন প্রতিশ্রুতি পেয়েই তো আমরা এসেছি। আপনি যদি সর্বসমক্ষে ওকে মাফ করে না দেন তাহলে তো ও নিজেই মার্ডার-চার্জে ফেঁসে যাবে।

মানুভাই এবার মগনভাইয়ের দিকে ফিরে বললেন, এ সওয়ালের জবাব দেবার দায় আমার নয়, আপনার। আমি একবারও বলিনি যে, আমার ভ্রাতৃহত্যার অপরাধীকে আমি মাফ করে দেব! আপনার মক্কেলদের আপনি কী বুঝিয়েছেন তা আপনিই জানেন। যদি আমার কথায় আপনারা ভুল বুঝে থাকেন তবে এখানেই এ আলোচনা শেষ হক। বাকিটা আদালতে ফয়সালা করা যাবে।

মগনভাই ঝাঁপিয়ে পড়ে তাঁর মক্কেলদের কীসব বোঝাতে থাকেন। মানুভাই নির্বাক নিস্পন্দ অপেক্ষা করতে থাকেন।

শেষে বড়া-ইমাম বললেন, ঠিক হ্যায়। মান লি!

তিনি এস.ডি.ও. সাহেবের দিকে ফিরে গ্রীবাভঙ্গি করলেন। এস.ডি.ও. ইঙ্গিত করলেন এস.ডি.পি.ও.কে। এবার তাঁর নির্দেশে একজন সেপাই এসে খুলে দিল পাশের একটা দরজা। সেখান থেকে বার হয়ে এল একজন দীর্ঘদেহী সবল পুরুষ : রসিদ আহ্‌মেদ!

একমুখ খোঁচা-খোঁচা দাড়ি। সপ্তাহখানেক খৌরি করেনি। পরনে কুর্তা-পায়জামা, পায়ে কাবলি চপ্পল। চোখে বাণবিদ্ধ হরিণের আর্তি। ওর ঠোঁট দুটো থরথর করে কাঁপছে। তার পিছন-পিছন ঘরে ঢুকেছে একটি তরুণী। আপাদমস্তক বোরখায় ঢাকা।

মসজিদের বড়-ইমাম বললেন, আল্লাহ্‌-কসম্‌ বড়াভাই—প্রফেসর সা'ব নেহী, ইয়ে কমবক্তনে...

লোকটা হঠাৎ হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল। নতজানু ভঙ্গিতে। যুক্তকর বাড়িয়ে ধরল মানুভাই. দাভের দিকে। অস্ফুটে বললে, প্রফেসর-সাবকো কোই কসুর নেহী—ম্যয়নে খুদ...

বড়-ইমাম বললেন, বহ্‌ কামবক্তকা নাম—

একটা হাত সামনের দিকে বাড়িয়ে দিলেন মানুভাই। যেন ওঁকে থামতে বললেন।

বড়া-ইমাম মাঝপথেই বাক্য আসমাপ্ত রেখে নীরব হলেন।

হা-হা করে কেঁদে উঠল নতজানু বলিষ্ঠদর্শন লোকটা। মাটিতে মাথা ঠেকালো।

কেউ তাকে বলেনি, তবু সহধর্মিণী বলেই বোধহয় পাশাপাশি নতজানু হয়েছে এতক্ষণে বোরখা-পরা মেয়েটি।

মানুভাই তাঁর পাশে-বসা ভ্রাতৃবধূর দিকে ফিরে প্রশ্ন করলেন, ক্যা রে বহু-মাঈ? তু নে য়্যে বদমাসকো...

দু-হাতে মুখ ঢেকে মীরা হু হু করে কেঁদে ফেলল। কোনক্রমে উচ্চারণ করল : জী!

মানুভাই উঠে দাঁড়ালেন। অস্ফুটে বললেন : বহুৎ খুব। চুলের মুঠি ধরে টেনে তুললেন ভূলুণ্ঠিত মানুষটাকে। মুখোমুখি দাঁড়ানোতে বোঝা গেল ঐ পাট্টা-জোয়ানটা মানুভাইয়ের চেয়ে এক বিঘৎ লম্বা। মানুভাইকে সে দু-হাতে মাথার উপর তুলে ছুঁড়ে ফেলে দেবার শক্তি রাখে। মানুভাই তাকে প্রশ্ন করলেন, কা রে? তু পড়ি-লিখি আদমী হো? ..

চোখের জলে ভাসতে ভাসতে লোকটা বললে : জী!

—মহাত্মাজী কো আত্মজীবনী পড়া হ্যয় তুনে?

দুদিকে মাথা নেড়ে নেতিবাচক উত্তর করল লোকটা।

মানুভাই প্রশ্ন করলেন : ক্যোঁউ?

যেন মহাত্মাজীর আত্মজীবনী পড়েনি এমন পড়ি-লিখি ভারতীয় আদমী একটা অনিবার্য কৈফিয়ৎ দিতে বাধ্য। লোকটা এ প্রশ্নের কী জবাব দেবে বুঝে উঠতে পারল না।

ওর পার্শ্ববর্তিনী ইতিমধ্যে উঠে দাঁড়িয়েছে । সে তার বোরখার মধ্যে থেকে মানুভাইকে অস্ফুটে বললে, ম্যয়নে পড়ি হ্যয়।

মানুভাই অবগুণ্ঠনবতীর খসম্‌কে হিন্দিতে বললেন, তোর সরম হওয়া উচিত। তুই পড়ি-লিখি আদমী, ভারতবাসী, অথচ বাপুজীর আত্মজীবনী পড়িসনি এতদিনেও। ঐ দ্যাখ্, তেরি ঘরওয়ালী পর্যন্ত তা পড়েছে।

এর কী জবাব?

মানুভাই জুলেখাকে বললেন, যা, ইসকো ঘর লে যা! ঔর উস্‌কো বহ্ কেতাব পড়ানা। সমঝি? তেরি খসম্‌কে হম দোনো মাফ কর দিয়া—যা! ঘর লৌট যা!

* * *

গল্পটা এখানেই শেষ হতে পারত। হয়েছেও। তবু বাকি আছে কিছু উপসংহার। কিছুদিন পরেই মগনভাই বারোতকে মুখপাত্র করে মুসলমান এলাকার সাত-আটজন মাতব্বর শ্রেণীর মোড়ল এসে দেখা করতে চাইলেন মানুভাইয়ের সঙ্গে। মানুভাই এবং ভোগীলাল বুঝে উঠতে পারেননি—ব্যাপারটা কী হতে পারে। মামলা তো পুলিশ তুলে

নিয়েছে—মানুভাইয়ের আবেদনক্রমে। তাহলে আবার কী বক্তব্য থাকতে পারে ও পক্ষের?

যাহোক, নির্দিষ্ট দিনে ওঁরা সবাই এলেন। মানুভাইয়ের বৈঠকখানাটা প্রকাণ্ড বড়। মাঝখানে বৃহৎ ডবল-বেড খাটের মাঝে একটা নিচু গদি। তাতে ধব্‌ধবে সাদা চাদর পাতা। ইতস্তত ছড়ানো খান চার-ছয় ছোট ছোট তাকিয়া বা গদ্দা। এছাড়া দুই দেওয়াল বরাবর দুই সারি মোড়া চেয়ার। যাঁরা সুটেড-বুটেড, তাঁরা তাতে বসেন—ধুতি-পাজামা-পাঞ্জাবি-কুর্তার দল গদিতে।

ভোগীলাল আগবাড়িয়ে সকলকে সমাদর করে বসালেন। বুদ্ধি করে ভোগীলাল ও-পাড়ার, মানে হিন্দু-মহল্লার, কিছু মাতব্বরকেও আসতে বলেছিলেন। অবশ্য যাঁরা সিধ্‌পুরের স্থায়ী বাসিন্দা শুধু মাত্র তাঁদেরই। হিন্দু ধর্মকে শিখণ্ডী করে যাঁরা রাজনীতি যুদ্ধে অবতীর্ণ—সাম্প্রদায়িক স্পর্শকাতর সিধ্‌পুরে সম্প্রতি গেরুয়া ঝাণ্ডা পুঁতে দফতর খুলে বসেছেন—তাঁদের আমন্ত্রণ করেননি। দাভেজীর মতে ঐসব বহিরাগতদের এই জাতীয় অন্তরঙ্গ গ্রামীণ জমায়েতে অনুপস্থিত থাকাই মঙ্গল। এ যুক্তিটা—দাভেজী লক্ষ্য করে দেখলেন — ও পক্ষও মানতে শুরু করেছেন। মিউনিসিপ্যাল মিটিং হলে যে বহিরাগত মৌলবাদী মৌলানা-সাহেব ও-দলের দলপতি সেজে উপস্থিত হয়েছিলেন — সেই যিনি মুখ খোলার আগেই দাভেজীর কাছে দাবড়ানি খেয়েছিলেন, তিনি এবার ও-দলে অনুপস্থিত।

এসেছেন মসজিদের বড়া-ইমাম, আরও কয়েকজন স্থানীয় মুসলমান মাতব্বর—নিজামুদ্দীন সাহেব, হাজী শাহ্ এনায়েৎভাই,—এছাড়া প্রফেসর জামালুদ্দীন চৌধুরী, উজির খাঁ পাঠান। সেই ভাগলপুর থেকে আসা কী যেন নাম মটোর-মেকানিকটা—যাকে সেদিন 'মাফ' করে দিয়েছিলেন—সে আসেনি কিন্তু। অথচ এসেছে বোরখা পরা একটি নারী, ঐ লোকটার সহধর্মিণী। কারও নিষেধ সে মানেনি। তার একান্ত ইচ্ছা মীরা-দিদিকে সে একটা প্রণাম করে যাবে। হ্যাঁ, প্রণামই — হেঁদুরা যেমন করে বড়া বহিনকে! বিজয়াদশমীর দিনে এককালে ছোট বোন স্বাতীলেখা যেমনভাবে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করত তার দিদিকে—স্মৃতিলেখাকে। না—এখানে অবশ্য পায়ে হাত দেবে না জুলেখা, অন্তত না-জিজ্ঞাসা করে পদস্পর্শ করবে না! কে-জানে, হয়তো সেজন্য মীরাদিদিকে এই অবেলায় আবার স্নান করতে হবে।

বৈঠকখানা ঘরে সবাই বসলেন। কেউ নির্দেশ দেয়নি, কিন্তু বসার ভঙ্গিটা হিন্দুস্থান-পাকিস্তানের! মুসলমান মেহ্‌মানরা—যাঁরা ও-পাড়া থেকে এসেছেন তাঁরা বসলেন পাশাপাশি দেয়ালঘেঁষা চেয়ারে। এ-পাড়ার হিন্দু মাতব্বরেরা গদিতে।

মানুভাই সকলকে স্বাগত জানিয়ে বললেন, আপনারা কী আলোচনা করতে এসেছেন

তা জানি না। বারোত টেলিফোনে আমাকে কোনও ইঙ্গিত দেয়নি। তা সে যাই হোক, আলোচনা শুরু করার আগে আমি দুটি কথা জানতে চাই। প্রথম কথা, আপনাদের সঙ্গে একটি মহিলা এসেছেন দেখছি, এখনো তিনি দাঁড়িয়েই আছেন। উনি যদি এখানে বসতে না চান, তাহলে ওঁকে ভিতরে বাড়িত-পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করি—

আগন্তুকদের মধ্যে একজন উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, আদাব মানুভাইজী—এ বিষয়ে আমার একটি বক্তব্য আছে। আমার পরিচয়টা আগে দিই—

মানুভাই বাধা দিয়ে বলে ওঠেন, আপনার পরিচয় আর নতুন করে দিতে হবে না প্রফেসর চৌধুরী। আপনি সিধ্‌পুরে তিন বছর বাস করছেন। আপনার বহু ছাত্রছাত্রীর কাছে আমি আপনার সুখ্যাতি শুনেছি। আদালতেও আপনাকে দেখেছি।

উজির খান বলে, মাপ করবেন, আঙ্কলজী! প্রফেসর সা'ব নিজের পরিচয়টা দিতে যাচ্ছিলেন না—ঐ বোরখা-আবৃতার সঙ্গে ওঁর গূঢ় সম্পর্কটা জানাতে চাইছিলেন—

জামালুদ্দীন বলেন, জী সাব! ঐ মেয়েটি আমার ছাত্রী, তাই আমি বলব....

উজির খান বলে ওঠে, অবজেকশান য়োর অনার! প্রফেসর সা'ব ট্রুথ বলেছেন, কিন্তু হোল্ ট্রুথ বলেননি! নাথিং বাট দ্য ট্রুথ তো নয়ই!

জামাল-সাহেব লজ্জা পেলেন।

মগনভাই জিজ্ঞাসুনেত্রে তাকিয়ে দেখলেন উজির খানের দিকে। কিন্তু সে কিছু বলার আগেই জামাল-সাহেব বলে ওঠেন, অবান্তর প্রসঙ্গ টেনে এনে সময় নষ্ট করার প্রয়োজন নেই। জুলেখা আহ্‌মেদের সঙ্গে আমার একাধিক সম্পর্ক আছে। আমরা একই সঙ্গে ভাগলপুর থেকে এসেছি। এক ছাদের নিচেই থাকি সিধ্‌পুরে। আমি শুধু বলতে চাইছিলাম যে, ঐ মেয়েটি জন্মসূত্রে হিন্দুর কন্যা ছিল। ও এখানে এসেছে যে উদ্দেশ্যে সেই একই উদ্দেশ্যে এসেছি আমরা। তাই আমরা খুশি হব, যদি আপনি ওকে এখানেই বসবার অনুমতি দেন।

মানুভাই বললেন, বেশক্! বস' মা তুমি—না, না, চেয়ারে নয়। এই আমার পাশে। ফরাসে।

জুলেখা সলজ্জে এগিয়ে এসে বসল বৃদ্ধের বাঁ পাশে। মানুভাই তাঁর অনুজকে নির্দেশ দিলেন, ভোগীলাল, তুমি ভিতরবাড়িতে গিয়ে বহুমাকে একটা খবর দাও। আমার ইচ্ছা, সেও এসে বসুক এই আলোচনাসভায়।

ভোগীলাল দাভে অন্দরমহলে চলে গেলেন। মগনভাই বারোত জাতে অ্যাডভোকেট। তাই বললেন, দাভেভাই! তুমি তখন দুটি কথা বলতে চেয়েছিলে। দ্বিতীয়টা?

—দ্বিতীয় কথা, আমি আপনাদের জন্য কী ফরমায়েশ করব? চা, কোল্ড ড্রিংস, না ঠাণ্ডাই?

উজির খান তৎক্ষণাৎ প্রত্যুত্তর করে, ঠাণ্ডাই! তবে এক শর্তে, আঙ্কেলজী! যদি শিউলালকে এবার ঐ রকম হুকুম না দেন : আমাদের নাকের ডগায় ঠাণ্ডাইয়ের গ্লাস দেখিয়ে নর্দমায় ঢেলে দিতে!

মগনভাই বলেন, তার মানে?

মানুভাই বাধা দেন, উজির-বেটা মওকা পেয়ে আমার 'লেগ পুলিং' করছে।

একটু পরে ভিতর থেকে এসে গেল মীরা দাভে। বসল গৃহকর্তার ডানপাশে। নিম্নস্বরে জুলেখার সঙ্গে তার কী জাতের কথা শুরু হল।

তারপর মগনভাই বারোত বলেন, এবার আলোচনা শুরু করা যাক। আমাকে আমেদাবাদে ফিরতে হবে। অনেকটা পথ। আপনি শুরু করুন হাজী-সাহেব।

হাজী-সাহেব বলেন, এটা কেমন কথা হল মগনভাইজী? আপনাকে আমরা মুখপাত্র করে নিয়ে এলাম তো এজন্যই, যাতে আমাদের সকলের ইচ্ছার কথাটা আপনি গুছিয়ে বলতে পারেন এঁদের।

মগনভাই বারোত বললেন, অল রাইট! তাই হবে। শোন মানুভাই, এবং এ-মহল্লায় মাতব্বরেরা, আপনারাও শুনুন। আমরা একটা প্রস্তাব নিয়ে এসেছি। আপনারা সম্মত হলে সেটা কার্যকরী করা যাবে।

প্রস্তাবটা বিচিত্র। জামালুদ্দীন-সাহেবের শান্তি মকুব করার খেশারত হিসাবে ওঁরা বাড়ি বাড়ি ঘুরে যে চাঁদার তহবিলটা গড়ে তুলেছিলেন, সেটায় এখনো হাত পড়েনি। ওঁরা তাই দিয়ে একটা 'ট্রাস্ট' গঠন করতে চান : 'সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ট্রাস্ট'। ভবিষ্যতে বহিরাগত মৌলবাদী কোন সাম্প্রদায়িক দলের প্ররোচনায় যাতে সিধ্‌পুরে আবার না দাঙ্গা বেধে যায়। ট্রাস্টের নিজস্ব একটি অফিস থাকবে—মিউনিসিপ্যালিটির কম্পাউন্ডের ভিতর। ওটা দুই মহল্লার সংযোগস্থলে। জমিটা দান করতে মিউনিসিপ্যালিটি স্বীকৃত—যদি ঐ বিশেষ কাজে অফিসটা ব্যবহার করা হয়। ট্রাস্টের নিজস্ব শান্তিরক্ষা বাহিনী থাকবে। জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে। তারা দুই মহল্লাতেই রাত্রে পালা করে টহল দেবে। গ্রামের মুসলমান যুবশক্তি এতে সম্মত। হিন্দুরা সম্মত হলে হিন্দু-মুসলমানের মিলিত বাহিনী হবে, যেমন হয়েছিল পলাশী প্রান্তরে—মোহনলাল আর মীরমদনের মিলিত বাহিনী! সেবার ওরা পারেনি—ঐ মোহনলাল আর মীরমদন—যৌথভাবে—মীরজাফরের বিশ্বাসঘাতকতা নির্মূল করতে। এবার ওরা পারে কিনা তাই দেখতে চায়। ওদের নৈশাহার এবং অন্যান্য 'অ্যালাওয়েন্স' ট্রাস্ট দেবে। দুই ধর্মের লোক স্বীকৃত হলে ঐ ট্রাস্টের টাকায় আদিনাথের জৈন মন্দির এবং মসজিদ দুটোই মেরামত করা হবে, রঙ ফেরানো হবে। এই বিষয়েই আমাদের আলোচনা।

মানুভাই তুলসীদাস মেহ্‌তাজীর দিকে ফিরে বললেন, আপনিই আমাদের মধ্যে

বয়ঃজ্যেষ্ঠ। আপনি কিছু বলুন—

প্রফেসর তুলসীদাস মেহ্‌তা আহ্‌মেদাবাদ কলেজে তুলনামূলক সাহিত্যের অধ্যাপক ছিলেন। এখন অবসর নিয়ে সিধ্‌পুরেই থাকেন। আশি ছুঁই-ছুঁই জ্ঞানবৃদ্ধ। তিনি বললেন, আমি এ প্রস্তাবে শর্তসাপেক্ষে স্বীকৃত। যদি আমার বন্ধুরা তা অনুমোদন করেন।

মগনলাল বারোত জানতে চান, কী আপনার শর্ত?

—একাধিক শর্ত। এক নম্বর : ট্রাস্টের মূলপুঁজি চার লক্ষ টাকা থাকলে আমি রাজি নই! ওটাকে আট লক্ষ করতে হবে। সিধ্‌পুরের হিন্দু-মহল্লায় আমাদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে চাঁদা তুলে আমরা যাতে প্রাথমিক তহবিলটাকে আট লক্ষ করতে পারি, সেবিষয়ে আপনাদের অনুমতি দিতে হবে।

হাজীসাহেব হা-হা করে অট্টহাস্য করে ওঠেন। বলেন, খুশিসে মান লি। ঔর?

—দ্বিতীয় শর্ত: মন্দির-মস্‌জিদ দুটোই ঐ তহবিল থেকে মেরামত করানোতে আমরা স্বীকৃত। কিন্তু আপনারা সকলেই জানেন—সিধ্‌পুরে হিন্দু-মুসলিম দু-জাতের মিস্ত্রিই আছে—লেবার কন্ট্রাক্টর, রাজমিস্ত্রি, ছুতোর, রঙমিস্ত্রি, সব কিছুই। আমরা কাউকেই বঞ্চিত করব না। আমার শর্তটা এই : মন্দির মেরামতির কাজটা দিতে হবে কোনও মুসলমান ঠিকাদারকে। সে হিন্দু মিস্ত্রি বা মজদুর এমপ্লয় করতে পারবে না। দ্বিতীয়ত মসজিদ মেরামতির কাজটা দিতে হবে কোনও হিন্দু কন্ট্রাক্টরকে—যে কোনও মুসলমান মিস্ত্রি বা মজদুর লাগাতে পারবে না।

প্রফেসর জামালুদ্দীন সোৎসাহে বলে ওঠেন আপনার শর্ত—লা-জবাব! কিন্তু তাহলে আমারও একটা প্রস্তাব আছে, প্রফেসর মেহ্‌তা। বিবেচনা করে দেখুন। এই 'সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি'র তৃণমূলে আছে মীরা-বহিনজীর মহানুভবতা। তিনি যদি রসিদ আহ্‌মেদকে সেদিন মাফ্‌ না করে দিতেন,তাহলে আজ এ-সভা অনুষ্ঠিতই হত না। তাই আমার প্রস্তাব : এই ট্রাস্টের নাম হোক 'মীরাবহিন সম্প্রীতি ট্রাস্ট।'

সবাই একযোগে কেয়াবাৎ দিয়ে ওঠে।

উঠে দাঁড়ায় মীরা দাভে! প্রাক্তন স্কুল-মিস্ট্রেস। সবিনয়ে বিশুদ্ধ হিন্দিতে বলে, আপনারা যে-ভাবে আমাকে সম্মানিত করতে চেয়েছেন তাতে আমি অভিভূত, সম্মানিত। কিন্তু আমি সবিনয়ে আমার আপত্তি পেশ করছি। এ সম্মান আমি গ্রহণ করতে পারি না। এ সম্প্রীতির তৃণমূলে আছেন আমার স্বামীর জ্যেষ্ঠভ্রাতা। কিন্তু তাঁর নামও আমি প্রস্তাব করছি না—এমনকি যাঁর হত্যাকাণ্ডে এই ব্যাপারটার সূচনা হয়েছিল সেই প্রয়াত ব্যক্তি—আমার স্বামীর স্মৃতিরক্ষার্থে তাঁর নামটা গ্রহণেও আমার দৃঢ় আপত্তি। হেতুটি সহজবোধ্য। সেক্ষেত্রে একটা বেদনার কণ্টক, একটা অনুশোচনার কষ্টকর দুঃস্বপ্ন লেগে থাকবে এই ট্রাস্টের গায়ে। তাছাড়া প্রফেসর মেহ্‌তা যে-ভাবে তুলাদণ্ডে মেপে

দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে সমমাপের আশীর্বাদ বণ্টন করলেন তারপর আমি মনে করি এই ট্রাস্ট-ফান্ডের সঙ্গে এমন একজন মহামানবের নাম যুক্ত হওয়া উচিত, যিনি আজীবন হিন্দু-মুসলমানের সম্প্রীতির জন্য প্রাণপাত করে গেছেন; এবং যাঁর জীবনের অবসানও হয়েছিল সেই প্রচেষ্টাতেই। তাই আমার প্রস্তাব, এর নাম হোক "বাপুজী সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি সঙ্ঘ!"

জামাল-সাহেবকে আবার বলতে হল, মীরা বহিনের এ সওয়ালটাও লা-জবাব!

ইতিমধ্যে সরবৎ ও মিষ্টান্নের থালা এসে গেল। আলোচনা বন্ধ করতে হল, পরিবেশনের জন্য। সেই সময় জুলেখা এপাশে সরে এসে তার মুখের পর্দা সরিয়ে প্রফেসর জামালুদ্দীনকে বললে, স্যার, আপনাকে মীরাদি জনান্তিকে কিছু বলতে চান। আপনি কাইন্ডলি একটু পাশের ঘরে আসবেন?

জামাল বিস্মিত হয়ে বলেন, জনান্তিকে?

—না। ঠিক জনান্তিকে না। আমিও থাকব সেখানে। আসুন।

* * *

পাশের ঘরে ওঁদের দুজনকে এনে বসালো মীরা দাভে। নিজেও বসল একটি সোফায়। বলল, প্রফেসর সা'ব, আপনার কাছে আমিও অপরাধী হয়ে আছি। ক্ষমা চেয়ে নিতে চাই।

জামাল চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ান। যুক্ত করে বলেন, ছিছি এসব কী বলছেন! বহিনজী!

—সেই দাঙ্গার রাত্রে আমার স্বামীর মৃত্যুর পূর্বেই আমি জ্ঞান হারিয়ে কার্পেটের উপর লুটিয়ে পড়েছিলাম। রসিদ আহ্‌মেদ প্রথম বার যখন তরোয়ালের কোপটা মারে তখন উনি—মানে আমার স্বামী, একটা মশারির ছত্রি দিয়ে তা প্রতিরোধ করেছিলেন। সেটা আমি স্বচক্ষে দেখেছিলাম। তারপরই দেখলাম আপনি ঝাঁপিয়ে পড়লেন রসিদের উপর। তরোয়ালটা ছিনিয়ে নিতে। আপনি তা কেড়ে নিতে পেরেছিলেন কি না, আমি জানি না, দেখিনি—কারণ ঠিক সেই মুহূর্তেই আমি সংজ্ঞহারা হয়ে পড়ে যাই।

জামাল নতনেত্রে বললেন, বহিনজী, আমি নিজেও জানি না, আমি ওর হাত থেকে অস্ত্রটা ছিনিয়ে নিতে পেরেছিলাম কি না। কিন্তু আদালতে আপনি তো আপনার সাক্ষ্যে বলেছিলেন যে—মানে আমাকেই আপনি—

—হ্যাঁ, সে-জন্যই এই জনান্তিকে মার্জনা চেয়ে নিচ্ছি। আমাকে উকিলবাবু বুঝিয়েছিলেন যে, আপনিই কাজটা করেছেন। উনি আমাকে আরও বলেন, আপনার চোখের সামনেই নাকি ভাগলপুরে কিছু হিন্দু গুণ্ডা তরোয়ালের কোপে আপনার কয়েকজন প্রিয়জনকে হত্যা করেছিল। এটা কি সত্য কথা, ভাইসাব?

—হ্যাঁ সত্য! আমিও বাধা দিতে চেষ্টা করেছিলাম ঐ মশারির ছত্রি দিয়েই!

—উকিলবাবু আমাকে বুঝিয়েছিলেন, তাই স্বহস্তে প্রতিশোধ না নিলে আপনার তৃপ্তি হবে না বলেই আপনি ওভাবে রসিদ আহ্‌মেদের হাত থেকে তরোয়ালটা ছিনিয়ে নেন।

জামাল বলেন, থাক মীরা বহিনজী! সেই দুর্যোগের রাতের কথা যত কম আলোচনা করা যায় ততই ভাল। আমরা সবাই চাইছি সেই বিভীষিকারাত্রির স্মৃতিটা ভুলে যেতে। চলুন, আমরা ও-ঘরে যাই। আপনার বাচ্চাটা কোথায়?

—ঘুমাচ্ছে। চলুন, ও-ঘরে সবাই অপেক্ষা করছে।

রসিদ আহ্‌মেদ এ জমায়েতে আসেনি। সে নাকি মহাত্মাজীর আত্মজীবনীটা আদ্যন্ত শেষ না করে রুদ্ধদ্বার কক্ষের বাইরে আসবে না। নিজেই নিজেকে সশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছে।

"বাপুজী সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ট্রাস্ট" রেজিস্ট্রি করা হয়েছে। হিন্দু ও জৈন যুবকেরা বাড়ি-বাড়ি ঘুরে চাঁদা সংগ্রহ করেছে। মোট সংগ্রহ দশ লক্ষ টাকা হয়ে যাবার পর উদ্বোধনের আয়োজন করা হল। মিউনিসিপ্যাল মাঠে বিরাট সামিয়ানা খাটিয়ে 'সম্প্রীতি সঙ্ঘে'র আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হল। উদ্বোধন করতে যিনি এলেন, তিনি না হিন্দু, না মুসলমান। তিনি বিতর্কিত ভারতীয় সাংবাদিক খুশবন্ত সিং। প্রধান অতিথি হিসাবে যিনি উপস্থিত হলেন তিনিও—না হিন্দু, না মুসলমান। তিনি আহমেদাবাদের চার্চের পাদরি রেভারেন্ট আর্নেস্ট। 'ইন্ডিয়া টুডে'র ঐ বিশেষ সংখ্যায় মানুভাই দাভের সঙ্গে খুশ্‌বন্ত সিং-এর ছবিও ছাপা হয়েছিল।

সম্প্রীতি তহবিলের অর্থে জৈনমন্দির ও মসজিদ দুটিকেই মেরামত করা হয়েছে। রঙ ফেরানো হয়েছে। বলাবাহুল্য, অধ্যাপক মেহ্‌তার আরোপিত শর্ত মেনে। অর্থাৎ মন্দিরের মেরামতি বা রঙ-করানোর কাজ করেছে মুসলমান ঠিকাদার, মুসলিম মিস্ত্রি ও মজুরদের নিয়োগ করে। ঠিক তেমনি মসজিদের গম্বুজে, লিয়ানে যে ফাটল হয়েছিল তা মেরামত করেছে রামাওতার আর তার দলবল।

একজোড়া দুঃখের কথা : মৌলবাদী হিন্দু ও মুসলমান দু-দুটি রাজনৈতিক দল—যাঁরা পাকাপাকিভাবে সিধ্‌পুরে থানা গেড়ে বসেছিলেন—তাঁরা গ্রাম থেকে বিতাড়িত। মানুভাই, ভোগীলাল, প্রফেসর মেহ্‌তা প্রভৃতি ঐ গেরুয়াপার্টির নেতাদের গিয়ে অনুরোধ করেছিলেন, আপনাদের ঐ ধর্ম নিয়ে রাজনীতি ব্যবসায় আমরা সিধ্‌পুরে বরদাস্ত করব না। আপনারা দয়া করে ডেরা-ডাণ্ডা গুটিয়ে সসম্মানে বিদায় নিন। সন্ন্যাসী নেতা স্বীকৃত হননি। বলেছিলেন, হেরে পালিয়ে যাব বলে আমরা এখানে দপ্তর খুলে বসিনি। তা সত্যি—ওঁদের পিছনে রাজনৈতিক দলের মদৎ ছিল। কিন্তু গ্রামবাসীরা ওঁদের সর্বতোভাবে 'বয়কট' করল। কোন দোকানদার ওঁদের মাল বেচবে না, বাজারে

সবজিওয়ালা সওদা বেচবে না। খবরের কাগজওয়ালা কাগজ দেবে না, ডেয়ারির দুধ-ফিরি-করনেওয়ালা দুধ বেচবে না। ওঁরা থানায় গিয়ে অভিযোগ করলেন। থানাদার বললে, কোন দোকানদার কাউকে মাল না বেচলে ভারতীয় দণ্ডবিধির কোন ধারা লঙ্ঘিত হয় বলে তো জানি না। এফ. আই. আর. লেখাতে পারলেন না ওঁরা। গ্রামশুদ্ধ মানুষ ওঁদের সঙ্গে বাক্যালাপ বন্ধ করল। ওঁরা আমেদাবাদ থেকে পার্টি-লিডারদের আনিয়ে সভা করলেন। কদিন ধরে হিন্দু মহল্লার পাড়ায় পাড়ায় সাইকেল-রিক্‌শায় মাইকমুখো ক্যাডাররা সভার ঘোষণা করে ফিরল। সে সভায় যথারীতি গেরুয়া ঝাণ্ডা পোঁতা হল, মাইক খাটানো হল, মঞ্চ বানানো হল। কিন্তু দেখা গেল যাঁরা গেরুয়া পার্টির সঙ্গে আমেদাবাদ থেকে 'মটোরকেডে' এসেছেন সেই জনা-বিশেক লোক ছাড়া সভায় আর মানুষ হয়নি।

গেরুয়া পার্টির অফিসটা সিধ্‌পুর থেকে উঠে গেল।

একই অবস্থা সবুজ পার্টির।

গেরুয়া পার্টির অফিসের মৌলবাদীরা সিধ্‌পুর থেকে বিতাড়িত হয়েছেন শুনে বহিরাগত সবুজপার্টির নেতারা উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন। মুসলমান মহল্লায় তাঁরা একটা সভার আয়োজন করেছিলেন পরবর্তী নীতি নির্ধারণের জন্য। সে-সভায় শুধু সমবেত হয়েছিলেন মুসলমান ভাইয়েরাই—জুম্মাবারে জোহরের নমাজের পর। এ-সভায় কিন্তু বেশ লোক সমাগম হয়েছিল। হওয়ার কথাও। কারণ জামাল এবং রসিদের মুক্তিলাভের পর এই প্রথম জুম্মাবারের জোহরের নমাজ হচ্ছে। নমাজ শেষ হলে বড়-ইমাম সুর করে পুকার দিলেন : আউজুবিল্লাহে শয়তান-ইর রাজিম। বিশমিল্লাহে রহমান্‌-ইর রহিম।

তারপর তিনি থামলেন। বহিরাগত সবুজপার্টির মৌলবাদী মৌলানা-সাব এরপর ডায়াসের দিকে এগিয়ে এলেন তাঁর ভাষণ দিতে। তাঁকে বাধা দিয়ে স্থানীয় বড়-ইমাম হাজী-সাহেব বললেন, মাফ কিজিয়ে বড়াভাই! এবার আমাদের প্রফেসর সা'ব কিছু বলবেন। উনি কোনদিনই আমাদের জামায়েতে আসেন না, আজ প্রথম এসেছেন। সদ্য ফাঁসির দড়ির আলিঙ্গনমুক্ত হয়ে উনি ফিরে এসেছেন। সবাই ওঁর ভাষণ শুনতে আগ্রহী। আপনি এর পরে বলবেন।

মৌলানা-সাব কিছু বিরক্ত হয়ে নিজের আসনে ফিরে গেলেন।

জামালুদ্দীন উঠে দাঁড়ালেন ডায়াসে। এগিয়ে গেলেন মাইকের দিকে। জনতায় একটা চাঞ্চল্য জাগল। কে একজন উৎসাহভরে পুকার দিয়ে ওঠে : 'আল্লাহ্‌ হু আকবর'! শ্রবণ-মাত্র সবাই ঐ ধ্বনি দিয়ে প্রফেসর জামালুদ্দীনকে অভ্যর্থনা জানালো। মনে হল, মুসলমান যুবসমাজের ধারণায় জামালুদ্দীন একটা 'ট্রফি'। একটা প্রায় সমান-সমান ফাইনাল খেলা ড্র হতে হতে ওরা 'সাডেন ডেথ্‌'-এর পেনাল্টি-কিক্‌-এ ট্রফিটা জিতে গেছে।

"সন্তান মোর মার।"

জামাল-সাহেব মাইকটাকে টেনে নিয়ে জনতার দিকে তাকিয়ে দেখলেন। সবাই মুসলমান। সামনের সারিতেই বসে আছেন উজির খান পাঠান, রসিদ আহ্‌মেদ, হাজীশাহ, এনায়েৎভাই, নিজামুদ্দীন সাহেব প্রভৃতি। একান্তে—একটু দূরে একজন মাত্র বোরখা পরা মহিলা। একমাত্র স্ত্রীলোক এ জমায়েতে। বোরখা এখনো সে খুলতে পারেনি প্রকাশ্য স্থানে, কিন্তু স্ত্রী স্বাধীনতার ব্রতটাকেও সে ত্যাগ করতে পারেনি মৌলবাদীদের চোখ রাঙানিতে। কট্টরপন্থীরা আপত্তি জানাতে সাহস পাননি। হেতুটা সহজবোধ্য। ঐ বোরখাধারিণীর খসম্ তার ধর্মপত্নীর এ আবদার মেনে নিয়েছে; আর সে লোকটা দৈহিক ক্ষমতায় একটা দৈত্য। সবচেয়ে বড় কথা সে যে তরোয়ালের এক কোপে ঘাড় থেকে কারও মাথা নামিয়ে দিতে সক্ষম এটা প্রতিষ্ঠিত! বোরখার জালির ফুটো দিয়ে মেয়েটি নির্নিমেষে নয়নে দেখছিল ঐ প্রৌঢ় মানুষটিকে—যিনি তার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছেন, যাঁকে ও অত্যন্ত অন্তরঙ্গভাবে জানে। যাঁর সঙ্গে সে একটা গোপন-কথা যৌথ প্রতিজ্ঞায় লুকিয়ে রেখেছে। স্বামীকেও আজ পর্যন্ত বলেনি।

জামাল বক্তৃতা শুরু করলেন, বেরাদানে ইসলাম! সিধ্‌পুরের হে প্রিয় ইসলামী ভ্রাতৃবৃন্দ! আমি ভাগলপুর থেকে তিন বছর আগে আপনাদের গ্রামে আশ্রয় নিতে এসেছিলাম। ভাগলপুরের নৃশংস দাঙ্গার আমি প্রত্যক্ষদর্শী। আমার চোখের সামনেই পাঁচ-সাতজন নারী ও বৃদ্ধকে নির্মমভাবে নিহত হতে দেখেছি। আমি প্রতিবাদ করতে পারিনি—কারণ ওদের আঘাতে আমি তার আগেই ভূতলশায়ী হয়ে পড়ি। উঠে বসবার দৈহিক ক্ষমতা ছিল না আমার। ফলে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ভয়াবহতা আমার প্রত্যক্ষ করা তথ্য! আমি জানতাম, এখানে আপনারা মাঝে মাঝে জমায়েত হন। হাজী-সাহেব, মৌলানা-সাহেব প্রভৃতি বক্তৃতা করেন। আমি কোনদিন সেসব বক্তৃতা শুনতে আসিনি। যদিও আমি একটি কলেজে অধ্যাপনা করতাম—বক্তৃতা দেওয়াই ছিল আমার জীবিকা। তবু কোনদিন আপনাদের সামনে বক্তৃতা করিনি।.... কারণ আমি জানতাম, আমার বক্তৃতা আপনাদের পছন্দ হবে না, আপনারা শুনতে চাইবেন না। তার হেতু এতদিন আপনারা সাম্প্রদায়িক বিষে জর্জরিত হয়ে ছিলেন। অযোধ্যায় বাবরি মসজিদ ধ্বংসের প্রচেষ্টার যুগ থেকে।

সারা ভারতে হোক-না-হোক সিধ্‌পুরে আজ সম্প্রীতির একটা সূচনা হয়েছে। আমরা নূতনভাবে ভাবনার একটা সুযোগ পেয়েছি। আপনারা জানেন, আমি মৃত্যুর মুখ থেকে সদ্য ফিরে এসেছি। আমার এই পুনর্জন্মের মূলে আছে হিন্দু-মুসলমানের যৌথ-মুবারকী। সেই দুর্যোগরাত্রে আমি খালি হাতে দাভেজীর ভদ্রাসনে প্রবেশ করেছিলাম। আমার বন্ধু রসিদ আহমেদের হাতে ছিল ঐ মারাত্মক আলা-ই-মুহ্‌লিখ! আমি সেটা ওর হাত থেকে কেড়ে নিতে গিয়েছিলাম। হত্যার উন্মাদনায় রসিদ আমাকে চিনতে পারেনি। আমাকে

প্রচণ্ড ধাক্কা মারে। আমার ধারণা ছিল, সেই ধাক্কায় আমি ছিটকে পড়ি। আমার মাথাটা রেলিং-এর ব্যালাসট্রেডে প্রচণ্ড ধাক্কা খায়—আমি জ্ঞান হারাই। কিন্তু আদালতে শুনলাম: আমিই হত্যাকারী। মৃতের ঔরৎ আমাকে সনাক্ত করেছেন! আমি প্রতিবাদ করতে পারিনি। নট গিলটি প্লিড্ করতেও পারিনি। কারণ আমার জ্ঞান ছিল না। আমাকে গিল্টি হিসাবে বিচারক রায় দিতেন এতে সন্দেহ নেই।

কিন্তু তা ঘটল না। কেন হল না? প্রথম কথা : রসিদ আহ্‌মেদ স্বীকার করে বসল যে, সে নিজেই হত্যাকারী। বন্ধুগণ! আপনারা বিবেচনা করে দেখুন। ঘটনাস্থলে ছিল চারজন মানুষ। একজন মৃত, দুজন নিশ্চেতন, শুধুমাত্র একজনই জানে প্রকৃত ঘটনাটি—সে ঐ রসিদ আহ্‌মেদ! সে নিজে থেকে কবুল না করলে প্রকৃত সত্য কোনকালেই উদ্ধার করা যেত না। দ্বিতীয়ত, মীরাবহিন এবং মানুভাই দাভেজী যদি ওকে মাফ করে না দিতেন তাহলেও এমন সুন্দরভাবে সব কিছু সমাপ্ত হত না! আমি ফাঁসির দড়ি থেকে ফিরে আসতাম না।

—বন্ধুগণ! আপনারা বিবেচনা করে দেখুন—ধর্মান্ধ মৌলবাদীদের প্ররোচনায় আমরা যেমন মাঝে মাঝে পশুর মতো আচরণ করি, ঠিক তেমনি কখনো-কখনো মনুষ্যত্বের সাক্ষ্যও রাখি। রসিদ আহ্‌মেদ নিজে থেকে অপরাধ স্বীকার করতে এসেছিল মানুষ হিসাবে, মুসলমান হিসাবে নয়। দাভেজী ওকে ক্ষমা করে দিয়েছিলেন মানুষ হিসাবে—প্রতিহিংসাকামী হিন্দু হিসাবে নয়! ফলে সিধ্‌পুরের হিন্দু-মুসলমানের যৌথ উদ্যোগে এখানে সম্প্রীতির একটি নূতন সূচনা হয়েছে। নূতনভাবে চিন্তাভাবনা করার একটা সুযোগ এসেছে। তাই আমি বলব :

—ভারতে যত মুসলমান আছে তত মুসলমান পৃথিবীর অন্য কোনও রাষ্ট্রে নেই—এই তথ্যটা আপনারা সবাই জানেন কি না জানি না। আর সেই সংখ্যাটা এত বৃহৎ যে সারা পৃথিবীতে যত জাপানি আছে প্রায় তার সমান। আপনারা এ তথ্যটা জানুন বা না জানুন—আমার আশঙ্কা কিছু পণ্ডিত কট্টর হিন্দু নেতা তা জানেন—অথচ না-জানার ভান করেন। তাঁরা মনে করেন এই বিশাল মুসলিম জনসংখ্যাকে পদতলে রেখে, তাদের দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকে পরিণত করে তাঁরা ভারতে 'রামরাজ্য' চালাতে পারবেন। ঠিক যেমন ভাবে দক্ষিণ আমেরিকার প্ল্যান্টার্সরা আমেরিকাবাসী নিগ্রোদের দাসত্ববন্ধনে আবদ্ধ করে দেশটা শাসন করতে চেয়েছিল, অথবা শেষ গ্র্যান্ড মোঘল আওরঙ্গজীব চেয়েছিল হিন্দু প্রজাদের দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রজা বানিয়ে ভারত শাসন করতে। ইতিহাস প্রমাণ করেছে : তা হয় না। দু-চার শতাব্দী আগে তা সাময়িকভাবে হয়তো সম্ভবপর হত, এখন তা একদিনের জন্যও চলে না। এ-কথা কি ঐ কট্টর হিন্দু মৌলবাদী নেতারা জানেন না? জানেন। তবু তাঁরা ঐ স্লোগান দিয়ে বলেন, ভারতের এ-প্রান্ত থেকে

ও-প্রান্তে প্রতিষ্ঠিত করা চাই হিন্দুরাজ। প্রতীক হিসাবে রথযাত্রা করেন তাঁরা। তাঁদের একটিমাত্র আশা—বৃহত্তর হিন্দু ভোটাররা মোহগ্রস্ত হয়ে ভোট বাক্সে তাদের সম্মতি জানাবে। ওঁরা গদিতে চড়ে বসবেন। শাসন ও শোষণ ক্ষমতা লাভ করবেন। ভাইপো-ভাগ্নেদের চাকরি দিতে থাকবেন, সুইস্-ব্যাঙ্কে অ্যাকাউন্ট খুলতে উদ্যোগী হয়ে পড়বেন। যতদিন না পরের নির্বাচনে ভোটবাক্সের পদাঘাতে গদিচ্যুত হন।

এই স্বার্থসন্ধানী রাজনীতিক দলের বিপরীত-মেরুতে আছেন একদল মুসলমান মৌলবাদী নেতা। তাঁরা মনে করেন যে, আমরা মুসলমানেরা, ভারতবর্ষের জীবনের মূল স্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে শতাব্দীর পর শতাব্দী 'সংখ্যালঘুতা'র সুবিধা ভোগ করে যাব! মনে রাখবেন, অষ্টম থেকে পঞ্চদশ শতাব্দী—দীর্ঘ সাতশ' বছর ধরে সেখানে আধিপত্য বজায় রাখার পর—স্পেনবাসীদের জীবনের মূলস্রোতে মিশে যেতে না পারায় যদি স্পেনে ইসলাম নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়ে থাকে—

জনতার একাংশ থেকে কে একজন উর্দুতে বাধা দিল বড়াভাই! আপনার কথা আমরা কিছুই বুঝতে পারছি না।

জামাল আন্দাজে সেদিকে ফিরে বললেন, আমারই দোষ। আমি ভুলে গেছিলাম যে, কলেজ-হলে লেকচার দিচ্ছি না। বেশ, আপনাদের বোধগম্য ভাষাতেই বলি : ভারতে প্রায় দশ কোটি মুসলমান আছে। তার শতকরা ষাট-সত্তর ভাগ অতি দরিদ্র—তারা দু-বেলা খেতে পায় না। পনের—বিশভাগও দারিদ্রসীমার নিচে! বাকি দশ-পনের শতাংশের অধিকাংশই মধ্যবিত্ত—চাকুরিজীবী, ব্যবসাদার, প্রভৃতি। আর মাত্র এক বা দুই শতাংশ কোটিপতি! তাঁরাই কট্টর মৌলবাদী নীতির নিয়ন্ত্রক। তাঁরা মুসলমান জনতাকে হিন্দুর বিরুদ্ধে খেপিয়ে তোলেন। তাঁরা তাতে লাভবান হন। কী হিসেবে? সাম্প্রদায়িক ভেদনীতিটা বজায় রেখে। একমাত্র তাহলেই তাঁরা সঙ্ঘবদ্ধ ভোট নিয়ে রাজনীতির বাজারে কেনাবেচা করতে পারেন। যে রাজনৈতিক দল তাঁদের বেশি সুবিধা দিতে স্বীকৃত হবে—মুসলমান হিসাবে—তাদেরই ভোটগুলো দেওয়া হবে। ঐ নিরন্ন-নির্যাতিত ঝোপড়িবাসী মুসলমানদের তাতে কোন সুবিধা হয় না। সব সুবিধাই লাভ করেন নেতৃস্থানীয় কোটিপতি মৌলবাদীরা।

আমার কথা : আমরা ধর্ম বজায় রাখব, কিন্তু কুসংস্কার নয়। গো-মাংস মুসলমানের খাদ্যতালিকায় আবশ্যিক, এ-কথা কোন পীর-পয়গম্বর বলেননি কোনদিন। না শেষনবী, না কোরান, না হাদিস। তবু একশ্রেণীর স্বার্থসন্ধানী মৌলবাদী মুসলিম ফতোয়া জারি করেন : গো-মাংস খাওয়া আবশ্যিক। 'হিন্দুত্ব-বিরোধিতা' ছাড়া এ নির্দেশের পিছনে আর কোনও প্রেরণা নেই। হিন্দু ধর্ম ত্যাগ করে যাঁরা ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হতেন দীর্ঘদিন ধরে তাঁদের গো-মাংস খাওয়াটা বাধ্যতামূলক ছিল। এই দৃষ্টিভঙ্গি বদল করার দিন

এসেছে। আজই! এখনই!

দ্বিতীয় কথা : বহুবিবাহ এবং তালাক-প্রথা। কট্টর মুসলিম নেতারা মনে করেন মুসলমানকে এক সঙ্গে চার-চারটি বিবি রাখার অনুমতি দিতে হবে। এ নাকি শরিয়তি আইনের অপরিহার্য নির্দেশ। তাছাড়া তালাক প্রথা পরিবর্তন করা যাবে না—সুপ্রিম কোর্ট শাহ্‌বানুর পক্ষে রায় দিলেও! কেন? না, আমরা মুসলমান পুরুষমানুষেরা স্ত্রীশিক্ষা, স্ত্রীমুক্তি, স্ত্রীস্বাধীনতার বিরোধী! বন্ধুগণ! **আপনারা কি জানেন, পাকিস্তানের মতো কট্টর ইসলামি দেশেও বর্তমানে বহুবিবাহ এবং তালাকপ্রথা নিষিদ্ধ?** এই প্রশ্নটি নিয়ে আমি আমার পরবর্তী বক্তা মৌলানা-সাহেবের সঙ্গে আলোচনা করেছিলাম। উনি বললেন, পাকিস্তান একটি নিছক 'মুসলিম' রাষ্ট্র, 'ইসলামিক' রাষ্ট্র নয়। পাকিস্তানের মুসলমান একসঙ্গে চারটি বিবি পুষতে পারে না—তিনবার তালাক দিয়ে বিশবছরের বিবাহিত সহধর্মিণীকে ঘর থেকে পথে নামিয়ে দিতে পারে না। এঁরা বলেন : তাতে কী? আমরা এতকাল স্ত্রীলোকদের উপর যে আধিপত্য বিস্তার করে এসেছি, যে অত্যাচার করে এসেছি তা অব্যাহত রাখতে দিতেই হবে! না হলে আমরা আন্দোলন করব। যে পার্টি আমাদের এই অধিকার রক্ষার প্রতিশ্রুতি দেবে তাকেই ভোট দেব! দশ কোটি মুসলমান আছে ভারতে। তার মধ্যে যাঁরা ভোটার তার আশি-নব্বই শতাংশ পুরুষ, বাকি দশ বিশ শতাংশ মহিলা। ঐ মহিলাদের ঘরে বন্দী করে রাখলেই হল! এই দশকোটি মুসলমান ভোট নিয়ে আমরা ব্যবসা করব।

বন্ধুগণ! ভারতে বহু ধর্মের লোক সুখে-স্বচ্ছন্দে বাস করবে এটাই প্রত্যাশিত। আমরা ইসলাম ধর্ম পালন করব, অপ্রতিবাদে। কিন্তু আমাদের ভারতীয় হয়ে যেতে হবে। না হলে এই সাম্প্রদায়িক বিভেদে না-হিন্দু না-মুসলিম কেউই শান্তি পাবে না।

* * *

মোটকথা, অচিরেই বহিরাগত কট্টর সবুজ-পার্টির অফিসটাও গ্রাম থেকে উঠে গেল।

সবচেয়ে মজার কথা : মানুভাই দাভে একটা বিচিত্র খেতাব লাভ করলেন। আনুষ্ঠানিকভাবে নয়—মানুষের মুখে মুখে। গাঁয়ের অ্যাপামর জনসাধারণ—কী হিন্দু, কী মুসলমান—তাঁকে ডাকতে শুরু করল এক বিচিত্র সম্বোধনে : বাপুজী!

এতবড় সম্মান কজন পায়?

উদ্বোধনের দিনে খুশবন্ত সিং খুশবন্ত হয়ে বলেছিলেন, It has proved that Gandhiji's spirit is not really dead [এখানে প্রমাণিত হল যে, গান্ধীজীর মূলনীতিটা মৃত্যুঞ্জয়ী।]

অ্যাডভোকেট মগনভাই বারোত তাঁর ভাষণে বলেছিলেন : "One just can't belive that such a thing can happen in real life. It in just a

miracle and if only such incidents were to get replicated in many of our communally sensitive towns, the monster would indeed vanish." [বাস্তবে এমন ঘটনা যে ঘটতেও পারে তা যেন বিশ্বাসই হতে চায় না। এ যেন আধিদৈবিক এক অলৌকিক কাণ্ড! আর এমন ঘটনা যদি আমাদের সাম্প্রদায়িক স্পর্শকাতর অন্যান্য শহরগুলিতে ক্রমান্বয়ে ঘটতে থাকে তাহলে ঐ সাম্প্রদায়িক রাক্ষসটা হাওয়ায় মিলিয়ে যাবে।]

* * *

এইখানে—কাহিনী সমাপ্ত করার পূর্বে, একটা ব্যক্তিগত কৈফিয়ৎ দিয়ে যাই—এ কাহিনীর কিছুটা ঔপনাস্যিক সত্য, কিছুটা বাস্তব সত্য। ডক্টর খইরনার, মানুভাই দাভে, ভোগীলাল, মহেন্দ্রভাই, মগনভাই বারোত ইত্যাদি বাস্তব চরিত্র। জ্ঞাতসারে তাঁদের বিষয়ে আমি ঔপন্যাসিকের সাহিত্যস্বীকৃত কল্পনাশ্রয়ী কোনও কথা বলিনি। মীরাবহিনের চরিত্রটি আদ্যন্ত বাস্তব—তাঁর স্বামীর নামও ; কিন্তু তাঁর নামটা আমাকে কল্পনা করতে হয়েছে। সমস্ত তথ্য বাস্তব ঘটনার ভিত্তিতে রচিত—কিন্তু, সহজেই অনুমেয়—কথোপকথন প্রভৃতি আমাকে কল্পনা করতে হয়েছে। তবু দৃঢ়তার সঙ্গে বলব, বাস্তবতা থেকে জ্ঞাতসারে আমি কোথাও বিচ্যুত হইনি।

আমি জানি, আমার পাঠক-পাঠিকা বেশি আগ্রহী জানতে—সিধ্‌পুরে কী ঘটেছিল, ভাগলপুরে কী ঘটেছিল। আমার মনগড়া আষাঢ়ে গল্প নয়, বাস্তব তথ্য। তাই কথাসাহিত্যের খাতিরে আমি সজ্ঞানে কোথাও বাস্তব তথ্যকে অতিক্রম করিনি। তবু এইসব বাস্তব চরিত্রগুলি বর্ণনা করার সময় ভ্রমক্রমে আমি যদি কারও মনে বা ধর্মবিশ্বাসে আঘাত দিয়ে থাকি তবে করজোড়ে ক্ষমা চাইছি। আমার একমাত্র উদ্দেশ্য : কথাসাহিত্যের মাধ্যমে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি গড়ে তোলা। প্রফেসর জামালুদ্দীন বা জুলেখা বা রসিদ আহ্‌মেদকে যদি আমি অনভিপ্রেতভাবে বর্ণনা করে থাকি তবে আমি তাঁদের কাছে যুক্তকরে ক্ষমাপ্রার্থী।

সিধ্‌পুরে 'বাপুজী সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি সঙ্ঘের' উদ্বোধন দিবসে শ্রদ্ধেয় মানুভাই দাভে যা বলেছিলেন—দৈনিক ইংরেজি পত্রিকায় যা ছাপা হয়েছিল তা এই : "If attitudes are to undergo change then one has to set a precedent. If it is in the benefit of mankind, one has to make a beginning. In this particular case, I did it. Nothing more. [যদি দৃষ্টিভঙ্গি বদল করার প্রয়োজন হয়, তাহলে একটা উদাহরণ দিয়েই তো তা শুরু করতে হবে? যদি সেই পরিবর্তনে বৃহত্তর মনুষ্যসমাজের উপকার হয়, তাহলে একজনকে সেটা শুরু করার দায়িত্বটা নিতে হবে। এক্ষেত্রে আমি সেটা নিয়েছি। ব্যস! এর বেশি কিছু নয়।]

কী সহজ, সরল সংক্ষিপ্ত বক্তব্য!

মানুভাই দাভে যখন স্কুলের ছাত্র—আহমেদাবাদে—তখন উনি স্বয়ং মহাত্মাজীর সান্নিধ্যে আসার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। প্রতিদিন সন্ধ্যায় আশ্রমের প্রার্থনা সভায় যোগ দিতেন। উনি ছিলেন সেবাগ্রামে বালখিল্য বাহিনীর একজন সক্রিয় সদস্য। মহাত্মাজী বহুবার ওঁর মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করেছেন। সেই ঐতিহ্যের বাহক মানুভাই দাভেজী আজ সিধ্‌পুরের "বাপুজী"!

উপসংহারে আবার সেই মূল প্রশ্নটায় ফিরে আসি :

'কুয়্যো ভাদিস!'

এ কোথায় চলেছি আমরা? একদল গেরুয়া রঙের হনুমান আর একদল সবুজ রঙের বাঁদর ক্রমাগত ধর্মের জিগির তুলে সম্প্রদায়গত বিভেদটা জিইয়ে রাখছে! আর যারা সংবিধানকে কব্জা করে দেশশাসনের নামে দেশশোষণে বদ্ধপরিকর তারা ঐ 'সংখ্যালঘুতা' বিশেষ্য পদটাকে ভোটের বাজারে একটা পণ্য হিসাবে গণ্য করে! ঐ সব স্বার্থসন্ধানী হোলটাইম রাজনীতিবিদের জুয়াচুরি বন্ধ করে আমরা কি পারি না একটা সুস্থ-সবল-সত্যনিষ্ঠ সরকার গঠন করতে—যারা হিন্দু, মুসলিম, ক্রিশ্চান, শিখকে দেখতে পাবে 'ভারতীয়' হিসাবে? যে মূর্খ নির্যাতিত, নিরন্ন, অবহেলিত আমজনতাকে দেখিয়ে নির্লজ্জের মতো আজও প্রশ্ন করছে: 'হিন্দু না ওরা মুস্‌লিম?' তাদের মুখের উপর আজও কি বলার সময় আসেনি যে : 'ডুবিছে মানুষ! সন্তান মোর মা'র!'

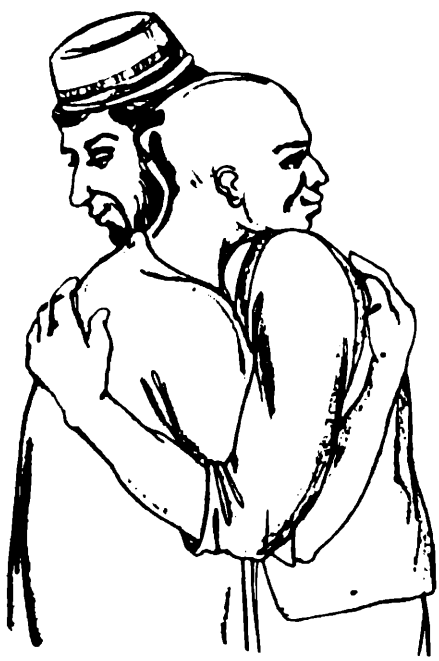

আয়ারল্যান্ড নিরাশীবিষ

'নিরাশীবিষ' বুঝলেন না, বুঝি? তা দোষ আপনার নয়। শব্দটা অভিধানে নেই। 'নি'উপসর্গটাই আপনাকে ঝামেলায় ফেলেছে। ওটা বলতে গেলে গায়ের জোরে আমিই বসিয়েছি। ওটাকে সাবধানে মুখের সামনে থেকে সরিয়ে নিলে — মনে রাখবেন, সরীসৃপটা বাবুরাম সাপুড়ের বিশেষ জাতের নয়, তাই সাবধানতা — অর্থটা বোধগম্য হবে। তাও হল না? কী করে হবে? স্বয়ং যশুরে বাঙাল মাইকেলই তো বলে গেছেন, 'কী যাতনা বিষে, বুঝিবে সে কিসে' কভু ঐ 'ইসে' দংশেনি যারে!

আসল ব্যাপারটা কী জানেন, এ জাতীয় কিস্‌সা লেখার পাঠ যাঁর কাছ থেকে নিয়েছি তিনি ফর্মান জারি করে গেছেন : বিদেশী রাজপুত্রকে 'হিন্দের বন্দী' করিতে হইলে 'নাম দিয়াই বংশ পরিচয় স্বীকার করিতে হয়!' গুরুশিষ্যে সাক্ষাৎ অবশ্য কোনদিন হয়নি। তিনি থাকতেন বোম্বাইয়ে, আমি এই কল্লোলিনী শহরে — কিন্তু একলব্যের মতো এ ব্যাপারে যখন ওঁকে গুরু বলে স্বীকার করে নিয়েছি, তখন ঐ উপদেশটাও মেনে চলি : বিদেশী কোন রাজপুত্রকে 'রূপান্তরায়ন' প্রক্রিয়ায় যখন হিন্দের কারগারে বেমক্কা বন্দি করি তখন তার বংশ-পরিচয়টা স্বীকার করি — ঐ নামকরণের মাধ্যমে।

আমার এই কিস্‌সাটির সহোদর : 'মান মানে কচু' এবং 'আম্রপালী'। যাক ওসব অবান্তর কথা। গপ্পো শুনতে চেয়েছেন, সেটাই শুনুন :

আমাদের কাহিনীর নায়ক : বাসুদেব চাপেকার। আদি নিবাস পুনে জেলার অন্তর্গত চিঁচওয়াড় গ্রাম। অবশ্য পাঁচ পুরুষ ধরে ওরা পুনের বাসিন্দা। বিনায়ক দামোদর চাপেকার ওর ঠাকুর্দা। শৈশবে পিতৃমাতৃহীন বাসুদেবকে শিশুকাল থেকেই বুকের পাঁজরের মতো মানুষ করেছেন। বাসুদেবের কোনও ভাইবোন নেই — থাকার মধ্যে আছেন ঐ অশীতিপর ব্রাহ্মণ দাদু আর দিদা। বিনায়ক দামোদর পণ্ডিত ব্যক্তি। ইংরেজি মোটামুটি জানেন। মারাঠি ভাষায় সুপণ্ডিত এবং সংস্কৃতেও। তিনি ছিলেন পুনের বিখ্যাত আম্মাদেঈ

মায়ের মন্দিরের পুরোহিত — ছিলেন বলছি কেন? এই পঁচানব্বই সালেও তিনি তাই। তিন পুরুষ ধরে এই পৌরোহিত্য করছেন ওঁরা। প্রায় একশ বছর।

বাসুদেব ওঁর নয়নের মণি। নিজে ভাল ইংরেজি জানতেন না বলে সারা জীবন নানান অসুবিধায় ভুগেছেন। তাই বাসুদেবকে স্কুলে ভর্তি করে দিয়েছিলেন। ছাত্র হিসাবে বাসুদেব ছিল স্কুলের রত্ন। স্কুল-ফাইনালে জেলার মধ্যে প্রথম হয়ে স্কলারশিপ পায়। পুনেতেই জীববিজ্ঞানে অনার্স নিয়ে ফার্স্ট ক্লাস সেকেন্ড হয়। দাদুকে এসে বলেছিল, এম. এস.-সি পড়ব না। তুমি যদি অনুমতি দাও ডাক্তারী পড়তে চাই। বোম্বাইয়ে!

দাদু আপত্তি করেননি। বলেছিলেন, পড়, তবে একটি শর্তে।

— শর্ত! কী শর্ত! খাওয়া-দাওয়া বাছ-বিচারের?

— না! সে তোর বিবেক যা বলে তাই করবি। তুই জানিস্, আমি কিসে খুশি হব। তবে সে বিষয়ে কোন আদেশ দিয়ে গেলে তোর মুশকিল হতে পারে। দুনিয়া তো অতি দ্রুত বদলে যাচ্ছে। আমি শুধু একটি শর্ত আরোপ করে যাব। তুই যখন পাস করে বের হবি ততদিনে আমরা দু'জন হয়তো সংসারের মায়া কাটাবো। এ বাড়িটার তুই একাই ওয়ারিশ। এটা বেচে দিয়ে আমাদের আদি গ্রামে চলে যাবি। আমাদের বাস্তুভিটাটা পড়ে গেছে নিশ্চিত — কিন্তু সাবেক জমিটা কেউ বেদখল করবে না। সেখানে একটা বাড়ি বানিয়ে তুই প্র্যাকটিস করবি।

বাসুদেব অবাক হয়ে বলেছিল, কেন দাদু? সেখানে কী এমন রোজগার হবে আমার? তার চেয়ে বোম্বাইতে —

— জানি। একথা তো সবাই বলে। কিন্তু টাকাটাই কি সব? গাঁয়ের মানুষগুলোর ভাল চিকিৎসার ব্যবস্থা কি কোনদিনই হবে না?

বাসুদেব বলেছিল, কিন্তু সে জমি যে প্রতিবেশীরা বেদখল করে নেয়নি তাই বা কী করে জানলে?

— আমি জানি। প্রথমত, ব্রাহ্মণের জমি গ্রামের মানুষ ওভাবে বেদখল করে না। দ্বিতীয়ত, ওরা মাত্র একশ বছরের ভিতর ভুলে যায়নি তুই চাপেকার ভ্রাতৃত্রয়ের শেষ বংশধর।

বাসুদেব পড়তে চলে গেল বোম্বাই। সুপারিশের প্রয়োজন হয়নি। তার পরীক্ষার রেজাল্ট আর কম্পিটিটিভ অ্যাডমিশন টেস্টের নম্বরেই সে ভর্তি হয়ে গেল। একজন দানবীরের স্কলারশিপ থেকে 'ফ্রি-শিপ'টাও পেয়ে গেল। গেল কেটে চার-চারটে বছর। 'আম্মা-মা মন্দিরের পুরোহিত বুড়ো-বুড়ির সংসারটা কোনরকমে চালিয়েছেন চাল-কলা-

নৈবেদ্য-প্রণামীর উপার্জনে — নাতিকে এক কপর্দকও পাঠাতে পারেননি। বাসুদেব তাতে দমেনি। দিনে কলেজ করে সন্ধ্যায় সে বায়োলজি-জুয়োলজির ছাত্রদের পড়িয়েছে। তারপর রাত জেগে নিজের পরীক্ষার পড়া! অসাধারণ তার নিষ্ঠা, মেধা আর অধ্যবসায়। শেষ পরীক্ষাতেও ফার্স্ট ক্লাস পেয়ে ফিরে এল পুনেতে। দাদুকে আগেই টেলিগ্রাম করে জানিয়েছিল। প্রণাম করতে মাথাটা যেই নিচু করেছে অমনি ওর দুটি কাঁধ চেপে ধরলেন দামোদর : পাগল কোথাকার! আগে ঁআম্মা-মাকে প্রণাম করবি তো? আয় মন্দিরে। ঐখানে ঘটিতে জল আছে, পা-টা ধুয়ে নে। হ্যাঁরে! আহ্নিক-টাহ্নিক করিস? আচমনের মন্ত্রটা মনে আছে?

বাসুদেব এক গাল হেসে বলেছিল, তেমন দীক্ষাগুরুর কাছ থেকে উপনয়ন নিইনি। বুঝলে?

দাদুই ওর দীক্ষাগুরু।

পাশ করা নাতিকে পেয়ে বুড়ো-বুড়ির সেদিন কী আনন্দ। ঁআম্মাবাঈ মায়ের বরাতে সেদিন পরমান্ন জুটল!

পরদিন সকালে সুযোগ মতো বাসুদেব বললে, দাদু, একটা কথা ছিল। বল, তুমি রাগ করবে না?

— রাগ করার মতো কথা না বললে অহেতুক রাগ করতেই বা যাব কেন? কী এমন কথা? বল।

দাদু বসেছিলেন তাঁর ক্যাম্বিসের ইজিচেয়ারে। দিদা একটু দূরে বসে ফুলের মালা গাঁথছে। ঁ মায়ের মালা। বাসুদেব একটা কুশাসন টেনে নিয়ে বললে, বলছি! কিন্তু তার আগে বল দেখি, কেমন জাতের কথা বললে তুমি রাগ করবে? তুমি অথবা দিদা। দু' একটা নমুনা শোনাও।

দামোদর বললেন, ধর যদি তুই বলিস্ বোম্বাইতে একটা খুব মোটা মাইনের চাকরি পেয়ে গেছি। চিঁচওয়াড় গাঁয়ে গিয়ে বসলে আট-দশ বছর পরে আমার যা রোজগার হবে ওরা এখনি সেই টাকা মাহিনা দিতে চাইছে। তুই একথা বললে আমার রাগ হবে না? আমার এতদিনের স্বপ্নটা চুরমার করে ভেঙে দিলে!

বাসুদেব অবাক হয়ে যায়। বলে, আচ্ছা দাদু! তুমি চিঁচওয়াড়-গাঁ ছেড়ে কতদিন আগে পুনেতে উঠে এসেছিলে বল তো? তোমার মনে আছে গাঁয়ের কথা?

দামোদর নীরবে তাঁর পাকা দাড়িতে হাত বুলাতে থাকেন। জবাব দেন না। বাসুদেব তাগাদা দেয়, কী হল? বল? গাঁয়ের কথা তোমার মনে আছে? গাঁয়ের মানুষদের কথা?

দামোদর সহাস্যে বললেন, চিঁচওয়াড় গাঁটাকে আমি জীবনে কখনো চোখেই

দেখিনি রে বাসু! আমার ঠাকুর্দা গ্রাম ত্যাগ করে পুনেতে চলে এসেছিলেন। আমার জন্ম হয়েছে পুনেতে। যে বছর প্রথম বিশ্বযুদ্ধ বাধে — উনিশ'শ চৌদ্দ সালে।

বাসুদেব সবিস্ময়ে বলে, চিঁচওয়াড়ের উপর তোমার এত প্রেম, তবু কোনদিন গিয়ে দেখেও আসনি?

— না!

— কেন?

— কোন লজ্জায় যাব?

— কেন? কীসের লজ্জা তোমার? কীসের সঙ্কোচ?

— গাঁ-মায়ের কাছে আমাদের যে বংশানুক্রমিক ঋণ তা পরিশোধ তো দূরের কথা — এই একশ বছরের জমা অন্তত সুদের টাকাটা সঙ্গে করে নিয়ে যেতে না পারলে কেমন করে যাব?

বাসুদেব এগিয়ে আসে। দাদুর পা-দুটো কোলে তুলে নেয়। আলতো করে টিপতে টিপতে বলে, এ তো বড় আজব কথা! আমাকে তো কোনদিন বলনি! কী কর্জ নিয়েছি আমরা গাঁয়ের কাছে?

দামোদর বললেন, আজ নয়, বাসু। সময়মতো সেকথা তোকে জানিয়ে যাব। আমাদের চার পুরুষের ঋণ যে তোকেই শোধ করতে হবে!

বাসুদেব তার ঠাম্মার দিকে তাকিয়ে বলে, দিদা! তুমি ব্যাপারটা জান?

দিদা জবাব দেয় না। মিটিমিটি হাসে। বাসুদেব দাদুর ঠ্যাঙ জোড়া ছেড়ে দিয়ে দিদার দিকে ঘনিয়ে আছে। দিদা বলে, অ্যাই! দেখ্‌স আমাকে ছুঁয়ে দিস্‌নি যেন! তোর বাসি কাপড়।

বাসু থমকে যায়। বলে, তাহলে বল! দাদু কোন ব্যাপারটা গোপন করছে, না হলে ছুঁয়ে দেব।

দামোদর বলেন, বাঁদরামো করিস্ না, বাসু। আমি অনুমতি না দিলে তোর দিদা কিছুতেই কথাটা বলবে না। তুই জোর করে ওকে ছুঁয়ে দিলে, এই শীতের সাতসকালে ওকে আর একবার স্নান করতে হবে। এই মাত্র! শোন, অত ব্যস্ত হবার কিছু নেই। সময় যখন হবে তখন সব কথাই আমি জানাবো। কেন তোকে ডাক্তারী পড়তে পাঠিয়েছিলাম। এখন তুই কী বলতে চাইছিলি তাই বল। তোর কোন্ কথাটা শুনে রাগ করলেও করতে পারি।

বাসুদেব কিছু বলার আগেই ওপাশ থেকে দিদা বলে ওঠে, বাসুকে কিছু বলতে হবে না। আমি বুঝতে পেরেছি, কথাটা কী!

এঁরা দুজনেই অবাক। প্রশ্নটা দামোদরই পেশ করেন। তুমি বুঝতে পেরেছ, কথাটা

কী? তো বেশ! তোমার আন্দাজটাই আগে শুনি।

দিদা বলে, চাকরি পাওয়ার কথা বলতে আসেনি বাসু। ও অন্য একটা দুর্লভ জিনিস আচমকা কুড়িয়ে পেয়েছে। একটা আনমোল মোতি! সেটা ঘরে আনতে চায় — যদি তুমি-আমি রাগ না করি, কীরে? তাই তো?

দামোদরের ত্রিপুণ্ড্রকরঞ্জিত ললাট কুঞ্চিত হয়ে ওঠে। বলেন, কী এমন সম্পদ?

একবার নাতি একবার ধর্মপত্নীর দিকে তাকিয়ে দেখেন। আন্দাজ করতে পারেন না।

দিদাই বাসুদেবকে প্রশ্ন করেন, হ্যাঁরে, মেয়েটা পালটি-ঘর হোক না হোক, বামুন তো?

উত্তেজনায় দামোদর উঠে দাঁড়ান : ও! এই কথা?

বাসুদেব হেসে গড়িয়ে পড়ে। আক্ষরিক অর্থে। সান বাঁধানো মেঝেতে গড়াগড়ি দিয়ে উঠে বসে। বলে, দিদা! তুমি এমন অদ্ভুত কথাটা ভাবলে কী করে! তুমি মজুত থাকতে আমি আর কোন মেয়েকে ভালবাসতে পারি!

দামোদর পুনরায় ইজিচেয়ারে বসে পড়েন। বলেন, দাদু-দিদার সঙ্গে রসিকতা অনেক হয়েছে। এবার কাজের কথাটা বল্ — আমি মন্দিরে যাব।

বাসুদেব সংযত হয়। গম্ভীর হয়ে বলে, কিছুটা আঘাত তোমরা পাবেই যদি রাজি হও। তাই হাসি-মশকরায় ব্যাপারটা লঘু করতে চাইছিলাম। কিন্তু আমি তো তোমাদের দুজনকেই জানি। তোমাদের প্রচণ্ড অসুবিধা সত্ত্বেও তোমরা আমাকে অনুমতি দেবে — এই আমার বিশ্বাস। তুমি জান, অনুমতি না দিলে আমি সে কাজ নিশ্চয় করব না।

দামোদর বলেন, কথাটা কী? আর কত ভূমিকা করবি?

— আমি ইতিমধ্যে একটা প্রতিযোগিতামূলক দরখাস্ত করেছিলাম। শুনেছি সারা ভারতবর্ষ থেকে তিনশ জন আমারই মতো আবেদন করেছিল। নির্দিষ্ট বয়স সীমার ভিতর ফার্স্ট ক্লাস ডিগ্রিধারী ডাক্তার। একটি মাত্র স্কলারশিপ। তিন বছরের কোর্স। মাস্টার্স ডিগ্রি — এম. ডি.। একজন প্রয়াত আইরিশম্যানের স্মৃতিতে দেওয়া স্কলারশিপ। পড়তে হবে ডাবলিনের ট্রিনিটি মেডিকেল কলেজে। যাতায়াতের খরচ ওরা দেবে। থাকা-খাওয়ার খরচও লাগবে না। তবে হাতখরচা ছাত্রের নিজের।

বাসুদেব এখানেই থামল। ওর দাদু বললেন, ডাবলিনটা কোথায়?

— আইরিশ রিপাবলিকের রাজধানী।

— সে দেশটা কোথায়?

— ব্রিটিশ আইলস্-এর একটা দ্বীপ। ইংলন্ডের পাশাপাশি।

— তার মানে বিলেত?

— হ্যাঁ তাই।

— তা তিন'শজন দরখাস্ত করেছে বলছ, তুমিই যে নির্বাচিত ... কথাটা শেষ হল না — বাসুদেব উঠে গিয়ে দু'জনকে প্রণাম করল। বৃদ্ধ তার মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করলেন বটে কিন্তু তাঁকে খুব উচ্ছ্বসিত মনে হল না। ধর্মপত্নীর দিকে ফিরে বললেন, গোপালের মা কী বল?

বাসুদেব তাঁকে ভেবেচিন্তে জবাব দেওয়ার সুযোগ দিল না। আবার বলে ওঠে, আমি জানি, তোমাদের দু'জনেরই যথেষ্ট বয়স হয়েছে। অনেক কষ্ট তোমরা সহ্য করেছ। তোমরা আপত্তি করলে আমি ক্ষুব্ধ হব না। এই বাড়িটা বেচে দিয়ে গ্রামের বাড়িতে প্র্যাকটিসে বসব। তোমাদের দু'জনকে সেখানে নিয়ে যাব। কী চাও মনস্থির করে বল?

দামোদর শুধু তাঁর পূর্ববর্তী প্রশ্নটা ধর্মপত্নীকে পুনরায় পেশ করলেন, গোপালের মায়ের কী মত?

দিদা বললেন, আমি কোনদিন মত দিয়েছি যে, আজ দেব? তোমরা যা ব্যবস্থা করবে তাই মেনে নেব।

বৃদ্ধ বললেন, মেনে নেবে তা জানি। তবু তুমি মনে মনে কী হলে খুশি হও?

বৃদ্ধার মালা গাঁথা শেষ হয়েছিল। এবার উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, তা যদি বল, তাহলে বলব : বাসুর উন্নতির পথে কাঁটা হয়ে আমি বেঁচে থাকতে চাই না। এই আমার মত। তিনটে বছর দেখতে দেখতে কেটে যাবে।

বৃদ্ধ হেসে বললেন, তা কিন্তু যাবে না, গোপালের মা। আমার সাতাত্তর চলছে, তোমার সাতষট্টি। ও এম. ডি. হতে হতে তুমি হবে সত্তর, আমি আশি!

— তা হোক! আম্মামাঈ-এর ইচ্ছেয় আমরা দুজনেই বেঁচে থাকব — তুমি দেখে নিও।

দামোদর হাসলেন। নাতির দিকে ফিরে বললেন, আর কি? সুপ্রিম কোর্টের অর্ডার তো হয়ে গেল!

বাসুদেব আবার প্রণাম করল ওঁদের দুজনকে।

যাবার দিন ঘনিয়ে এল। পাসপোর্ট, ভিসা, টিকিট এল হাতে। দিদা লুকিয়ে তার এক ছড়া সোনার মালা বেচে দিয়ে এল স্যাকরার কাছে। কিছু গরম জামা, কিছু ভাল প্যান্ট-শার্ট না হলে বাঁদরটা লঙ্কাজয় করবে কী করে? ভাল সুটকেসই এখন একটা সাত-আটশ টাকা।

বাসুদেব আবার একদিন চেপে ধরল দাদুকে, কই গাঁয়ের কাছে আমাদের বংশের

কী ঋণ আছে বললে না তো?

দাদু বললেন, আমার একটা স্মৃতিচারণ দিনপঞ্জি মতো আছে। তাতে আছে আমাদের বংশলতিকা, বংশপরিচয় আর আমার তিন দাদুর অসামান্য কীর্তিকাহিনীর কথা।

বাসুদেব বললে, আমি মোটামুটি জানি, কিন্তু খুব বিস্তারিত জানি না।

— এবার জানবি। আমার ডায়েরিটা পড়লে। এটা তুই বিলেতে নিয়ে যাস। তাড়াহুড়ার কিছু নেই — প্র্যাকটিস জমে গেলে, হাতে পয়সা জমলে ওটা বই হিসাবে প্রকাশ করিস। ভারতবর্ষ ভুলে গেছে — চাপেকার ভ্রাতৃত্রয়ের কথা!

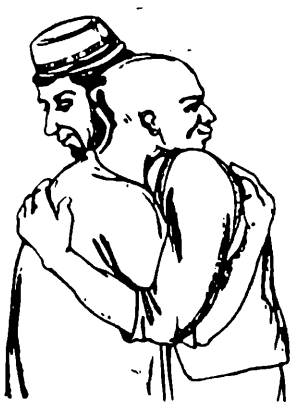

।। দুই ।।

প্রায় তিনটে বছর কেটে গেছে তারপর। উনিশশ' বিরানব্বই, তিরানব্বই, আর চুরানব্বই-এর আধাআধি। আর মাস ছয়েক পরেই বাসু দেশে ফিরবে। ফার্স্ট ক্লাস পাবে কি না জানে না, কিন্তু একবারেই পাশ করবে এই ওর দৃঢ়বিশ্বাস। সামনেই লং ভেকেশান; তারপর মাসখানেক ক্লাস হবে। এবং তারপর পরীক্ষা। এর আগেও বার দুই লং ভেকেশান পেয়েছে। ওর সহপাঠীরা রওনা হয়ে পড়েছে ইংলন্ডে, ফ্রান্সে, সুইজারল্যান্ডে। ও কোথাও যায়নি। হয় সারাদিন বসে পড়েছে লাইব্রেরিতে অথবা জনমজুর খেটেছে কারও বাড়িতে — লন মোয়িং, বাগান সাফা করা, ভ্যাকুয়াম ক্লিনিং। প্রবল ইচ্ছা : ফেরার পথে অন্তত লন্ডন, প্যারিস আর রোম দেখে যাওয়া। দিদার জন্য নিয়ে যাবে একটা দক্ষিণাবর্ত শঙ্খ, আর দাদুর জন্য একটা দূরবীন। দাদু জ্যোতিষ চর্চা করে — ফলিত জ্যোতিষ শুধু নয়, গণিত জ্যোতিষ। শনির বলয়, বৃহস্পতির গ্রহ, আর অ্যান্ড্রোমিডার নীহারিকা দেখতে পেলে দাদু কী খুশিই না হবে!

ডাবলিন শহরটা আয়ার্ল্যান্ড দ্বীপের পূর্ব উপকূলে — আইরিশ সি'র একটি বন্দর। সমুদ্রের অপর পারে ইংলন্ডের লিভারপুল। ডাবলিনের লোকসংখ্যা দশ লক্ষের কাছাকাছি। অধিকাংশই রোমান ক্যাথলিক। শহরের যা কিছু দ্রষ্টব্য ঘুরে ঘুরে দেখেছে বাসুদেব — ট্রেনে বা বাসে নয়, সাইকেলে চেপে। তিন বছরের জন্য মাসিক ভাড়ায় ও একটা সাইকেল রেখেছে। শর্ত হচ্ছে ও কোন ভাড়া দেবে না। সপ্তাহে একদিন দোকানের কাচ ধুয়ে-মুছে সাফা করবে। গোটা শো-রুমটা ভ্যাকুয়াম ক্লিনারের মাধ্যমে সাফা করে দেবে। এতে বাসুদেব শুধু অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হয়েছে বললেই যথেষ্ট হয় না — ডাবলিন শহরের সব অন্ধি-সন্ধি ওর নখদর্পণে। ইদানীং ও টুরিস্টদের গাইডের

কাজও নেয় শনি-রবিবারে। টুরিস্টদের ঘুরিয়ে দেখায় শহরের বিখ্যাত প্রাসাদগুলি — অধিকাংশই ইংলিশ স্থাপত্যের ভেজাল মেশানো জর্জিয়ান সৌধ : কাস্টমস হাউস, লিইনস্টার হাউস বা লোকসভা, প্রাক-স্বাধীনতা যুগের ইংরেজদের লোকসভা — যা, বর্তমানে ব্যাঙ্ক অফ আয়ার্ল্যান্ড। কিছু প্রোটেস্টান্ট গির্জা, একাদশ বা দ্বাদশ শতকের। আর ওদের ট্রিনিটি-কলেজ শ্যাপেলে সযত্নে রাখা আছে বাইবেলের একটি মহামূল্যবান কপি। হাতে লেখা, সুচিত্রিত, ল্যাটিন ভাষার বাইবেল। অষ্টম শতাব্দীর সম্পদ। নিষ্ঠাবান খ্রীস্টান দর্শকেরা সেই সুরক্ষিত কাচের আলমারির সামনে নতজানু হয়ে প্রার্থনা জানায়।

এছাড়া দর্শনীয় বস্তু ডাবলিন কাসল্ — প্রাক্ স্বাধীনতা যুগে ছিল ব্রিটিশ রাজশক্তির মূলকেন্দ্র — কলকাতায় যেমন ফোর্ট উইলিয়াম। এতদিন বাসুদেবের ধারণা ছিল আয়ার্ল্যান্ড ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জের অন্যতম একটি দ্বীপ। সেখানে যারা বাস করে তারাও ভারতবর্ষকে দু'শ বছর শাসন করেছে ব্রিটিশের পরিচয়ে। কথাটা মিথ্যে নয়, আবার পুরোপুরি সত্যও নয়। কারণ, আইরিশরা একই ভাবে শাসিত হয়েছে ইংরেজদের দ্বারা। তাদের স্বাধীনতা সংগ্রামও কম রক্তক্ষয়ী নয়। ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধে শহীদের যে তালিকা তার প্রথম দিকেই আছে তিন-তিনটি নাম, যে বংশের একমাত্র বংশধর ঐ বাসুদেব চাপেকার। তাই আইরিশ স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসের এদিকটা ও খুব যত্ন নিয়ে পড়েছে। অবশ্য আরও একটি হেতু আছে। বাসুদেব রীতিমতো পরীক্ষা দিয়ে ডাবলিন শহরে তালিকাভুক্ত গাইড হয়েছে। টুরিস্ট-বাস নিয়ে ছুটির দিনে আয়ার্ল্যান্ড বেড়াতে আসা যাত্রীদের শহর ঘুরিয়ে দেখায়। ঐ সঙ্গে ইতিহাসের গল্প শোনায়।

ডাবলিনে সবুজ ঘাসে ছাওয়া বিরাট বড় বড় উদ্যান আছে অনেকগুলি — সেন্ট স্টিফেন্স গ্রীন, ফোনিক্স পার্ক, ঘোড়দৌড়ের মাঠ ইত্যাদি। আমাদের দেশপ্রিয়, দেশবন্ধু বা শ্রদ্ধানন্দ পার্কের মতো তৃণতৃষিত ঊষর ধূলিমলিন ভূখণ্ড নয় ; বিরাট বড় বড় নয়নাভিরাম হরিৎ তৃণাচ্ছাদিত উদ্যান। জাতীয় সংগ্রহশালা বা মিউনিসিপ্যাল আর্ট গ্যালারিতে পায়ে চলা পথের বন্ধনীতে যেটুকু মাঠ, তা কোথাও নেড়া নয়। ফুল আর ঘাসের মিতালী সর্বত্র। ডাবলিন অতি সুন্দর শহর।

আয়ার্ল্যান্ডে মনুষ্য-বসতির প্রথম যে প্রমাণ নৃতত্ত্ব স্বীকৃত তার বয়স অন্তত আট হাজার বছর। ইয়োরোপের মূল ভূখণ্ড থেকে ক্যানোয় চেপে অথবা ভেলায় চেপে অতদিন আগে কী করে দুঃসাহসিক আদিম মানুষ 'আইরিশ সি' অথবা 'ইংলিশ চ্যানেল' পাড়ি দিয়েছিল সেকথা ভাবলে অবাক হতে হয়। ক্রমে ওখানে গড়ে উঠল কেল্ট এবং পিকট্ উপজাতির এক অর্ধসভ্য মনুষ্যসমাজ। তারা নাকি 'গেলিক' ভাষায় কথা বলত, যার বিবর্তিত রূপ বর্তমান আইরিশ ভাষা। প্রায় দেড়শ খ্রীষ্টাব্দে রাজা 'কন'-এর নাম পাওয়া যায়, কিন্তু তাঁর রাজত্ব বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। পঞ্চম শতাব্দী পর্যন্ত ওরা নানা

দেবদেবীর মূর্তি পূজা করত।

432 খ্রীস্টাব্দে সেন্ট প্যাট্রিক ইংলন্ড থেকে আয়ার্ল্যান্ডে খ্রীস্ট ধর্মপ্রচারে যাত্রা করেন এবং ঐ দ্বীপে যীশু খ্রীস্টকে প্রতিষ্ঠিত করেন। সেন্ট প্যাট্রিক অতি দীর্ঘজীবী — নব্বই বছর বয়সে তিনি ইহলীলা সংবরণ করেন। তাঁর জীবনী পাঠে জানা যায় যে, তিনি নাকি আদিতে আয়ার্ল্যান্ডের কোন ভূস্বামীর ক্রীতদাস ছিলেন। কোনক্রমে পালিয়ে যান ইংলন্ডে। সেখানে গিয়ে খ্রীস্ট ধর্মে দীক্ষা নেন এবং স্বপ্নাদেশ পান আয়ার্ল্যান্ডে প্রত্যাবর্তন করে সেখানে সদ্ধর্ম প্রচারে আত্মনিয়োগ করতে। সেন্ট প্যাট্রিক সেই স্বপ্নাদেশ অনুসারেই আয়ার্ল্যান্ডে ফিরে যান। বলা বাহুল্য তিনি রোমান-ক্যাথলিক ধর্মই প্রতিষ্ঠা করেন।

টিউডর আমল থেকে ইংরেজ রাজারা আয়ার্ল্যান্ডের দখল নিতে শুরু করে এবং প্রোটেস্টান্ট ধর্মের প্রবর্তনে উদ্যোগী হয়। এরপর শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ইংল্যান্ড আর আয়ার্ল্যান্ডের মধ্যে ধর্মযুদ্ধের নামে অধর্ম-দাঙ্গা হয়েছে।

আমাদের পলাশী যুদ্ধের প্রায় পঞ্চাশ বছর পরে উলফ টোনের নেতৃত্বে আইরিশম্যানেরা ব্যাপক বিদ্রোহ করে — হুবহু সিপাহী বিদ্রোহ না হলেও প্রায় ঐ জাতীয়। তবে বিদ্রোহ দমনে ব্রিটিশ রাজশক্তি হুবহু এক রকম নিষ্ঠুরতার নজির দেখিয়েছে। 1800 খ্রীস্টাব্দে এই বিদ্রোহ সম্পূর্ণ দমন করে গোটা আয়ার্ল্যান্ড এল ব্রিটিশ শাসনে। আইরিশদের যে নিজস্ব পার্লামেন্ট ছিল, সেটিকে বেআইনি ঘোষণা করা হল। 1829 খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত আইরিশ ক্যাথলিক-ধর্মীদের ভোটাধিকার স্বীকৃত হয়নি। তারা ছিল দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক।

তারপরেই এল ইতিহাস-কুখ্যাত অতি ভয়ঙ্কর 'পোটাটো ফেমিন' বা 'আলু দুর্ভিক্ষ'। উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি — বস্তুত 1840 সালে দ্বীপের জনসংখ্যা ছিল পঁচাশি লক্ষ। এর আধাআধি গমজাত খাদ্য আহার করত না — খেত আলু, শুধু আলু।

1845 আর 46, পরপর দুবছর পঙ্গপালের আক্রমণে গোটা আয়ার্ল্যান্ড আলু চাষে পুরোপুরি ব্যর্থ হল। এল মন্বন্তর — দুর্ভিক্ষ। আমাদের এই বাংলা দেশে — পূর্ব-পশ্চিম মিলিত বাংলায় তেতাল্লিশের মন্বন্তরে যত লোক মারা গিয়েছিল তার চেয়ে বেশি মারা গেল আয়ার্ল্যান্ডে — তিন বছরের ভিতর। দশ লক্ষ মানুষ অনাহারে প্রাণ দিল আর ষোলো লক্ষ মানুষ চিরদিনের মতো পাড়ি জমালো আমেরিকায়।

আলু দুর্ভিক্ষের পরে আয়ার্ল্যান্ডের মানুষ মরিয়া হয়ে উঠল স্বাধীনতার জন্য। ওদের বক্তব্য, রাজশক্তি যদি সচেতন হত, তাহলে পঙ্গপালদের আক্রমণ থেকে শস্যক্ষেত্রকে রক্ষা করা অসম্ভব ছিল না। সত্যিই তা ছিল না। ব্রিটিশ নরমপন্থী প্রধানমন্ত্রী গ্ল্যাডস্টোন আয়ার্ল্যান্ডের জন্য 'হোম-রুল' প্রবর্তনে প্রয়াসী হলেন ; কিন্তু আইরিশরা তা মেনে নিতে রাজি হল না।

ইতিমধ্যে এসে গেল প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। প্রথম দিকে 1914 থেকে 1916 আইরিশম্যানেরা ইংরেজদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করল। তারপর আবার দেখা দিল অশান্তি। আয়ার্ল্যান্ডবাসীদের বক্তব্য : যুদ্ধের জন্য যে অভাব অনটন, যে কৃচ্ছসাধন, তা ইংল্যান্ড ও আয়ার্ল্যান্ডকে সমান ভাগে ভোগ করতে দেওয়া হচ্ছে না। ইংরেজরা যেন সুয়োরাণীর ছেলে আর আইরিশরা দুয়োরাণীর। 1916 সালের এপ্রিলে হল 'ঈস্টার বিদ্রোহ'। তার নেতৃত্ব দিয়েছিলেন প্যাট্রিক পিয়ার্স আর জেমস কনোলী। কনোলীই ছিলেন বিদ্রোহের প্রধান নেতা। কয়েক সপ্তাহের যুদ্ধে দুপক্ষেই অনেক হতাহত হল — যেমন হয়েছিল ইংরেজদের লেখা ইতিহাসে আমাদের সিপাহী বিদ্রোহে। জেমস কনোলীর ভাগ্যেও ঘটল সেই ঘটনা যা ঘটেছিল তাঁতিয়া তোপীর ললাটে। রাজদ্রোহের অপরাধে ফাঁসি।

বিদ্রোহ দমন করা গেল বটে, কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধান্তে ব্রিটিশ সরকার যখন আয়ার্ল্যান্ডে নির্বাচনে অবতীর্ণ হলেন তখন স্বাধীনতাকামী শিন ফেন (Sinn Fein) পার্টি নিরঙ্কুশভাবে জয়ী হল। শুধু উত্তরের 'আলস্টার' অংশের মানুষ নিজেদের ভাগ্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে যুক্ত করতে চাইল। 'শিন ফেন' কথাটা আইরিশ। তার অর্থ 'শুধু আমরাই' — 'Ourselves Alone'.

ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী লয়েড জর্জ ঐ 'শিন ফেন' দলের নেতা এমান দে ভালেরার (Eaman De Valera) সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়ে আয়ার্ল্যান্ডের স্বাধীনতা স্বীকার করে নিলেন।

সেই 1921 থেকে আয়ার্ল্যান্ড স্বাধীন। দ্বীপের 32টি কাউন্টির মধ্যে 26টি নিয়ে আইরিশ রিপাবলিক। বাকি ছয়টি দ্বীপের উত্তরাংশে — তারা সংযুক্ত ব্রিটিশ সরকারের অন্তর্ভুক্ত।

।। তিন ।।

বাসুদেব আয়ার্ল্যান্ডের স্বাধীনতা-ইতিহাস পড়ে — ডি. ভালেরার বৈপ্লবিক যুদ্ধরীতির কথা পড়ে, আর বার বার মিলিয়ে নেয় তার স্বদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসের সঙ্গে। দাদুর স্মৃতিচারণ পুস্তিকাটি সে সঙ্গে নিয়ে এসেছে। মোটা বাঁধানো খাতায় গোটা গোটা হস্তাক্ষরে দীর্ঘদিন ধরে সুললিত মারাঠি ভাষায় দাদু ঐ গ্রন্থটি রচনা করেছেন — তাঁর পূর্বপুরুষদের কথাই তাতে আছে বেশি করে, নিজের কথা সামান্যই।

প্রথমেই একটি বংশ-লতিকা :

শ্রীহরি চাপেকার (চিঁচওয়াড় : 1840-1899)
= মাতঙ্গিনীবাঈ)

দামোদরহরি	বালকৃষ্ণহরি	বাসুদেবহরি
(চিঁচওয়াড়, পুনে)	(পুনে)	(পুনে)
জীজাবাঈ		
(1869-18.4.89)	(1873-12.5.99)	(1880-8.5.99)

গোপীনাথহরি (পুনে)
(20.8.90-6.4.1930)
|
বিনায়ক দামোদর (পুনে)
(1914-)
|
রাধানাথহরি (গোপাল) (পুনে)
(1944-1970)
|
বাসুদেব চাপেকার
(1969-)

তারপরই দাদুর বিস্তারিত বংশ পরিচয় :

চাপেকার পরিবারের আদি নিবাস পুনে জেলার অন্তর্গত চিঁচওয়াড় গ্রামে। ওই গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন আমার প্রপিতামহ শ্রীহরি চাপেকার 1840 সালে। তাঁর পিতৃদেবের নাম সংগ্রহ করতে পারিনি। শ্রীহরির সহধর্মিনী মাতঙ্গিনীবাঈ ছিলেন রত্নগর্ভা। তাঁর তিনটি সন্তান। তিনটিই পুত্রসন্তান। তিনজনই ভারতমাতার জন্য উৎসর্গীকৃত মহাপ্রাণ — তিন শহিদ : দামোদরহরি, বালকৃষ্ণহরি এবং বাসুদেবহরি। আমার তিন পিতামহ। জ্যেষ্ঠ দামোদরহরি ছিলেন মহাত্মা গান্ধীর চেয়ে কয়েক মাসের বড়। তাঁর জন্ম বৎসর 1869 ; জন্ম ঐ চিঁচওয়াড় গ্রামেই। পিতার বৃত্তিই গ্রহণ করেছিলেন তিনি — ব্রাহ্মণের যা উপজীবিকা হওয়ার কথা — যজন-যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপন। কিন্তু বিধাতার নির্দেশ অন্যরকম —মাত্র বিশ বৎসর বয়সে তিনি ফাঁসির মঞ্চে শহিদ হয়ে যান। তাঁর একমাত্র পুত্র গোপীনাথহরি মাতৃগর্ভে। দামোদরের বিধবা — শিবাজী জননীর অনুকরণে তাঁর নামকরণ করা হয়েছিল, জীজাবাঈ — গোপীনাথকে মানুষ করেন। ঐ গোপীনাথই আমার পিতৃদেব। আমার জন্মসময়ে তাঁর বয়স ছিল চব্বিশ

বৎসর এবং আমার ষোড়শ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে তিনি লোকান্তরিত হন।

আমি আমার নিজের জীবনের ঘটনা লিপিবদ্ধ করতে এই স্মৃতিচারণ পুস্তিকাটি লিখতে বসিনি। আমার মূল উদ্দেশ্য : আমার পিতামহ, তাঁর বন্ধু রানাড়ে এবং দুই অনুজের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করা। আজ স্বাধীন ভারতে তাঁদের নাম কেউ উচ্চারণ করে না। তাঁদের জীবনী কেউ পড়ে না। তাঁদের কথা দেশ ক্রমশ বিস্মৃত হয়ে যাচ্ছে। তাই এই ইতিকথা। এর ঐতিহাসিক তথ্য আমি অনেকটা সংগ্রহ করেছি পিতৃদেবের কাছ থেকে মৌখিকভাবে এবং বেশ কিছুটা অংশ পিতামহীর সঞ্চয় থেকে। পিতামহী জীজাবাঈ ইংরেজি জানতেন না, কিন্তু মারাঠি-হিন্দি দুটি ভাষাই জানতেন। তিনি সমকালীন ইংরেজি পত্রিকায় প্রকাশিত তথ্য কার সাহায্যে সংকলন করেছিলেন জানি না, কিন্তু কালানুক্রমিকভাবে ঐ তিন চাপেকার ভ্রাতৃত্রয়ীর অনেক তথ্য গোপনে সাজিয়ে রেখে গিয়েছিলেন। জীজাবাঈ দীর্ঘজীবী মহিলা। আমার পিতৃদেবের মৃত্যুশোকও তাঁকে পেতে হয়েছিল। বস্তুত আমার পুত্র গোপালের জন্মের পর — ভারত স্বাধীনতা লাভ করার পূর্বেই তিনি প্রয়াত হন। তিনি ছিলেন আমার পিতামহের যোগ্য সহধর্মিনী।

উনিশ শতকের শেষ পর্যায়ে জাতীয় নেতারা — ফিরোজ শাহ মেহতা, গোবিন্দ রানাড়ে প্রভৃতিরা বিশ্বাস করতেন : আবেদন-নিবেদনেই ব্রিটিশ প্রভুর হৃদয় জয় করা যাবে। ওরা ভারতকে 'হোমরুল' দিয়ে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাবে। এই মোহগ্রস্ত নেতৃবৃন্দের ভ্রান্তি সর্বপ্রথম যিনি প্রণিধান করলেন তিনি আমাদের মহারাষ্ট্রের মহান নেতা লোকমান্য বাল গঙ্গাধর তিলক। অনেকে ধারণা করেন, আবেদন-নিবেদন আর স্বায়ত্বশাসনের স্বপ্নভঙ্গ হয়েছিল বঙ্গদেশে — অরবিন্দ আর যতীন্দ্রনাথের প্রচেষ্টায়। কিন্তু বাস্তবে তাঁরা এই হোমাগ্নিশিখাটি বহন করে নিয়ে গিয়েছিলেন মাত্র, মহারাষ্ট্র থেকে। অরবিন্দের 'ভবানীমন্দির' রচনার আগে প্রকাশিত হয়েছিল লোকমান্যের 'কেশরী' পত্রিকা, এই মহারাষ্ট্রেই। সেটাই যে হবার কথা। বিনায়ক ভবানীমায়ের সন্তান, কিন্তু পূজাবিধির ক্রমানুসারে আগে গণেশ বন্দনা সমাপ্ত করে মাতৃপূজার আয়োজন করতে হয়।

কেশরী পত্রিকায় তিলক মহারাজই প্রথম লিখতে শুরু করেন উদ্দীপনাপূর্ণ দেশাত্মবোধক প্রবন্ধ — একেবারে নতুন সুরে "হে আমার স্বদেশবাসী, তোমরা অবহিত হও! আবেদন-নিবেদন নিষ্ফল হতে বাধ্য — আপন পৌরুষে যদি আত্মসম্মান রক্ষা করতে পার তবেই পারবে, নচেৎ নয়।"

তিনিই প্রথম প্রবর্তন করলেন গণপতি পূজা! গজাসুর দলনের প্রতীক ঐ গণপতি। সেই প্রথম পূজায় যে মন্ত্র উচ্চারিত হয়েছিল তাতে তিলক মহারাজ মন্ত্রের একটি শব্দ 'অসুর' পরিহার করে 'যবন' শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন।

তারপরেই লোকমান্য আয়োজন করলেন শিবাজী উৎসবের। যে শিবাজী ভবানীমায়ের কাছে খণ্ডছিন্ন বিচ্ছিন্ন ভারতকে একসূত্রে বেঁধে দেবার প্রতিজ্ঞা করেছিলেন। রায়গড় দুর্গে ছত্রপতি শিবাজীর চিতাভস্ম বুকে নিয়ে যে স্মৃতিমন্দির মহাকালের শেষ স্থূল হস্তাবলেপনের প্রতীক্ষায় প্রহর গণছিল তিলক মহারাজ তার সংস্কার করালেন। কেশরী পত্রিকায় লোকমান্য লিখলেন, "শিবাজী মহারাজ আফ্‌জল খাঁকে অতর্কিত আক্রমণে হত্যা করে কি কোন অন্যায় কাজ করেছিলেন? আমার সুচিন্তিত অভিমত : নিশ্চয় না। নিশীথরাত্রে যদি হঠাৎ টের পাও ঘরে সশস্ত্র তস্কর প্রবেশ করেছে আর অন্ধকারে আত্মরক্ষার হাতিয়ারটা যদি তুমি খুঁজে না পাও তবে তুমি কী করবে? যদি কৌশলে ঘরে শিকল তুলে দিয়ে পরপ্রাণহারী তস্করকে জীবন্তে দগ্ধ কর, তবে আমি তো বলব, বেশ করেছ! এ কাজ করার নৈতিক অধিকার তোমার ছিল, আছে। আমি তো জানি না — সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর ঐ যবন-ম্লেচ্ছদের কোন তাম্রপত্রের অনুশাসনে অনুমতি দিয়ে গেছেন : বৎসগণ! তোমরা ইচ্ছামতো ভারতমাতার শোণিত পান করতে পার! সুতরাং ঐ যবনপ্রণীত পিনালকোডের ধারাগুলিকে গঙ্গাগর্ভে বিসর্জন দিয়ে মাথা তুলে দাঁড়াবার নৈতিক অধিকার তোমার নিশ্চয় আছে। মনে রেখ : কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন! ফলাকাঙ্ক্ষা বর্জিত নিষ্কাম বিদ্রোহে, শত্রুদমনে, মাতৃপূজায় তোমার জন্মগত ক্ষাত্র অধিকার!"

এ ভাষায় কেউ কোন দিন কথা বলেনি। থমকে গেল সারা দেশ।

একদল তরুণ গোপনে এসে সমবেত হল তিলক মহারাজের পদপ্রান্তে। তারা পথের সন্ধান চায়। তারা লোকমান্যের নির্দেশে গুপ্ত সমিতি গঠন করতে আগ্রহী। গড়ে উঠল মহারাষ্ট্রের 'মিত্রমেলা', পরে যা পরিণত হয়েছিল : 'অভিনব ভারত'-এ।

নিতান্ত ঘটনাচক্রে এই সন্ধিক্ষণে মহারাষ্ট্রের ভাগ্যাকাশে উদয় হত যুগল ধূমকেতু। প্রথমটি হচ্ছে মহামারী বুবনিক প্লেগ আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে কলির দুঃশাসন আইরিশ শাসক সাতারা জেলার অ্যাসিস্টান্ট কলেক্টার র‍্যান্ড। মহামারীর আক্রমণে হাজারে হাজারে মানুষ মরতে শুরু করল বোম্বাই আর পুনেতে। প্লেগ দমনের উদ্দেশ্যে সাতারা থেকে র‍্যান্ড-সাহেবকে বদলি করে পাঠিয়ে দেওয়া হল পুনেতে — 'প্লেগ দমন কমিশনার' করে। বাস্তবে র‍্যান্ডের উপর নির্দেশ ছিল — দেখতে হবে, কোনভাবেই যেন ঐ ভয়াবহ প্লেগ রোগ য়ুরোপিয়ানদের মহল্লায় অথবা সেনা ছাউনিতে প্রবেশ করতে না পারে মারাঠারা মরে মরুক — ইঁদুরের সঙ্গী হয়ে! কিন্তু য়ুরোপিয়ান ব্যারাক যেন রোগমুক্ত থাকে।

র‍্যান্ড-সাহেবের মতো কুশাসক ভারতবর্ষে অল্পই এসেছে। লোকটা ছিল নিষ্ঠুরাচরণের মধ্যে যৌনবিকৃতকামী স্যাডিস্ট বা ধর্ষকামী। তার স্বেচ্ছাচারে বজ্রাহত হয়ে গেল মহারাষ্ট্রের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ। প্লেগ দমনের অছিলায় সে অকথ্য অত্যাচার করতে

শুরু করল। তার একটি লক্ষ্য : মহামারী যাতে সাহেবপাড়ায় ছড়িয়ে না পড়ে। দ্বিতীয় লক্ষ্য : তার ধর্ষকাম চরিতার্থ করা! কালা-আদমিরা ধনে-প্রাণে মরলে তার ভ্রূক্ষেপ নেই। র‍্যান্ড-সাহেব নিজে দাঁড়িয়ে থেকে ফিরিঙ্গি সেপাই দিয়ে অমানুষিক অত্যাচার শুরু করল। যে বস্তিতে একটিমাত্র প্লেগ রুগীকে পাওয়া গেছে সেই বস্তির সমস্ত ঘরের চালে — অধিকাংশই খড়ের চালা — একের পর এক মশাল দিয়ে আগুন ধরাতে থাকে ফিরিঙ্গি সেপাইয়ের দল। কোনও পূর্ব ঘোষণা না করে, যাতে গরিব মানুষগুলো তাদের জামা-কাপড় তোষক-বালিশ নিয়ে সরে আসতে পারে। র‍্যান্ড সাহেবের যুক্তি : ঐ জামাকাপড় তোষক-বালিশেই তো লুকিয়ে আছে প্লেগের জীবাণু! আবেদন নিবেদন, শেষে প্রতিবাদ করল দেশের জনসাধারণ। সেটাই চাইছিল ধর্ষকামী র‍্যান্ড। অত্যাচার বৃদ্ধি করার অজুহাত পেল সে। আগুনের লেলিহান শিখার হাত থেকে যারা প্রাণের চেয়েও প্রিয় বাক্স-প্যাঁটরা বাঁচাতে ছুটে গেল, এবার পুলিশ তাদের লাঠিপেটা শুরু করল। আচমকা ঠেলে ফেলে দিত আগুনে।

মহারাষ্ট্রের 'কেশরী' পত্রিকায় সম্পাদকীয় প্রকাশিত হল। অনুরূপ সম্পাদকীয় প্রকাশিত হল কলকাতার অমৃতবাজার পত্রিকায়। শেষ পর্যন্ত সদাশয় সরকার বাহাদুর একটি তদন্ত কমিশন বসাতে স্বীকৃত হলেন। কমিশন তদন্ত করে বলুক : প্লেগ দমনের অজুহাতে কোনও অন্যায় করা হয়েছে কি না সরকারি তরফে।

বিচার-বিভাগের তদন্তকারী ছিলেন সৎ মানুষ। সত্যি কথাই প্রকাশ করলেন তিনি, "The system of discovering plague-cases by house to house visitation is absolutely intolerable to the people who looked upon the plague measures as more horrible than the plague itself." (বাড়ি বাড়ি ঘুরে প্লেগরোগীর অনুসন্ধানের এই প্রক্রিয়াটি আজ সাধারণ মানুষের সহ্যের সীমা অতিক্রম করেছে — তাদের চোখে মহামারীর চেয়ে আরও ভয়ঙ্কর এই মহামারী দূরীকরণের ব্যবস্থাপনা)।

এ রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে বেশ কয়েক দশক পরে। কারণ, বিচারবিভাগীয় তদন্তকারী সৎ হলে কী হবে — প্রশাসন তো তা নয়! কমিশনের এই রিপোর্টখানি সযত্নে লালফিতার উদ্বন্ধনে কোন ফাইলের ফাঁসির মঞ্চে প্রাণ দিল তা কেউ জানতেই পারল না।

[এমনটা কিন্তু যুগে যুগে হয়েছে ও হচ্ছে। সর্দার সরোবার ড্যামে নর্মদা নদকে শৃঙ্খলিত করলে দেশবাসীর কতখানি ক্ষতি হবে এ সম্বন্ধে প্যাটেল কমিশনের অনুসন্ধান রিপোর্ট 'জাতীয় নিরাপত্তা আইন'-এর অজুহাতে লোকচক্ষুর অন্তরালে লুকিয়ে ফেলেছিলেন গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী — যা নাকি মেধা পটকরের অনশন সংগ্রামে পরে প্রকাশ করতে বাধ্য হয়েছিলেন তিনি। এবং বানতলায় কে, কেন, কী উদ্দেশ্যে অনিতা দাওয়ানকে পুড়িয়ে মেরেছিল এ সম্বন্ধে দত্ত কমিশনের রিপোর্টখানি আজ আড়াই বছর

ধরে লোকচক্ষুর আড়ালে লালবাজারের কোন একটি আলমারিতে লালফিতায় সযত্নে সুরক্ষিত। অনিতা দাওয়ানের স্বামী সম্প্রতি লোকান্তরিত হলেন। তিনি জেনে যেতে পারলেন না — কেন তাঁর ধর্মপত্নী অফিসিয়াল ট্যুর সেরে ফেরার পথে আক্রান্ত হলেন বানতলার হাটে। কেন তাঁকে বিবস্ত্র করে পুড়িয়ে মারা হল! কেন অপরাধীদের নাম বা উদ্দেশ্যের কথা প্রকাশ করা যাবে না। কেন : এমনটা তো হয়েই থাকে!]

ব্রিটিশ সরকার র‍্যান্ড-সাহেবকে কোন তিরস্কার তো করলেই না। সতর্ক, এমনকি অনুরোধ পর্যন্ত করলেন না, যাতে সে সংযত হয়। বরং কমিশন বসানোতে প্রতিশোধ স্পৃহায় জ্বলে উঠল র‍্যান্ড। নিগারগুলো ভেবেছে কী? কমিশন বসিয়ে বে-ইজ্জত করবে তাকে! তার ধমনীতে খাঁটি নর্ডিক রক্ত — খাস জার্মান। তিনপুরুষে আয়ার্ল্যান্ডের বাসিন্দা। ওর আদিম কৌলিক উপাধি র‍্যান্ডলফ। ওর ঠাকুর্দা ছিল ব্যাভেরিয়ার ব্যারন। প্রকাণ্ড কাসল্-এ রাজার হালে থাকত সে। ইচ্ছামতো সে কোন বিদ্রোহী প্রজার ঘরে আগুন দিত। হাটে-বাজারে কোনও যৌবনবতী সুন্দরী মেয়ে দেখলে পাইক পাঠিয়ে ধরে নিয়ে আসত। দু'চার রাত কাস্‌ল্ বাস করতে বাধ্য ছিল তারা — তা হোক না কেন কারও মেয়ে-বউ-বোন বা মা! দু'চার রাত আদরযত্ন করে আবার ফেরত পাঠিয়ে দিত প্রজার বাড়ি। কখনও বা সুদ সমেত। পেট কোঁচড়ে সুদ নিয়ে ফিরে যেত নতমুখী সদ্যগর্ভিনী মেয়েটি। কখনও সহ্য করত, কখনও উদ্বন্ধনে বিদায় নিত। কিন্তু কোনদিন কোন 'সুস্বুদ্ধির পো' প্রতিবাদ করার হিম্মৎ দেখাতে পেরেছিল? তবু তারা তো ছিল খ্রীস্টান — এরা হীদেন!

র‍্যান্ড তার অত্যাচারের মাত্রা বাড়িয়ে দিল এবার। পৈশাচিক পরিকল্পনায়। আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে সে সংযত হয়েছে। হুকুম দিল : এরপর সন্দেহের বশবর্তী হয়ে প্লেগ রোগীর প্রতিবেশীর ঘরে আগুন দেওয়া হবে না। রোগাক্রান্তের যাবতীয় প্রতিবেশীকে এক জায়গায় জড়ো করা হবে। প্রতিটি বস্তি-বাসিন্দাকে ডাক্তারের দল পরীক্ষা করে দেখবেন, সে রোগাক্রান্ত কি না। রোগ লক্ষণ না দেখা গেলে তাকে ছেড়ে দেওয়া হবে। রোগাক্রান্ত হলে অগ্নিসংযোগ অপরিহার্য!

নরমপন্থীরা বললেন, দেখলে? তোমরা বল, আবেদন-নিবেদনে কাজ হয় না! আরে বাবা, সাহেবরাও তো মানুষ।

বাস্তবে এ আদেশ র‍্যান্ড-সাহেবের এক পৈশাচিক পরিকল্পনা। আপাত-দৃষ্টিতে ঐ আদেশনামা যুক্তিপূর্ণ হলেও কার্যক্ষেত্রে তার প্রয়োগবিধির ভিতরে দেখা গেল বিকৃতকামীর এক ন্যক্কারজনক মনোবিকার। কোন বস্তিতে প্লেগ রোগীর সন্ধান পেলেই রাইফেলে বেয়নেট চড়িয়ে গোটা মহল্লাটা ঘিরে ফেলে ফিরিঙ্গি পুলিশ। নরনারী নির্বিশেষে এলাকার প্রতিটি মানুষকে জড়ো করা হয় একটি উন্মুক্ত স্থানে। পুরুষ-স্ত্রী

নির্বিশেষে প্রতিটি বাসিন্দাকে সম্পূর্ণ উলঙ্গ করে। তারপর চলে ডাক্তারদের পরীক্ষাকার্য। কারও দেহে কোন গ্রন্থী স্ফীত হয়েছে কি না। প্লেগ রোগের আক্রমণে যেমনটা হয়। একদিকে যখন এই পরীক্ষাকার্য চলছে অন্যদিকে তখন আর একদল সেপাই আগুন লাগিয়ে দেয় ফাঁকা খড়ো চালে। দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে সমস্ত মহল্লা। বিবস্ত্র নরনারী ছুটে যায় লেলিহান অগ্নিশিখার কবল থেকে শেষ সম্বলটুকু উদ্ধার করে আনতে! সে এক দারুন মজাদার সার্কাস! পৈশাচিক উল্লাসে হাসতে হাসতে লুটিয়ে পড়ে ফিরিঙ্গি সেপাই।

আমি জানি, শতাব্দীর ওপারের এই ঘটনাটি পাঠক-পাঠিকা বিশ্বাস করবেন না। কিন্তু একথা সত্য, আদ্যন্ত সত্য এবং সত্য বই মিথ্যা নয়। আমার সংগ্রহে রয়েছে মহারাষ্ট্র থেকে প্রকাশিত 'মিত্র' দৈনিক পত্রিকার 11.3.1897 তারিখের কাটিং — এটি সংগ্রহ করে তাঁর মঞ্জুষায় রেখে গিয়েছিলেন আমার ঠাকুমা — দামোদরহরি চাপেকারের বিধবা জীজাবাঈ চাপেকার। তিনি ইংরেজি জানতেন না — নিশ্চয় ইংরেজি জানা দাদুর কোনও অনুজপ্রতিম বিপ্লবী সহকর্মী এটি জোগাড় করে এনে তাঁকে রাখতে দিয়েছিল। আপনাদের অবিশ্বাস্য মনে হলে বোম্বাই-এর জাতীয় গ্রন্থাগারে গিয়ে অনুসন্ধান করে দেখতে পারেন। একটা কথা মনে রাখবেন, 'মিত্র' সম্পাদকের ঘাড়ে দুটো মাথা ছিল না যে, মিথ্যা কথা ছাপার অক্ষরে প্রকাশ করবেন, সেই 1897 সালে :

The men are completly stripped in presence of others and made to wait in that position for some time, while the women were asked to undo their cholies (bodices) and to hold up their wearing apparel (petticoats) in presence of others.

(পুরুষদের সর্বসমক্ষে সম্পূর্ণ উলঙ্গ করে সার দিয়ে দাঁড় করানো হত। ঐ অবস্থায় তাদের অপেক্ষা করতে বলা হত আর তাদের সামনেই সমবেত যাবতীয় স্ত্রীলোকদের আদেশ দেওয়া হত বক্ষবন্ধনী উন্মোচন করে সরিয়ে নিতে, তারপর অধোবাস (পেটিকোট বা শায়া) ভিড়ের মধ্যে সবার সামনে উঁচু করে তুলে ধরতে!)

পুনে নগরবাসীর একটি গণ্যমান্য ডেপুটেশন এসে সাক্ষাৎ করলেন র‍্যান্ড-সাহেবের সঙ্গে। উকিল, ডাক্তার, শিক্ষক, বড় ব্যবসায়ী ইত্যাদি। তারিখটা ইতিহাসে লিপিবদ্ধ : বারই এপ্রিল 1897 ; তার পূর্বেই লোকমান্যের উদ্যোগে গণপতি পূজা আর শিবাজী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে। তখনও মুসলমান জনসাধারণ মহারাষ্ট্রে এই আন্দোলনে শামিল হয়নি। তবু দু'চারজন গণ্যমান্য মুসলমান নেতাও উপস্থিত ছিলেন গণ-ডেপুটেশনে। ডেপুটেশনের মুখপাত্র পুনে বার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি একজন প্রবীণ উকিল। র‍্যান্ড-সাহেব বললে, দেখুন বাবু, মুসলমান পর্দানসীন মহিলাদের ক্ষেত্রে আমি জনান্তিক পরীক্ষার নির্দেশ দিতে রাজি আছি। কিন্তু হিন্দু নারীরা তো পর্দানসীন

নন। তাঁরা তো প্রকাশ্য রাজপথে হামেহাল ঘোরাফেরা করেন!

ডেপুটেশনের দলপতি বলেন, আপনি কোন হিন্দু রমণীকে উন্মুক্ত বক্ষ অবস্থায় প্রকাশ্য রাস্তায় চলাফেরা করতে দেখেছেন? এবং যৌনাঙ্গ প্রদর্শনের জন্য পেটিকোট উঁচু করে তুলে ধরতে?

র‍্যান্ড বললে, লুক হিয়ার ভকিলবাবু, এটা আদালত নয়। আপনি আমাকে এখন জেরা করছেন না। আপনাদের যা বলার ছিল বলেছেন, আমার যা বলার ছিল বলেছি। ব্যস্। এবার আসুন আপনারা।

ঐ বারই এপ্রিলের পর থেকে দেখা গেল ডাক্তারদের ধারণা হয়েছে প্লেগ রোগ মুসলমানদের হয় না, হয় শুধু হিন্দুদের। পুরুষদের নয়, নারীর। আরও আশ্চর্যের কথা সিপাহি-ডাক্তারদের ধারণা : পনের-ষোলো বছর বয়স থেকে পঁয়ত্রিশ-চল্লিশ বৎসরের নারীদেহেই প্লেগের আক্রমণের সম্ভাবনা। শিশু বা বৃদ্ধাদের পরীক্ষা পণ্ডশ্রম। অন্তত অনুসন্ধানকারীদের পরীক্ষা কার্য থেকে এমন একটি বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তে আসা গেছে।

র‍্যান্ড-সাহেব অবশ্য হিন্দু নারীর ক্ষেত্রেও শেষ পর্যন্ত জনান্তিক পরীক্ষার আয়োজনে রাজি হলেন। মহিলাদের এক এক করে তাঁবুর ভিতর যেতে হত। চার-পাঁচজন তরুণ ডাক্তার অথবা সেপাই সেখানে একে একে মেয়েদের পরীক্ষা করতেন। তাদের বক্ষাবাস ও কঞ্চুলিকা খুলে ফেলতে হত। এবং দু'হাতে পেটিকোট উঁচু করে তুলে দাঁড়িয়ে থাকতে হত। শারীর বিদ্যায় কোথায় লেখা আছে জানি না — ডাক্তারদের ধারণা প্লেগ রোগের লক্ষণ যে গ্রন্থীস্ফীতিতে পরিলক্ষিত হয় তার অবস্থান বাহুমূলে, বক্ষোরুহে এবং জানুদ্বয়ের সন্ধিস্থলে। দুই আঙুলের চাপ দিয়ে গ্রন্থীস্ফীতি হয়েছে কি না বুঝে নিতে কখনও কখনও বেশ দেরি হত। বিশেষ, রোগিণী যৌবনবতী হলে!

অনেক বিবাহিতা মহিলা তাঁবু থেকে বার হয়ে এসে তাঁদের স্বামীদের বলেছেন, এর চেয়ে সর্বসমক্ষে পরীক্ষাই ভাল ছিল!

জননী-জায়া-ভগ্নী বনিতার অপরিসীম লাঞ্ছনায় আগুন ধরে গেল মহারাষ্ট্র তারুণ্যের ধমনীতে! নিরুদ্ধ আক্রোশে ফুঁসছে সারা দেশ। প্রতিকার চাই! তার চেয়ে বড় কথা : প্রতিশোধ চাই! গজাসুরের রক্তে স্নান না করলে গণপতির তৃপ্তি হবে না!

লোকমান্য বাল গঙ্গাধর তিলকের লেখনী গর্জে উঠল সেই ক্রান্তিকারী মুহূর্তে। বারুদের স্তূপে অগ্নিসংযোগ করল। মহাপণ্ডিতের কলম থেকে নির্গত হল এক অন্তিম আর্তনাদ :

তোমরা দেখ। দুঃশাসন আজ মাতা-দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ করে পৈশাচিক উল্লাসে হাসছে। দর্পহারী মধুসূদন! কোথায় তুমি? তোমার সুদর্শনচক্র নেমে আসার সময় কি আজও হয়নি, চক্রপানি?

আপনাদের মনে হবে এ বৃদ্ধ বানিয়ে গপ্পো শোনাচ্ছে! কিন্তু বিশ্বাস করুন ঐ দুঃশাসনের রক্তপান করতে যে তিন সহোদর ভ্রাতা অগ্রসর হয়ে এলেন, তাঁরা তিনজনই সুদর্শন। তাঁরা সত্যিই দর্পহারী মধুসূদনের অবতাররূপ! তাঁদের তিনজনের পিতৃদত্ত নামই — স্বয়ং শ্রীহরি চাপেকারের প্রদত্ত নামই — খুঁজে পাবেন শ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তর শতনামে। তাঁরা তিনজন আমার বড়দাদু, মেজদাদু আর ছোড়দাদু : দামোদরহরি, বালকৃষ্ণহরি আর বাসুদেবহরি চাপেকার। স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে প্রথম শহিদত্রয়।

।। চার ।।

সাইকেল-স্ট্যান্ডে দ্বিচক্রযানকে তালাবন্ধ করে রেখে বাসুদেব ডাবলিন জেনারেল লাইব্রেরির মর্মর সোপান বেয়ে উঠে এল উপরে। প্রবেশপথে সেন্ট প্যাট্রিকের একটি শ্বেত প্রস্তরের মর্মরমূর্তি। সেটা অতিক্রম করে প্রকাণ্ড 'হল-কামরা'। ডাইনে ওভারকোট, ছাতা, হাতব্যাগ ইত্যাদি গচ্ছিত রাখার পায়রা-খোপ কাউন্টার, বাঁয়ে গ্রন্থাগারিক ডক্টর মিস্ বেট্‌সির কামরা। 'হলের' দিকে সবটাই প্লেট গ্লাসের, যাতে গ্রন্থাগারিক নিজের আসনে বসেই প্রতিটি পাঠরতকে নজরে রাখতে পারেন।

বাসুদেব দূরতম পিলারের পাশে, জানলার ধারে একবার তাকিয়ে দেখল। তারপর সমস্ত গ্রন্থাগারের উপর নজর বুলিয়ে নিল। না। যাকে খুঁজছে তাকে দেখা গেল না। অগত্যা ডক্টর বেট্‌সির প্রবেশদ্বারের সম্মুখে দাঁড়িয়ে বললে, আসতে পারি?

— ইয়েস, কাম ইন প্লিজ।

বাসুদেব ঘরে ঢুকে বললে, গুড ইভনিং ডক্টর বেট্‌সি।

বৃদ্ধা মহিলা খুব হাসিখুশি। নিয়মিত যারা লাইব্রেরিতে পড়তে আসে তাদের প্রায় প্রত্যেককেই ভালভাবে চেনেন। হাসি-মশকরা করেন এবং সাধ্যমতো সাহায্য করেন। ফট্টি-নট্টি লেগেই আছে!

মিস্ বেট্‌সি আইরিশ উচ্চারণে ইংরেজিতে যা বললেন তা বঙ্গানুবাদে, সন্ধ্যাটা আমার পক্ষে নিঃসন্দেহে শুভ। কিন্তু তোমার পক্ষে আধাআধি।

— আধাআধি। মানে?

— কিছুটা গুড, কিছুটা ব্যাড!

— তারই বা মানেটা কী হল?

— মানে তোমার ডিমান্ড দেওয়া ডাক্তারী বইটা লন্ডন থেকে এসেছে, আমি 'রিসার্ভ' করে রেখেছি, কিন্তু ডিমান্ড অনুযায়ী তোমার বান্ধবী আজ আসেনি।

— বান্ধবী! কে বান্ধবী?

— তবে হয় তো আমারই বোঝার ভুল। ঐ উত্তর দিকের দেওয়ালে ডি-ভালেরার পোট্রেটের নিচে সচরাচর যে মেয়েটি বসে। আমি ভেবেছিলাম সে তোমার গ্যর্লফেন্ড্র। এখন দেখছি, আমার ধারণাটা ভুল। সরি! ডক্টর চাপেকার!

— কী নাম বল তো মেয়েটির? — বাসুদেব বলে, ওঁর ভিজিটার্স চেয়ারে জুৎ করে বসতে বসতে।

বৃদ্ধা ধমকে ওঠেন, লুক হিয়ার চাপেকার। হয় সে তোমার গ্যর্লফ্রেন্ড, সেক্ষেত্রে তুমি তার নাম জানো। নয় সে তোমার গ্যর্লফ্রেন্ড নয়, সেক্ষেত্রে তোমার প্রশ্নটা অহেতুক। যাক বইটা নেবে তো?

বাসুদেব ঝুঁকে পড়ে বললে, বিলিভ মি ডক্টর বেট্‌সি। ও আমার বান্ধবী। ওকে আমি ... আমি ... ইয়েস, ভীষণ পছন্দ করি ; কিন্তু ওর নামটা আমি জানি না।

বৃদ্ধা চোখ থেকে চশমাটা খুলে ভাল করে মুছে আবার নাকের ডগায় বসালেন। বললেন, আমি কিন্তু দু'তিনমাস ধরে তোমাদের বন্ধুত্বটা লক্ষ্য করেছি। বাগানের বেঞ্চে বসে গল্প করতে দেখেছি, ক্যান্টিনে ...

— সব সত্যি! কিন্তু একথাও সত্যি যে, আমি ওর পুরো নামটা আজও জানি না। ও কোন্ দেশের মেয়ে তাও জানি না!

ডক্টর বেট্‌সি নিঃশব্দে ওর দিকে দশ সেকেন্ড তাকিয়ে কী যেন বুঝে নেবার চেষ্টা করলেন। তারপর বললেন, ও কী করে তা জান? চাকরি? না সেলস্ গ্যর্ল?

— না, ও ছাত্রী। আমাদের য়ুনিভার্সিটিতেই। সেকেন্ড ইয়ার। পাস করে বের হতে ওর আরও দু'বছর বাকি। কিন্তু কী পড়ছে তা বলেনি। এমন কি আর্টস না সায়েন্স তাও নয়।

— ও ভারতীয় মেয়ে কি না তাও জান না তুমি?

— ভারতীয়ই মনে হয়, তবে সেটাও আমার আন্দাজ। সিংহলী বা ইন্দোনেশিয়ানও হতে পারে। ও আমাকে বলেনি।

ডক্টর বেট্‌সি চুপ করে বসে রইলেন। বাসুদেব তাগাদা দেয়, তুমি নিশ্চয়ই জান। তাই না?

বৃদ্ধা প্রশ্নটা এড়িয়ে গেলেন। বললেন, দেখ চাপেকার, এ প্রশ্নটা জিজ্ঞাসা করা তোমার উচিত হচ্ছে না। মেয়েটি যদি তোমাকে তার পরিচয় না দিয়ে থাকে তবে নিশ্চয় তার সঙ্গত কারণ আছে। আমি তার ইচ্ছায় বাধা দিতে পারি না।

— সঙ্গত কারণ? কী হতে পারে তা?

— সেকথা আমি কেমন করে জানব? হয়তো ও কারও বাকদত্তা, অথবা বিবাহিতা — তোমার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে নিজেকে জড়াতে চায় না। বিদেশে ওপর-ওপর বন্ধুত্বটুকুই সে চায়। হয়তো ছেড়ে-আসা দেশের একটা স্বাদ। তোমরা কি ইংরেজিতে কথা বল, না ভারতীয় কোন ভাষায়?

— হিন্দিতে। হিন্দি ভাষাটা ও জানে। তবে উর্দু-ঘেঁষা হিন্দি।

বেট্‌সি বলেন, মেয়েটির কথা ঐ পর্যন্তই। সে আজ কোন কারণে আসেনি, দেখতেই পাচ্ছ। বইটা কি রিডিং রুমের জন্য নেবে না হস্টেলে নিয়ে যেতে চাও?

— নিয়ে যেতে হলে তো ডিপজিট লাগবে। সেটা কত?

ড্রয়ার থেকে বইটা বার করে ওর হাতে দিয়ে বলেন, পাঁচ পাউন্ড।

— তবে রিডিং রুমের স্লিপই ভরে দিই। পাঁচ পাউন্ড জমা রাখার মতো পুঁজি এখন হাতে নেই।

মিস বেট্‌সি বলেন, আমি তাই আশঙ্কা করেছিলাম। তাই বইটা নিজের নামে ইশ্যু করিয়ে রেখেছি। তুমি ওটা নিয়ে যাও — সাতদিন পরে ফেরত দিও। একটা গেট পাসও করে রেখেছি। এটাও নিয়ে যাও।

বাসুদেব কী একটা কথা বলতে যাচ্ছিল। বৃদ্ধা ধমক দিয়ে থামিয়ে দেন : শট-আপ! ওসব ফর্মাল ধন্যবাদ আমার একদম বরদাস্ত হয় না। তোমাদের সাহায্য করতেই তো আমি আছি এখানে। ... ইয়েস কাম ইন প্লিজ।

শেষ কথাটা অন্য একজন দর্শনার্থীর প্রতি। বাসুদেব ঘাড় ঘুড়িয়ে তাকে দেখল। একটি আইরিশ ছাত্রী। ও উঠে দাঁড়ালো। নিঃশব্দে বার হয়ে এল লাইব্রেরি থেকে, ডক্টর বেট্‌সিকে কোন ধন্যবাদ না জানিয়েই।

মিস বেট্‌সিকে মিছে কথা বলেনি বাসুদেব। মেয়েটির সঙ্গে আলাপ মাত্র মাস তিনেকের — এই লাইব্রেরিতেই। তারপর অনেক অনেকগুলি সন্ধ্যা ওরা দু'জনে একসঙ্গে কাটিয়েছে। কিন্তু মেয়েটি তার পূর্ণ পরিচয় দেয়নি।

মনে পড়ছে প্রথম দিনের কথা। তখন সন্ধ্যা হয়ে আসছে। লাইব্রেরি ঘরে প্রতিটি পড়ুয়ার জন্যই আছে একটি করে টেবল ল্যাম্প, যাতে একের আলোয় অপরের অসুবিধা না হয়। বাসুদেব তার আলোটা জ্বেলে কী একটা ডাক্তারি বই পড়ছে! হঠাৎ জানলার দিকে তাকাতে গিয়ে নজর পড়ল মেয়েটির দিকে। জানলা দিয়ে পশ্চিমের পড়ন্ত রৌদ্র এসে পড়েছে ওর টেবিলে, তাই মেয়েটি এখনও ওর মেজ বাতিটা জ্বালেনি। শুধু সে কারণেই নয়। মেয়েটি কোলের ওপর খোলা বই রেখে ওর দিকেই তাকিয়ে এতক্ষণ বসেছিল নিশ্চুপ। বাসুদেব চমকে ওঠে। সে চমক তৎক্ষণাৎ সংক্রামিত হয় মেয়েটির

উপর। সে ঘাড় গুঁজে বই পড়তে থাকে।

মেয়েটি আইরিশ তো নয়ই — ইতালি বা স্পেনের মেয়েদের মতো অলিভ-রক্তিমবর্ণাও নয়। ও বিষুবাঞ্চলের বিদেশিনী। এমন শ্যামলা রঙের ফুল ভারত, বাংলাদেশ, সিংহল বা ইন্দোনেশিয়াতেই প্রস্ফুটিত হয়। ভ্রূদুটি জোড়া ঘন এবং কুচকুচে কালো, মাথার চুলও বায়সকৃষ্ণ, যা য়ুরোপখণ্ডে দুষ্প্রাপ্য। নিজের অজ্ঞাতসারেই বাসুদেব দাঁড়িয়ে উঠেছিল। শব্দ হয়নি নিশ্চয়, তবু কোন অতনু-আশীর্বাদধন্য ঈথার তরঙ্গে মেয়েটি টের পেল। জোড়া ভ্রূর নিচে অতলান্ত সমুদ্রের গভীরতা মাখা দুটি চোখ মেলে ওর দিকে তাকালো।

অন্যান্য পড়ুয়া নিজ নিজ গ্রন্থে আত্মমগ্ন। বাসুদেব মেয়েটিকে অতিক্রম করে চলে গেল পশ্চিম দিকের জানলার ধারে। দিনের মতো বিদায় নিচ্ছেন সূর্যদেব। তাঁর বিদায় রক্তরাগ ছড়িয়ে পড়েছে প্রকৃতিতে — মেঘের গায়ে, বড় বড় এল্‌ম্‌, বার্চ, ওকের মগডালে। বাসুদেব কিছুক্ষণ নিষ্পন্দ দাঁড়িয়ে রইল সেই অস্তসূর্যউদ্ভাসিত উদ্যানের দিকে তাকিয়ে। তারপর হঠাৎ এদিকে ফিরতেই লক্ষ্য হল শ্যামলা মেয়েটি পড়ছে না, একদৃষ্টে ওকেই দেখছে। চোখাচোখি হতেই সে দৃষ্টি সরিয়ে নিতে গেল। বাসুদেব তার আগেই হিন্দিতে বলল, কটা বাজে বলুন তো? আমার ঘড়িটা বন্ধ হয়ে গেছে।

মেয়েটি চমকে যেন ওকে এই প্রথম দেখল। বাসুদেবের তর্জনি তার হাতঘড়ির উপর থাকায় যেন আন্দাজে বললে, ওয়ান্ট টু নো দ' টাইম?

বাসুদেব প্রতিপ্রশ্ন করে, ক্যা আপ্‌ হিন্দি সমঝতি নেহী?

মেয়েটি নিঃশব্দে পাঠাগারের ভিতর দেওয়ালে টাঙানো ইলেকট্রনিক ওয়াল ক্লকটা দেখিয়ে দিল : নির্ভুল জি. এম. টি.।

বাসুদেব ইতিউতি তাকিয়ে দেখে। না, কেউ ওদের নজর করছে না। নিম্নস্বরে ইংরেজিতে প্রশ্ন করে, এই চেয়ারটায় একটু বসতে পারি?

অনুমতি দেওয়ার আগেই জমিয়ে বসে। বলে, আপনি আমার কথাটা বুঝতে পারেননি?

— না। সিলোনিজ ভাষা জানি না আমি।

— ওটা সিলোনিজ নয়। হিন্দি। হিন্দুস্থানী। আপনি কোন দেশের মেয়ে?

মেয়েটি তার নোট বইয়ের পাতায় কী যেন লিখে খাতাটা ওর দিকে বাড়িয়ে ধরল। বাসুদেব দেখল, তাতে লেখা আছে, "পাঠাগারের ভিতর কথা বলা বারণ।" বাসুদেব তার তলায় লিখে দিল : "সংলগ্ন ক্যান্টিনে সে কানুন নেই। আমি এক পেয়ালা কফি পান করতে ইচ্ছুক। সঙ্গ দেবেন কি?"

মেয়েটি হাসল। তার গালে টোল পড়ল। বাসুদেবের প্রশ্নের তলায় শুধু লিখে দিল

: থ্যাংকস্।

ক্যান্টিনে কফির অর্ডার দিতে হয় না। স্লট-মেশিনে মুদ্রা ফেলতেই বেরিয়ে এল পর পর দুটি পেপার-কাপ কফি। ওরা দুজনে গিয়ে বসল বাগানে। একটা খালি বেঞ্চি দেখে। বাসুদেব যথারীতি ভদ্রতাসূচক প্রশ্নটা করেছিল — যদিও মাসের শেষ — 'প্যাস্ট্রি, স্যান্ডউইচ বা কুকি কিছু নেবে?' মেয়েটি — সেও বোঝে মাসটা শেষ সপ্তাহে ধুঁকছে, তাকেও ফরেন কারেন্সি বাঁচিয়ে প্রতিটি পদক্ষেপ করতে হয় — জবাবে বলেছিল : না। এখানে ক্যালরি হিসাব করে খেতে হয়। না হলে ফিগার ঠিক থাকে না!

— তাই বুঝি? তা সযত্নে রক্ষা করার মতোই ফিগার তোমার। গর্ব করার অধিকার তোমার আছে।

— সে কথা হচ্ছে না। কথা হচ্ছে, অহেতুক মোটা হয়ে যাওয়া কোনও কাজের কথা নয়।

— বটেই তো! তা তুমি কোন দেশ থেকে এসেছ তা বললে না তো? হিন্দি তো বোঝ না, তোমার মাতৃভাষা কী?

— সেটা যাই হোক তোমার অগম্য, ডক্টর চাপেকার!

— চাপেকার! মাই গড। তুমি আমাকে চেন?

— কলেজে এমন কোন এশিয়ান মেয়ে আছে যে তোমাকে চেনে না? ফাইনাল ইয়ার এম. ডি-র ফার্স্ট বয়, ডিবেটিঙে ফার্স্ট হয়েছিলে তুমি!

— তুমি ট্রিনিটি কলেজেই পড় তা হলে?

— না। ম্যাসাচুসেটস-এ। রোজ সকালে অ্যাটলান্টিক পাড়ি দিয়ে তোমাদের লাইব্রেরিতে পড়তে আসি।

— কী সাবজেক্ট? কোন ইয়ার?

— আমার সম্বন্ধে এত কৌতূহল কেন?

— তবে আর কার সম্বন্ধে হবে? তুমিই তো আমার পরিচিত একমাত্র এশিয়ান। বল না প্লিজ, কোন দেশের।

— পাকিস্তান।

— ইম্পসিবল! হতেই পারে না?

— কেন? যেহেতু তাদের সঙ্গে কাশ্মীর নিয়ে তোমাদের লড়াই কাজিয়াটা 'হান্ড্রেড ইয়ার্স ওয়র'-এর ওয়ার্ল্ড রেকর্ড ব্রেক করতে চলেছে।

— তা নয়। পাকিস্তানী মেয়ে হিন্দিকে সিলোনিজ ভাষা বলে ভুল করবে না। পাকিস্তানে যে উর্দু প্রচলিত তার শতকরা পঞ্চাশটা শব্দ হিন্দুস্থানী।

— আই সি। আমার জানা ছিল না। হিন্দি-উর্দু দুটোই আমার কাছে গ্রীক।

— তুমি তো আমার নাম জান। তোমার নামটা বলবে?

— নাম তো ডাকবার জন্য ; তুমি আমাকে বরং 'ইউরিডিস্' বলে ডেকো।

— 'ইউরিডিস্'? কোন্ দেশী নাম? ওটা তোমার নাম?

— না। ওটা প্রাচীন গ্রীক দেশের এক হতভাগিনীর নাম। ওটা আমার নাম নয়। তবে একটা কিছু নামে ডাকতে হবে তো। আমার সত্যিকারের নিজের নামটা জানানোতে যখন কিছু বাধা আছে তখন ঐ নামটাই নিলাম।

— বাধাটা কিসের? আর অমন একটা অদ্ভুত নামই বা সেক্ষেত্রে নিলে কেন?

মেয়েটি জিজ্ঞেস করল, তুমি 'ইউরিডিস্'-এর উপাখ্যান জান না বোধহয়। আমার সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় একটা ক্লাস আছে। আমি উঠছি। তুমি লাইব্রেরিতে ফিরে গিয়ে বিশ্বকোষে 'ইউরিডিস্' এন্ট্রিটা বরং দেখে রেখ। না পেলে 'অরফিউস'। তাহলে তোমার সবকটা প্রশ্নের জবাব পেয়ে যাবে — আমার নাম কি, আমি কোন দেশের মেয়ে, কেন আমি আত্মপরিচয় দিতে পারছি না। কেমন? আজ চলি।

মেয়েটি চলে গিয়েছিল তারপর।

বাসুদেব বিশ্বকোষ খুলে অরফিউস আর ইউরিডিস-এর কাহিনী বার করে পড়েছিল :

অরফিউস রাজপুত্র। সঙ্গীত পাগল। স্বভাব কবি। কবির স্ত্রী ইউরিডিস ভাগ্যক্রমে সর্পাঘাতে নিহত হল। আয়ার্ল্যান্ডে সাপ নেই, কিন্তু গ্রীসে ছিল এবং আছে। ইউরিডিসের আত্মাকে যমরাজের দূত মৃত্যুপুরীতে নিয়ে গেল। অরফিউস অরণ্যপর্বতে বীণা বাজিয়ে কেঁদে কেঁদে বিরহের গান গেয়ে ফেরে। অরণ্যের পশুপাখিরা মোহিত হয়ে ছুটে আসে, ওকে ঘিরে ধরে গান শোনে। আসে না শুধু একজন — যাকে ও খুঁজে বেড়াচ্ছে। অবশেষে স্বয়ং মৃত্যুরাজ্যের অধীশ্বর একদিন সশরীরে উপস্থিত হলেন ওঁর গানের আসরে। বললেন, কবির এ বিরহ-গাথা আর কেউ সইতে পারছে না। পরমেশ্বরের অনুমতি পাওয়া গেছে — তুমি তোমার প্রেমাস্পদাকে মর্ত্যলোকে সশরীরে ফিরিয়ে আনতে পার। কিন্তু একটি শর্ত আছে। পাতাল রাজ্য থেকে পৃথিবীর পথে ফেরার সময় তুমি চোখ তুলে চাইবে না — তোমার প্রেমাস্পদার প্রতি দৃকপাত করবে না। তুমি রাজি?

অরফিউস তো এককথায় রাজি। এ আর শক্ত কথা কী? কিন্তু হায়রে মানুষের কৌতূহল! অরফিউস তার প্রতিশ্রুতি রাখতে পারেনি। দীর্ঘদিনের প্রিয়া-বিরহের আকূতিতে যে ক্ষণিক অন্যমনস্কতায় বিস্মৃত হল তার প্রতিশ্রুতির কথা।

মৃত্যুরাজ্য থেকে অরফিউসের পিছন পিছন এতক্ষণ আসছিল ইউরিডিস। হঠাৎ অরফিউসের মনে সন্দেহ জাগল : কই! পিছনে আর তো কোন পদশব্দ শোনা যাচ্ছে না! দুরন্ত উৎকণ্ঠায় সে পিছন ফিরে তাকালো। আর তখনই ঘটল চরম সর্বনাশ।

পাতালরাজ্যের অমোঘ আকর্ষণে তিল তিল করে ইউরিডিস তলিয়ে গেল মৃত্যুগহ্বরে। অতলান্তিক অন্ধকার থেকে ভেসে এল একটা আর্তি : আর দু'দণ্ড সবুর সইল না?

উপাখ্যানটি পড়ে বাসুদেবের মনে হয়েছিল — কোন একটি অজ্ঞাত বিশেষ কারণে মেয়েটি এক রহস্য যবনিকার আড়ালে আত্মগোপন করতে চায়। নিশ্চয় এশিয়ার কোনও দেশ থেকে পড়তে এসেছে স্কলারশিপ নিয়ে। দেশে নিশ্চয় তার কোনও বন্ধন আছে। তাই বন্ধুত্ব করতে সে গররাজি নয় — কিন্তু জীবনে জীবন যোগ করায় হয়তো কোন চরম অন্তরায় আছে। তাই এই রহস্য যবনিকা।

মন অশান্ত হলেই ও খুলে বসে দাদুর স্মৃতিকাহিনী। চাপেকার ভ্রাতৃবৃন্দের ইতিকথা — যে কথা ভারতবর্ষ ভুলে গেছে। মহারাষ্ট্রই বা তা স্মরণে রাখছে কই?

।। পাঁচ ।।

লোকমান্য তিলকের সে আহ্বান পৌঁছে গেল গোলকধামে। চক্রপাণি দর্পহারি মধুসূদন অবতীর্ণ হলেন মর্ত্যলোকে। আমার তিন দাদু আর বড়দাদুর বন্ধু রানাড়ের মধ্যে দেখা দিল সেই শত্রুদলনেচ্ছা। তাঁরা চারজনই দর্পহারী মধুসূদনের অংশ-অবতার। তাঁদের কথাই বলতে বসেছি :

দামোদর চাপেকার — আমার বড়দাদু। তাঁর জন্ম গ্রামে ; কিন্তু তিনি মানুষ হয়েছিলেন তাঁর জেঠামশায়ের সংসারে। বোম্বাইয়ে। সেখানকার বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছিলেন। কিশোর বয়স থেকেই কুস্তি আর লাঠিখেলায় পারদর্শী। দু' দুবার তিনি জ্যেঠামশাইকে না জানিয়ে ঢুকবার চেষ্টা করেছিলেন ব্রিটিশ ইন্ডিয়ার মারাঠা বাহিনীতে। রণকৌশল শিখতে। ঠিক বিপ্লবী রাসবিহারীর মতো। কিন্তু ওঁর সঙ্গে কথাবার্তা বলে রিক্রুটিং অফিসার ওঁকে নিতে রাজি হয়নি। ফলে তাঁর পিতৃদেব তাঁকে গ্রামে ফিরিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের যা স্বাভাবিক বৃত্তি তাতেই নিয়োগ করতে চেয়েছিলেন। সে আমলে অল্প বয়সেই বিয়ে হয়ে যেত। দামোদর একটি নোলক পরা বালিকাকে একদিন ঘরে নিয়ে এলেন। যৌবনপ্রাপ্তির পর তাঁর একটি সন্তানও হল — আগেই বলেছি, তিনি আমার পিতৃদেব : গোপীনাথ চাপেকার।

তিলক মহারাজের ঐ প্রবন্ধটা পড়ে আগুন ধরে গেল দামোদরের মাথায়। ছোট দুই ভাই আর বন্ধু রানাড়েকে ডেকে একদিন সে জানালো তার মনোবাসনার কথা। মহারাষ্ট্রীয় মা-বোনের ইজ্জত নিয়েছে যে দুঃশাসন তার রক্তপান না করা পর্যন্ত তার তৃপ্তি নেই। ওরা তিনজনও এ প্রচেষ্টায় সহকারী হতে চাইল। কিন্তু দামোদর রাজি হল

না। বলল, সে একাই কাজ হাসিল করবে। বাকি দু'ভাই গ্রামেই থাকুক। গ্রামোন্নয়নে ব্রতী হোক তারা। তারা তা কিছুতেই শুনল না।

অগত্যা, মায়ের কাছে বিদায় নিয়ে ওরা চারজন চলে এল পুনায়। পুনাতেই তখন মহামারীর প্রচণ্ড প্রকোপ এবং র‍্যান্ড-সাহেবের পৈশাচিক প্লেগ দমনের চরম অত্যাচার চলছে। ওরা চারজনে এসে আশ্রয় নিল পুনার লৈখদিপুল মহল্লার একটি বস্তিতে। নিতান্ত ঘটনাচক্রেই বলতে হবে, ঐ মহল্লায় ছিল অম্বাবাঈ মায়ের মন্দির। অম্বাবাঈ, আম্মামাঈ, কেউ কেউ বলে লক্ষ্মীমাঈ। তা সে যাই হোক, ঐ মন্দিরের যে পুরোহিত সে প্লেগের আতঙ্কে মহল্লা ছেড়ে পালিয়ে গেছে। মায়ের পূজা-অর্চনা বন্ধ আছে। বস্তিতে ব্রাহ্মণ পরিবার যে একটিও নেই। দামোদর চাপেকারকে পেয়ে বস্তিবাসী ভগবদ্ভক্তরা হাতে চাঁদ পেল। দামোদর ব্রাহ্মণ — পিতাজীর কাছে পূজাবিধিও কিছু কিছু শিখেছে। সবাই বলল, এ মায়ের নিজের ইচ্ছেতেই ঘটেছে। দামোদর দায়িত্বটা নিল। আশ্রয় নিল মন্দির চত্বরে, ভাই দুজন ও বন্ধুকে নিয়ে।

মন্দিরের পাশেই খোলা ময়দান। সেখানে ছাউনি ফেলেছে বোম্বাই নেটিভ ইনফ্যান্ট্রির চতুর্দশবাহিনী। সেপাই হলেও ওরা হিন্দু। প্লেগের ভয় আছে। ওরা পূজা দিতে আসত মায়ের মন্দিরে। দামোদর ওদের দু' একজনের সঙ্গে খৈনী-বন্ধুত্ব পাতালো। কদিন পরে কোথাও কিছু নেই মিলিটারি ছাউনি থেকে বেমালুম চুরি হয়ে গেল দু'দুটি মার্টিন হেনরি রাইফেল আর দুটো তলোয়ার। কড়া প্রহরা বসল। গোটা এলাকায় ওরা চিরুনি-তল্লাশি চালানো। কিন্তু হৃত সম্পদের সন্ধান পাওয়া গেল না। কারণ ছিল। অম্বাদেবী মায়ের আসনের নিচেটা ওরা খোঁজেনি।

এদিকে মেজদাদু বালকৃষ্ণহরি আর রানাড়ে রোজ সকালে বেরিয়ে যায়, মায়ের মন্দিরে ফিরে আসে গভীর রাত্রে। ওরা দিবারাত্র খোঁজ নেবার চেষ্টা করে র‍্যান্ড-সাহেব রুটিনমাফিক কখন কোথায় যায়। দেহরক্ষী কখন কখন থাকে না ; আর তার বাড়িতেই বা কখন প্রহরী থাকে, তারা কী জাতীয় অস্ত্রধারী। কখন 'ডিউটি বদল' হয়। ছোড়দাদু বাসুদেবহরিকে ওরা এসব বিষয়ে টানে না। সে প্রায় কিশোর — তাকে গ্রাম থেকে না আনলেই ভাল হত ; কিন্তু সে নাছোড়বান্দা হয়ে দাদাদের সঙ্গে পুনে শহর দেখতে এসেছে। বাসুদেব প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ ; কিন্তু বড়দা, মেজদা বা রানাড়েদাদার হুকুমের প্রতিবাদ সে করে না। মুখ বুজে কাজ করে যায়। ভাতে-ভাত রান্না করে, জল তুলে আনে, মন্দিরের ধোয়া পোঁছা করে আর নিশ্চুপ বসে থাকে মন্দির চাতালে। মায়ের আসনের নিচে কী আছে তা তাকে জানানো হয়েছে। তাই সারাদিন বসে বসে পাহারা দেয়।

কিন্তু মুশকিল এই — প্রকাশ্য রাজপথে তো রাইফেল বা তলোয়ার নিয়ে ঘোরা-ফেরা করা চলে না। বিশেষ, তা যখন চোরাই মাল। সেপাইরা তা খুঁজছে।

একদিন দামোদর কোথা থেকে সংগ্রহ করে আনল দু'দুটি রিভলবার। কোথা থেকে পেল সে? দামোদরদাদু তা কাউকে বলে যায়নি। তাই ওটা ইতিহাসের অনুদ্‌ঘাটিত অধ্যায়।

বালকৃষ্ণ বললে, আমাদের কারো টার্গেট প্র্যাকটিস করা নেই। তা পুনে শহরের চৌহদ্দির ভিতর করাও যাবে না। শব্দ হবে। পুলিশে জানতে পারবে।

তার দাদা বললে, ও নিয়ে চিন্তা করিস না মেজ, আমি তার সমাধান করে রেখেছি। লক্ষ্যবস্তুর গায়ে পিস্তলের নল না লাগিয়ে ট্রিগার টানব না আমি।

রানাড়ে বলে, এ কি ছেলের হাতে মোয়া? সে সুযোগ ঐ শয়তান দেবে কেন তোকে?

— দেবে। এ তার নিয়তির টান। এ মায়ের আদেশ। তার পাপের প্রায়শ্চিত্ত!

পুরো তিন মাস ওরা তিনজন ছায়ার মতো অলক্ষ্যে অনুসরণ করে ফিরেছে — র‍্যান্ড আর তার সহকারী আয়ার্স্টকে। দামোদর আর রানাড়ের জেব-এ লোডেড রিভলবার আর বালকৃষ্ণের জেব-এ আছে শুধু দুরন্ত কৌতূহল। স্বচক্ষে দেখবে ঐ মা-বোনের-ইজ্জৎ-নেওয়া র‍্যান্ডকে পথের ধুলায় লুটিয়ে পড়তে। সুযোগ যে এক আধবার আসেনি তা নয়। র‍্যান্ডের ক্ষণিক সান্নিধ্য পেয়েছে — রেঞ্জের ভিতরেই ; কিন্তু দামোদর তার পকেটে হাত ঢোকায়নি। তার স্থির সংকল্প : তিলক মহারাজের আদেশে অগ্নিমন্ত্রের এই প্রথম অর্ঘ্যটা যেন ঠিক মায়ের চরণতলেই লুটিয়ে পড়ে। মা 'নরবলি'র আদেশ দিয়েছেন। 'অ্যাটেম্পট টু মার্ডার' নয় — 'ইন্সট্যান্টেনিয়াস ডেথ' হওয়া চাই।

তারপর এল সেই মাহেন্দ্রক্ষণ : বাইশে জুন 1897.

মহারাণী ভিক্টোরিয়ার জুবিলি উৎসবের রাত্রে।

সারা পুনে শহরে সেদিন দীপান্বিতা — সরকারি খরচে। যে বাড়ি প্রদীপ দিয়ে সাজানো হয়নি থানেদার তার খাতায় সে বাড়ির মালিকের নাম লিখে নিচ্ছে।

গভর্নমেন্ট হাউস থেকে রাত সাড়ে সাতটায় বার হয়ে এল পর পর দুখানি ঘোড়ায় টানা ব্রুহাম গাড়ি। প্রথমটায় উৎসবসজ্জায় রাজবেশে স্বয়ং কমিশনার র‍্যান্ড ; দ্বিতীয়টায় তার সহকারী অ্যাসিস্টেন্ট কমিশনার আয়ার্স্ট, সস্ত্রীক। দুটি গাড়ির মাঝখানে ব্যবধান প্রায় পঞ্চাশ হাত। দামোদর আর রানাড়ে আগেই খবর পেয়েছে রাত সাড়ে সাতটায় দুখানি গাড়িতে ওঁরা যাবেন উৎসব ময়দানে আতস বাজি পোড়ানো দেখতে। মারাঠা রেজিমেন্টের স্যালুট নিতে। তাই দুই বন্ধু সন্ধ্যা থেকেই রাজবাড়ির সামনে, ফটক থেকে একটু দূরে বাঁকের মাথায় গাছের আড়ালে লুকিয়ে বসে ছিল।

এগিয়ে আসছে জোড়া-ব্রুহাম। দূর থেকে কানে গেল ওয়েলার ঘোড়ার — টগবগ্‌-টগবগ্‌। ব্রিটিশ শক্তির মদমত্ত পদধ্বনি যেন! জামশেদজী জীজীবয়ের বাড়ির কাছাকাছি প্রথম গাড়িটা এগিয়ে আসা মাত্র কোচম্যান গাড়ির গতি শ্লথ করল। করতে হবেই —

জানত দামোদর — কারণ এবার গাড়ি বাঁয়ে মোড় নেবে। তাই জেনে বুঝে ঐ বাঁকের মুখেই থানা গেড়েছে। গাড়ির গতি স্লথ হওয়া মাত্র বিদ্যুৎগতিতে অন্ধকারের বুক চিরে বার হয়ে এল দামোদর। পিছন থেকে শোনা গেল মেজভাই বালকৃষ্ণহরির সঙ্কেত : 'ন্যায়ারা, ন্যায়ারা।'

র‍্যান্ডের গাড়িটা বাঁক নিচ্ছে। পিছনে দাঁড়িয়ে ছিল তকমা-আঁটা সহিস। তার মাজায় বাঁধা ঝকঝকে তলোয়ার। অন্ধকারের ভিতর কে যেন প্রচণ্ড একটা মুষ্ট্যাঘাত করল তার চোয়ালে। ছিটকে পড়ল লোকটা নয়ানজুলিতে। দামোদর এক লাফে উঠে দাঁড়াল পিছনের পা-দানিতে। চালক বুঝতে পারেনি কী ঘটেছে ; কিন্তু র‍্যান্ড পিছন ফিরেছে। চকিতে সে দেখতে পেল সহিসের পর্দার ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে আসা কালো রিভলবারের নলটা। চিৎকার করে উঠল র‍্যান্ড। এবং সঙ্গে সঙ্গে গর্জন করে উঠল রিভলভারটা। রিভলভারের নলটা একেবারে স্পর্শ করেছিল র‍্যান্ড-সাহেবের মাথায় খুলি। উড়ে গেল খুলির ঊর্ধ্বাংশটা! তৎক্ষণাৎ লুটিয়ে পড়ল র‍্যান্ড। মুহূর্তে মৃত্যু। ইন্সট্যান্টেনাস ডেথ!

নাটকের যবনিকা কিন্তু তখনও পড়েনি। পঞ্চাশ হাত পিছনে আসছিল যে গাড়িটা তার সওয়ার মিসেস আয়ার্স্ট তার স্বামীকে বললে, সামনের গাড়িতে র‍্যান্ড একটা ফায়ার করল না?

আয়ার্স্ট চলন্ত গাড়ি থেকেই মুখটা বাড়িয়ে সামনের দিকে ঝুঁকে দেখতে গেল। এই সুযোগটাই খুঁজছিল রানাড়ে — গাড়ির পাশে পাশে চলতে চলতে। আয়ার্স্টকে মারতে গিয়ে ভুল করে যেন স্ত্রীহত্যা না করে বসে। এইবার লক্ষ্যবস্তুকে পরিষ্কার দেখতে পেল। গর্জে উঠল তার হাতের মারণাস্ত্র। স্ত্রীর কোলে ঢলে পড়ল আয়ার্স্ট।

তার মৃত্যু হয়েছিল এগারো দিন পরে — হাসপাতালে।

দামোদর ধরা পড়ল আগস্ট মাসের নয় তারিখে। সম্পূর্ণ নির্বিকার সে। ধর্মাধিকরণে সে স্বীকার করল : আজ্ঞে হ্যাঁ, আমি নিজে হাতে র‍্যান্ডকে তার প্রাপ্য শাস্তি দিয়েছি। আমি বিচারক, আমিই জল্লাদ! ঠিক কথা, আমিই লাফিয়ে উঠেছিলাম ওর গাড়ির পাদানিতে। আমিই ওর মাথার খুলি লক্ষ্য করে রিভলবারের ট্রিগারটা টেনে দিয়েছিলাম। কিন্তু হুজুর রিভলবারের গর্জনটা আমি আদৌ শুনতে পাইনি।

বিচারক সামনের দিকে ঝুঁকে প্রশ্ন করেছিলেন, কী বললে? রিভলবারের আওয়াজ তুমি শুনতে পাওনি?

— আজ্ঞে না হুজুর! আমার মনে হল পুনে শহরের আমার হাজার হাজার মা-বোন — যাঁদের উলঙ্গ করে মজা দেখেছিল ঐ পিশাচটা — তাঁরা একসঙ্গে আমার রিভলবারের মুখে হুমড়ি খেয়ে পড়ে আমাকে উচ্চৈঃস্বরে আশীর্বাদ করে উঠলেন : 'শাবাশ বেটা!' সে শব্দটা শুনেছি। হুজুর!

— আই সি। তোমার আর কিছু বলার আছে?

— আজ্ঞে হ্যাঁ, হুজুর। চৌরাস্তার মোড়ে রানী ভিক্টোরিয়ার গলায় ঐ জুতোর মালাটা আমিই নিজে হাতে পরিয়ে দিয়েছিলাম — এ নিয়ে আর কাউকে শাস্তি দিলে সেটা অধর্ম হবে।

— য়ু' মে কাম ডাউন ফ্রম দ্য ডক!

পুলিশ তখন সমস্ত রাজ্য তন্নতন্ন করে খুঁজছে দামোদরের দুই সহকারীকে। আয়ার্স্ট হত্যাকারী ছাড়াও ছিল আর একজন, যে ছোকরা 'ন্যায়রা, ন্যায়রা' বলে চিৎকার করে সঙ্কেত জানিয়েছিল। অকথ্য অমানুষিক অত্যাচারেও দামোদর মুখ খোলেনি। দিনের পর দিন তার প্রতিটি অঙ্গে আগুনের ছেঁকা দেওয়া হয়েছে। ঠ্যাঙে দড়ি বেঁধে ঘণ্টার পর ঘণ্টা উল্টো করে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। দামোদর অজ্ঞান হয়েছে। রক্তবমন করেছে। মুখ খোলেনি। আয়ার্স্ট হত্যাকারীর নাম সে বলবে না। বলেনি।

পুলিশ তল্লাসি করে নাম দুটি জেনেছে: রানাড়ে আর বালকৃষ্ণহরি চাপেকার। ব্রিটিশ সরকার ঘোষণা করল এদের কাউকে জীবিত বা মৃত ধরিয়ে দিতে পারলে বিশ হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে। 1897 সালের বিশ হাজার টাকা! মানে, আজকের কত লক্ষ বা কোটি টাকা, তা আপনারা হিসাব করে দেখবেন। এটা প্রেস্টিজের লড়াই! সরকার বেপরোয়া!

বালকৃষ্ণহরি তখন হায়দ্রাবাদে। সেখানে সে যার বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিল সেই লোকটা বিশ্বাসঘাতকতা করে ওকে ধরিয়ে দিল পুরস্কারের লোভে। নিজামের কাছে ইংরেজ সরকারের নির্দেশ গেল : বন্দীকে অবিলম্বে ইংরেজ সরকারে সমর্পণ কর। মহামহিম নিজাম বাহাদুর ক্ষীণস্বরে প্রতিবাদ করলেন : 1867 সালের চুক্তি অনুসারে নিজাম স্বয়ং তাঁর রাজ্যের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। ভাইসরয়ের দূত জবাব নিয়ে এল তৎক্ষণাৎ : ছেলেখেলা কর না। চব্বিশ ঘণ্টার ভিতর বালকৃষ্ণ চাপেকারকে সমর্পণ না করা হলে ব্রিটিশ বাহিনী নিজাম রাজ্য আক্রমণ করতে বাধ্য হবে।

নিজাম বালকৃষ্ণকে সমর্পণ করলেন ইংরেজ পুলিশের হেপাজতে। ঐ সঙ্গে আবেদন করলেন ঘোষিত পুরস্কারটা। ইংরাজ সরকার রাজি হলেন না। মাত্র দশ হাজার টাকা দিলেন নিজামকে। বাকি দশ — সেই বিশ্বাসঘাতক বাড়িওয়ালাকে, যে ধরিয়ে দিয়েছিল।

।। ছয় ।।

ট্রিনিট কলেজে বিদেশী ছাত্রাবাসটি মনোরম একটি ত্রিতল বাড়ি। ক্যাম্পাসের একান্তে পপ্‌লার অ্যাভিন্যুর শেষ প্রান্তে। লিফট নেই। প্রত্যেকটি বিদেশী স্কলার ছাত্রের জন্য একক শয্যার ছোট্ট কক্ষ। সংলগ্ন স্নানাগার। পৃথক টেলিফোন। সেন্ট্রাল হিটিং ব্যবস্থা। তাছাড়াও প্রতিটি ঘরে ইলেকট্রিক রুম-হিটার। ফ্যান নেই। ডাবলিনে চরম গ্রীষ্মের দিনেও পনের ডিগ্রি সেলসিয়াস-এর বেশি তাপমাত্রা ওঠে না। তাই আশীবিষের মতো ফ্যানও এ দ্বীপে অনুপস্থিত।

বাসুদেব সকালে শুয়ে শুয়ে দাদুর স্মৃতিচারণ গ্রন্থটাই পড়ছিল, হঠাৎ ঝনঝন করে বেজে উঠল টেলিফোন। তুলে নিয়ে আত্মঘোষণা করতেই ওপ্রান্ত থেকে মধুকণ্ঠী জানতে চাইল : অরফিউস?

— এ নম্বরে আর কে সাড়া দেবে বল?

— তা বটে। তা আজ তো রবিবার, দিনটা কীভাবে কাটাচ্ছ? টুরিস্ট-গাইডের ডিউটি নিয়ে রেখেছ নাকি?

— না। আমার সারাদিনে কোন অ্যাপয়েন্টমেন্ট নেই। কেন? তুমি কিছু ভেবেছ নাকি? আমার পকেট কিন্তু ফাঁকা।

— 'ফাঁকা' মানে কতটা ফাঁকা? ফোনিক্স পার্ক পর্যন্ত আসবার মতো বাস ভাড়া আছে তো?

— তা আছে। কিন্তু এত জায়গা থাকতে ফোনিক্স পার্ক কেন?

— কারণ আমি সেখানেই তোমার জন্য অপেক্ষা করব। ঐ পার্কের উত্তরপ্রান্তে, ইবসেন অ্যাভিন্যুর ধারে জেমস কনোলীর মূর্তিটা নিশ্চয় চেন। তার বিপরীতে ম্যাকডোনাল্ড রেস্তোরাঁ। আমি ওখানে পৌঁছাব সওয়া নয়টায়। তুমি চলে এস। খুব জরুরী কিছু কথা আছে।

— কী জাতীয় কথা?

— সেটা এলে জানতে পারবে। ফিরতে তোমার হয়তো রাত হয়ে যাবে। ঠিক বলতে পারছি না — 'হয়তো' বলছি তাই। আমরা হয়তো দুজনে লিমেরিক যাব। লাঞ্চ ওখানেই সারব। তোমার পকেট ফাঁকা হলেও আমার ব্যাগে কিছু আছে।

— হঠাৎ 'লিমেরিক' যাব কেন?

— সেকথার জবাব আগেই দিয়েছি। 'যাবই' তা বলিনি। যেতে হতে পারে। সেভাবে তৈরি হয়ে এস।

— তুমি এখন কোথা থেকে কথা বলছ?

— আমার হোস্টেল থেকে।

— সেখানে যেতে পারি না আমি? হস্টেলের ঠিকানাটায়?

— না প্লিজ! তুমি চলে এস ফোনিক্স পার্কে। ঠিক সওয়া নয়টায়। বাসুদেব আরও কিছু জানতে চাইছিল, সুযোগ পেল না। ওপ্রান্তে টেলিফোন যন্ত্রটা ধারক-অঙ্গে ফিরে গেছে। বাসুদেব এখনও জানে না মেয়েটির কী নাম, কোন হস্টেলে থাকে। কী পড়ে! সে বরাবর রহস্য যবনিকার আড়ালেই থেকে গেছে।

নির্ধারিত সময়ে বাসুদেব পৌঁছে গেল 'ম্যাকডোনাল্ড' রেস্তোরাঁয়। রবিবারের ছুটি। তাই এই সাতসকালেও মোটামুটি ভিড় আছে, প্রাতরাশপ্রার্থীদের। ওর বান্ধবী বসেছে বাগানের একান্তে এক পেয়ালা ব্ল্যাক কফি নিয়ে। বাসুদেব এগিয়ে যেতেই মেয়েটি জানতে চাইল, তুমি কি কফি নেবে একটা?

— নো থ্যাংকস্। আমি এইমাত্র প্রাতরাশ সেরে এসেছি।

পেয়ালার তলানিটুকু কণ্ঠনালীতে ঢেলে দিয়ে ও বললে, তবে চল, ফোনিক্স পার্কে গিয়ে কথাবার্তা বলি। এখানে বড্ড ভিড়।

— চল!

দুজনে রাস্তাটা পার হয়ে চলে এল ফোনিক্স পার্ক-এ। অতি মনোরম সুসজ্জিত এই উদ্যানটি। ডাবলিনের গর্ব। প্রবেশপথে প্রকাণ্ড একটা ভাস্কর্য। বিরাট একটা পাখি, অনেকটা ঈগলের মতো — যেন দুদিকে ডানা মেলে মাটি ছেড়ে আকাশে উঠে যেতে চাইছে। সরু সরু দুটি পায়ের উপর ভর দেওয়া ঐ প্রকাণ্ড ক্যান্টিলিভার পাখিটি বানাতে ভাস্করকে রীতিমতো বেগ পেতে হয়েছে। বাসুদেবের বান্ধবী ইউরিডিস বললে, এই ভাস্কর্যটা আমার সুন্দর লাগে, যদিও অর্থ বুঝি না। এটা কীসের প্রতীক, তা তুমি জান, চাপেকার? এটা কী পাখি?

বাসুদেব হাসল। বলল, জানি মাদমোয়াজেল! ডাবলিন শহরের প্রতিটি উল্লেখযোগ্য স্থাপত্য ও ভাস্কর্য আমার নখদর্পণে। এটি 'ফোনিক্স'-এর মূর্তি। এর নামেই গোটা উদ্যানটির নামকরণ। Phonics নয় কিন্তু। শব্দ বিজ্ঞানের সঙ্গে এর কোনও সম্পর্ক নেই। ইনি Phoenix — মিশরীয় সভ্যতায় ইনি ছিলেন সূর্যপ্রতীক এক অপার্থিব পক্ষিরাজ। এই বিহঙ্গম — মিশরীয় সংস্কৃতি অনুসারে অর্ধ সহস্রাব্দিকাল জীবিত থাকেন। তারপর তিনি নিজেই প্রজ্জ্বলিত অগ্নিতে স্বেচ্ছায় আত্মাহুতি দেন। কিন্তু তাঁর মৃত্যু নেই — তিনি অমর। কারণ, অগ্নিদগ্ধ চিতাভস্ম থেকে জন্ম নেয় নতুন যুগের নবীন ফোনিক্স। অর্থাৎ প্রতি হাজার বছরে মাত্র দু'টি পাখির জীবনলীলা। এভাবেই চলতে থাকে সহস্রাব্দির পর সহস্রাব্দি — অনন্তকাল। অর্থাৎ মিশরীয় গাথার কবিকল্পনা

অনুসারে 'ফোনিক্স' অমরাতার প্রতীক।

— থ্যাঙ্কু মিস্টার গাইড।

ওরা দুজনে এসে বসল ঘাসের ওপর। সমান করে ছাঁটা পারস্য গালিচার মতো সবুজ লন। যে কোন জায়গায় নেট খাটিয়ে লন টেনিস খেলা চলে। পার্কে অনেক বেঞ্চিও। কেউ বসে না। কারণ পারস্য গালিচায় বসতে হলে রুমাল বিছানোর প্রয়োজন হয় না। মলিনতার বিন্দুমাত্র স্পর্শ লাগে না তৃণশয্যায় আশ্রয়গ্রহীতার। ক্রমাগত সাফাই হচ্ছে। ঘাসের ওপর হাঁটাচলা বা পায়চারি করা বারণ ; কিন্তু বসলে কেউ আপত্তি করে না। বস্তুত কিছু দূরে দূরে সকালের রৌদ্রপিয়াসী জোড়ায় জোড়ায় অর্ধশায়িত প্রেমিকযুগলকে দেখতে পাওয়া যায়। ওরা বেশ জড়াজড়ি করে শুয়ে আছে রৌদ্রোজ্জ্বল উদ্যানে। পথচারীরা ভ্রূক্ষেপও করে না।

বাসুদেব বললে, কাজের কথা কী বলবে বলছিলে? হঠাৎ আমরা লিমেরিক যাব কেন?

— 'আমরা যাব 'বলিনি। আমি যাব। তুমি যদি সঙ্গ দিতে চাও, যাবে। কিন্তু সেটা দ্বিতীয় পর্যায়ের কথা। প্রথম কথা, আজ আমার : ডে অব কনফেশন!

— 'ডে অব কনফেশন'! মানে?

— কিছু অপরাধ করেছি তোমার কাছে। কিছু মিথ্যা বলেছি। আত্মগোপনের তাগিদে। তোমাকে সব কথা খুলে বলতে চাই। তাই আজ ডেকে পাঠিয়েছি।

বাসুদেব গম্ভীর হয়ে গেল। বলল, তুমি যে মিথ্যে পরিচয় দিয়েছ তা তো আমার জানাই। সে কথা জেনেও তোমার সঙ্গে নিবিড় বন্ধুত্বে জড়িয়ে পড়েছি। মোটামুটি জানিও — কী মিথ্যা বলেছ। কেন মিথ্যা বলেছ সেটা আন্দাজ করে নিয়েছি ...

— কী আন্দাজ করেছ, শুনি?

— তুমি হিন্দি ভালই জানো, কারণ তুমি ভারতীয়। উত্তর ভারতের মেয়ে। তুমি আমার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে নিজেকে জড়াতে চাওনি এ কারণে, যাতে আমাদের এই দেখা-শোনা, বন্ধুত্ব, বোঝাপড়া স্বাভাবিক পরিণতিলাভ না করে।

— 'স্বাভাবিক পরিণতি' বলতে কী বোঝাতে চাইছ?

— সহজ বুদ্ধিতে তুমি যা বুঝেছ তাই। তোমার বয়সী একটি মেয়ের সঙ্গে আমার বয়সী একটি ছেলের ঘনিষ্ঠতা হলে — দুজনেই যদি অবিবাহিত হয় — তাহলে তার একটাই তো 'স্বাভাবিক পরিণতি' হতে পারে, ইউরিডিস্।

নতনয়নে ও বললে, আমার ডাক নাম : 'সাবি'।

— 'সাবি'! ডাক নাম? তাহলে পুরো নামটা কী? 'সাবিত্রী' না 'সবিতা'? নাকি আর কিছু?

— আর কিছুই। কিন্তু তোমার কী ধারণা, বাসু? কেন এতদিন আমি নিজেকে লুকিয়ে

রেখেছিলাম? তুমি যেটাকে 'স্বাভাবিক পরিণতি' বলে বোঝাতে চাইছ সেটাতেই বা কেন আমি আগ্রহী নই?

বাসুদেব একটু ভেবে নিয়ে বলল, আমার বিশ্বাস : তুমি অন্যপূর্বা। বিবাহিতা।

— আন্দাজে ভুল হল এবার। আমি কুমারী। বাধাটা অন্য জাতের। বলব সে কথা। আসলে সে কথা বলতেই তো আজ তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছি। কিন্তু সেই শেষের কথাটা আসবে শেষে। কারণ তার পরে হয়তো আর কোন কথা তুমি শুনতে চাইবে না। তাই তার আগে গোড়া থেকে কিছু বলি শোন। প্লিজ — আমাকে বাধা দিও না।

— বল?

— তুমি আমাকে প্রথম লক্ষ্য করেছিলে লাইব্রেরিতে। হিন্দিতে জানতে চেয়েছিলে, 'কটা বাজে?' অর্থাৎ 'তুমি কি ভারতীয়?' তাই নয়? কিন্তু তার মাসখানেক আগে থেকেই আমি তোমাকে জানতাম। চিনতাম, আলাপ করার জন্য উন্মুখ হয়ে তোমার পিছু পিছু ঘুরঘুর করতাম। ইনফ্যাক্ট — 'লাভ অ্যাট ফার্স্ট সাইট' থিয়োরিটা যদি বিশ্বাস কর, তবে সেই প্রথম দিনেই আমি তোমাকে ভালবেসে ফেলেছিলাম।

বাসুদেব অবাক হল। বলল, কোনদিন? কই আমি তো তোমাকে লক্ষ্য করিনি। টের পাইনি।

— সেটাই তো ট্র্যাজেডি। ডিবেটিঙে তোমাদের গ্রুপ হারল — আর্টস সেকশান ট্রফিটা পেল ; কিন্তু বিচারকেরা 'বেস্ট ডিবেটার' প্রাইজটা তোমার হাতেই সেদিন তুলে দিলেন। আমি বসেছিলাম দর্শক দলের থার্ড রো-তে। আমার বাঁয়ে অ্যাগনেস, টাইনে জুলি। তুমি আমাদের উপর চোখ বুলিয়ে দেখলে — কিন্তু অ্যাগনেস-সাবি-জুলির মধ্যে কোনও পার্থক্য দেখতে পেলে না। ... অনেকে তোমার সঙ্গে করমর্দন করে এল, অভিনন্দন জানিয়ে এল। তুমি হেসে হেসে তাদের হাতে হাত মেলালে। আমি হাতটা গুটিয়ে রাখলাম, অভিমানে। ... হস্টেলে ফিরে এসে মনে হল, এ কী পাগলামি! বাসুদেব কেমন করে জানবে আমার মনের মধ্যে কী হচ্ছে? সে তো ইচ্ছে করে আমাকে উপেক্ষা করেনি। সে তো জানেই না আমার কথা। চেনেই না আমাকে! ... তোমার পরিচয় জোগাড় করা মোটেই কঠিন হল না। শুনলাম, তুমি মহারাষ্ট্রিয়ান, এম. ডি. করতে এসেছ ম্যাকমিলান স্কলারশিপে — এটাই তোমার শেষ বছর। তোমার নাম : বাসুদেব চাপেকার! নামটা শুনেই চমকে উঠেছিলাম — কোথায় শুনেছি এ নাম? বম্বের রঞ্জি ট্রফি টিমে? ফিল্ম লাইনে? না! হঠাৎ মনে পড়ে গেল। স্কুলে ভারতের ইতিহাস পড়তে হয়েছিল — মনে পড়ে গেল, গত শতাব্দীর শেষ দশকে বাসুদেব চাপেকার ফাঁসির অর্ডার শুনে বলেছিলেন : ধর্মাবতার! ফাঁসির আসামীকে তার ইচ্ছেমতো কিছু খাবার খেতে দেওয়া হয় বলে শুনেছি : আমি হুজুর, তাহলে এক হাঁড়ি রসগোল্লা খাব।

বাসুদেব বললে, হ্যাঁ তাই ব[illegible]ছিলেন তিনি — বাসুদেব চাপেকার! আমার ঠাকুর্দা বিনায়ক দামোদর চাপেকারের ছোড়দাদু। আজ থেকে একশ ছয় বছর আগে তাঁর ফাঁসি হয়।

— তোমরা ব্রাহ্মণ, না? তোমার বাবা বেঁচে আছেন? মা?

— হ্যাঁ। আমরা মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ, গাণপৎ সম্প্রদায়। তবে আমার বাবা-মা দু'জনেই স্বর্গে গেছেন। আমি দাদুর কাছে মানুষ। দাদু, দিদা দুজনেই আছেন। পুনেতে। কিন্তু তুমি তোমার কথা বলতে এসেছিলে আমার কথা জানতে নয় — কেন আত্মগোপন করেছিলে এতদিন, সে কথা জানাতে। তোমার তো সেকেন্ড ইয়ার, কোন স্ট্রিম?

— না, বাসু, সেটাও মিছে কথা। পাছে তুমি আমাকে খুঁজে পাও তাই ভুল তথ্য দিয়েছিলাম। আমি জামশেদপুর টাটা রিসার্চ ইনস্টিটিউট থেকে স্যোশিওলজিতে ডিগ্রি নিয়ে স্কলারশিপ পেয়ে সমাজ-বিজ্ঞান বিষয়ে এখানে ডক্টরেট করতে এসেছি। এটা আমারও শেষ বছর। আমরা একসঙ্গেই ভারতে ফিরব।

— তোমার দেশ কোথায়? যুক্তপ্রদেশ মনে হয়। ঠিক কোথায়? আর দেশে কে কে আছেন? বিয়ে করনি বললে, বাবা-মা, ভাই-বোন ...

সাবি বাধা দিয়ে বললে, ঠিকই ধরেছ, ইউ পি ; আমাদের বাড়ি লক্ষ্ণৌ। সেখানে আছেন আমার দাদু। মা গত হয়েছেন। আমি তাঁর একমাত্র সন্তান। ভাই-বোন আর কেউ নেই। দিদাও নেই।

— বাবা?

সাবি চুপ করে রইল। নিজের ম্যানিকিওর করা আঙুলগুলোর দিকে নজর গেল ওর। বাসুদেবের হাতটা টেনে নিয়ে তার আঙুল নিয়ে খেলা করতে শুরু করল।

— কী হল? কিছু বলছ না যে? তোমার বাবা বেঁচে নেই?

— আছেন। লক্ষ্ণৌতে নয়। কানপুরে। তাঁর সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই।

— কেন? তোমার মা মারা যাবার পর তিনি বুঝি আবার বিয়ে করেছেন?

— না, মা মারা যাবার পরে নয়। শুনলে অবাক হয়ে যাবে, যে মেয়েটিকে তিনি বিয়ে করেছেন সে আমার সহপাঠিনী। আমরা একই ক্লাসে পড়তাম। বন্ধু হিসাবেই সে আমার সঙ্গে দেখা করতে আমাদের বাড়িতে আসত। তার চেয়েও অবাক করা খবর, বাবা আমার বান্ধবীকে যখন বিবাহ করলেন তখন আমার মা মৃত্যুশয্যায়। তবু সজ্ঞানে। তিনি তা জেনে গেছেন।

— কী বকছ পাগলের মতো? তা অসম্ভব! লিগ্যালি অ্যাবসার্ড।

— ফর য়ু মাই ডিয়ার ফ্রেন্ড। ফর য়ু ওনলি। আমাদের জন্য নয়।

— তার মানে? কেন?

— এখনো বোঝনি? যেহেতু ইটন হ্যারোতে শিক্ষিত জনৈক ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী গদীর লোভে 'বিবেক'কে জলাঞ্জলি দিতে দ্বিধা করেননি। সুপ্রীম কোর্টে জেতা মামলার রায়খানা কুচি কুচি করে ছিঁড়ে ফেলে শাহবানু ঘর ছেড়ে পথে নেমে এসেছিলেন। তোমাদের প্রধানমন্ত্রীকে কিছু মুসলিম ভোট পাইয়ে দিতে।

— 'আমাদের' প্রধানমন্ত্রী?

— সরি। না। আমাদেরও। আই মিন, মুসলমানদেরও অতি প্রিয় প্রধানমন্ত্রী ছিলেন ঐ মৌলানা রাজীব গান্ধী — যাঁর কৃপায় শরিয়তি কানুনের পার্সোনাল ল কট্টর মুসলমানেরা বজায় রাখতে পেরেছে। পারছে।

বাসুদেব জবাব দিতে পারল না। সাবি তার বন্ধুর ঘামেভেজা হাত থেকে নিজের মুঠিটা ছাড়িয়ে নিল। সোজা হয়ে বসে বসল, আয়াম সরি বাসু। তোমার সঙ্গ পাওয়ার লোভে, তোমার ভালবাসা পাবার উন্মাদনায় আমি তোমার সঙ্গে তঞ্চকতা করেছি, প্রতারণা করেছি। আমার ডাক নাম 'সাবি', পুরো নাম : 'সাবিরা খাতুন'। আমার আম্মা বেহেস্তে যাবার আগেই তাঁর খসম্ আমার মাকে তালাক দিয়েছিলেন। আমার সহপাঠিনী বান্ধবীকে 'নিকা' করেছিলেন।

বাসুদেব অন্যমনস্কের মতো বলল, আই সি!

সাবিরা ম্লান হাসল। বলল, তোমার আর কিছু জিজ্ঞাস্য নেই, তাই না? সব কৌতূহল মিটে গেছে তো?

বাসু ওর হাতটা টেনে নিল। বলল, এমন করে কেন বলছ সাবি? এটা তো তুমি জানতেই! জানতে না? যে, খবরটা শোনামাত্র আমি শক্‌ড্ হব? তাই না তথ্যটা লুকিয়ে রেখেছিলেন এতদিন? বল, ভুল বলছি?

সাবিরা বলল, আমি আগেই বলেছি, আমি দুঃখিত। যে স্বপ্ন দেখার কথা নয়, যা হয় না, হবে না — সেই স্বপ্নই দেখে এসেছি এই কয়মাস। দুঃখিত শুধু নয়, আমি তোমার কাছে ক্ষমা চাইছি বাসুদেব। আমার প্রতারণায় তুমি আমার স্পর্শ করা খাদ্য-পানীয় গ্রহণ করেছ। তোমাদের হিসাবমতো : তোমার জাত গেছে। তা প্লেনে যেসব এয়ার-হস্টেস তোমাকে 'ভেজ' খাবার খাইয়েছিল তারাও তো কনৌজী ব্রাহ্মণ ছিল না। জাত তোমার তখনই গেছে। দেশে ফিরে একটা 'প্রাচিত্তির' জাতীয় কিছু করে নিও। তাহলেই জাতে উঠে যাবে।

বাসুদেব এ তিরস্কারের জবাব দিতে পারল না। জাত-পাত সে মানে না। কিন্তু তাই বলে সেই বৃদ্ধ দম্পতির বুকে মৃত্যুশেলটা হেনে বলতেও পারবে না : আমি ওসব জাত-পাত মানি না।

দুজনেই নীরবে বসে রইল পাশাপাশি। এত নিস্তব্ধ যে, রবিন, টীট, ম্যাগপাইগুলো

নির্ভয়ে ঘনিয়ে এল ওদের কাছে, খুব কাছে, পোকা খুঁটে খেতে। শেষে বাসুদেবই একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, আমাদের আজ 'লিমেরিক' যাওয়ার কথা ছিল না?

— ছিল। আমাদের নয়। আমি এখন একাই যাব।

— কেন? লিমেরিকে কী জন্য যাচ্ছ?

— একটা 'লিভ ভেকেন্সি'তে চাকরি করতে — দিন পনেরর জন্য। লং ভেকেশনে। আমার দাদুর এক বন্ধু আছেন ডাবলিনে। তিনিই বন্দোবস্ত করে দিয়েছেন। ডেমোগ্র্যাফিক সার্ভের টেম্পরারি কাজ। যে মেয়েটি করছিল তার ফ্লু হয়েছে। কিন্তু 'টাইমবাউন্ড কাজ'। চালিয়ে যেতেই হবে। তাই আমি এবারের লং ভেকেশানটা ওখানেই কাটাব — কিছু রোজগার করতে।

বাসুদেব জানতে চায়, তুমি তো স্কলারশিপ নিয়ে পড়তে এসেছ। পকেট মানি পাও কোথা থেকে? দাদুর আর্থিক অবস্থা কেমন?

— ভাল, খুবই ভাল। কিন্তু তিনি শয্যাশায়ী। আর্থারাইটিস। বয়সও আশির কাছাকাছি। ছেলে, ছেলের বউ, নাতি-নাতনিদের সেবা আর করুণার ভিখারি। তারা চায় না এই বাপে-খেদানো মা-মরা মেয়েটার জন্য বড়ি আব্বা কিছু খরচপাতি করুক। আমিও তা চাই না। যেকটা দিন বাঁচবে, তাকে যেন গঞ্জনা সইতে না হয়। তাই অন্তত পকেট মানির ব্যাপারে তোমার সঙ্গে ডুয়েট গাইতে পারি, 'উই আর ইন দ্য সেম বোট ব্রাদার'।

— তুমি তখন টেলিফোনে আমাকেও তৈরি হয়ে আসতে বলেছিলে। কেন? তোমাকে কম্পানি দিতে?

— না! দাদুর বন্ধু বলেছিল, উনি তোমার জন্যও ওঁর ক্লায়েন্টের কাছে সুপারিশ করতে পারেন। দাদুর ঐ বন্ধু একজন সলিসিটার। তাঁর ক্লায়েন্ট লিমেরিকের একজন ঠিকাদার, মিস্টার ম্যাকগ্রেসরি। তাঁকে প্রায়ই সাময়িকভাবে মজদুর নিয়োগ করতে হয়। কায়িক শ্রম। তাই ভেবেছিলাম ...

— বেশ তো, চল না। দুজনেই একসঙ্গে যাই। ম্যাকগ্রেগরির অ্যাড্রেসটা নিয়েছ তো?

সাবিরা বলল, না, বাসু। আজ আমি একাই যাব। আমার সব ব্যবস্থা হয়ে গেছে। সোমবার সকালে আমি ডেমোগ্রাফিক সার্ভে টিমে জয়েন করব। ওখানে একজনের বাড়িতে আমি পেয়িং গেস্ট থাকব — বেড অ্যান্ড ব্রেকফাস্ট — খরচা করতে হবে না, কারণ ও বাড়ির হাউস ক্লিনিং-এর দায়িত্বটাও আমাকে নিতে হবে। বলতে পার : বিনি মাইনের মেইড সার্ভেন্ট। আমি সুযোগমতো মিস্টার ম্যাকগ্রেগরির সঙ্গে দেখা করব। তিনি যদি সাময়িকভাবে লোক নিতে রাজি থাকেন তাহলে শর্ত বা মাহিনাও জেনে নেব। তোমার থাকা-খাওয়ার কী ব্যবস্থা হয় সেটাও দেখব। তারপর তোমাকে ফোনে জানাব।

তোমার লং ভেকেশনটা তো শুরু হচ্ছে নেক্সট ফ্রাইডে। তাই নয়?

— হ্যাঁ তাই। তা, আমিও যাই না তোমার সঙ্গে? না হয় বিকালের ট্রেনে ফিরে আসব। ঘণ্টা দুয়েকের তো জার্নি?

সাবিরা মেদিনীনিবন্ধ দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে বলল, কী হবে অহেতুক ট্রেন ভাড়া দিয়ে, তখন বললে, তোমার পকেট একেবারে ফাঁকা! তার চেয়ে ...

বাসুদেব মাঝপথেই তাকে থামিয়ে দেয়, না, না, সেরকম কিছু 'অদ্যভক্ষ্যধনুর্গুণ' অবস্থা নয়। তাছাড়া সারাদিন তোমার কম্পানিটারও ...

হঠাৎ ফস করে সাবিরা বলে বসল, কিছু মনে কর না, বাসু। শক্‌ড্ তুমি একাই হওনি। আমিও হয়েছি। নিজের মনের সঙ্গে একটু বোঝাপড়া করে নিতে চাই। ভেবে দেখ : তোমারও সেটা দরকার — একান্তে নিজের মুখোমুখি হওয়া। ভুল বললাম?

বাসুদেব ওর হাতটা তুলে নিয়ে বললে, না সাবিরা। ভুল বলনি কিছু। ঠিকই বলেছ।

— 'সাবিরা?'

— তাই তো তোমার নাম? এখনি বললে যে।

— ও! আমি কিন্তু ভেবেছিলাম, তুমি আমাকে 'সাবি' নামেই ডাকবে — মানে যে কটাদিন আমরা ডাবলিনে আছি — আমার পুরো নামটা তোমার সহ্য হবে না।

— ছিঃ সাবিরা। ওভাবে নিজেকে নিজের কাছেও ছোট করতে নেই। আমরা শুধু হিন্দুও নই, মুসলমানও নই — এমননি শুধু ভারতীয় হিসাবেই আমাদের পরিচয় নয়। আমরা দীন দুনিয়ার মালেকের, ভগবান বা আল্লাতালার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি — মানুষ : ইনসানিয়াৎ!

।। সাত ।।

আলোকোজ্জ্বল একটা সুন্দর রবিবারের অপরাহ্ণ তার সোনা গলানো রোদ নিয়ে বাসুদেবের চোখের সামনে লুটিয়ে লুটিয়ে সন্ধ্যার দিকে ঢলে পড়ল। হস্টেলে আজ একটিও ছাত্র নেই। সবাই ঘর ছাড়া। কেউ সবান্ধবী, কেউ সবান্ধব, কেউ বা একাই। সারাদিনে টিভির নব্-টাও স্পর্শ করেনি। ও শুধু শুয়ে শুয়ে ভেবেছে। কী ওর কর্তব্য? কে দেবে ওকে পথের নির্দেশ? 'জাত-পাত' ও মানে না। গলায় পৈতেটা অবশ্য আছে। দাদু পাঁচ-সাত সেট গ্রন্থী-দেওয়া উপবীত বানিয়ে একটা প্লাস্টিক ব্যাগে জড়িয়ে দিয়েছিলেন। তাই একটা ছিঁড়ে গেলে নতুন একটা গলায় পরে। ঐ গ্রন্থী দিতে ও জানে না। কী যেন একটা মন্ত্র বলতে হয় — 'প্রবরে'র আদি কর্তাদের স্মরণ করে। তা ওর মনে নেই। গলায় ওটা আছে, অভ্যাস

বশে। না থাকলে সেই অশীতিপর বৃদ্ধ ক্ষুণ্ণ হবেন এটা মনে করে। বাসুর মনে আছে, আসবার আগে ও প্রশ্ন করেছিল — খাদ্যাখাদ্য বিষয়ে দাদুর কোনও অনুশাসন আছে কি না। দাদু সেদিক থেকে প্রগতিবাদী। বলেছিলেন, 'তোমার বিবেকই তোমার গুরু। আজীবন আমার সংসারে নিরামিষ খেয়েছ, জানি না বোম্বাইতে তুমি আমিষে অভ্যস্ত হয়েছিলে কি না ; কিন্তু আমি কোনও নিষেধ আরোপ করে যাব না'

কিন্তু তাই বলে একটি মুসলমান নাতবৌ?

মনে আছে, দিদা একদিন সকৌতুকে প্রশ্ন করেছিলেন, পালটি ঘর হোক না হোক, মেয়েটা 'বামুন' তো?

তিনি এ প্রশ্ন করেননি : মেয়েটা 'হিন্দু' তো?

সেটা প্রশ্নের আকারেও ওঁদের মনে কোনদিন আসেনি।

সেটা এতই অচিন্ত্যনীয়।

আর এদিকে সাবিরা খাতুন? কী প্রচণ্ড বঞ্চনার বোঝা মাথায় নিয়ে সে দুনিয়াদারী করে যাচ্ছে! শুধু নিজের মনের জোরে! হার সে মানবে না। কিছুতেই না। মা নেই, বাপ ওকে ত্যাগ করেছে — ওরই সহপাঠিনীকে নিকা করে পাঁচজনের কাছে ওকে হাস্যাস্পদা করেছে। দাদু ওকে ভালবাসেন, কিন্তু শেষ শয্যাশায়ী বৃদ্ধ পরমুখাপেক্ষী জীবনে নিতান্ত অসহায়। শুধুমাত্র স্কলারশিপের জোরে, নিজের উপার্জনে, সে লড়ে যাচ্ছে বিদেশে। সে ভালবেসে ফেলেছিল স্বদেশের একজন স্কলারকে। এই তার অপরাধ! সহস্র বছরের সাহিত্য সংস্কৃতি সভ্যতা আমাদের শিখিয়েছে : 'প্রেম' এমন একটা স্বর্গীয় জিনিস, যে জন্য মানুষের হত্যাপরাধও পাঠকের কাছে মার্জনা পেতে পারে। আইন তা মানুক না মানুক। আর সাবিরার অপরাধটা কী? সে শুধু তার প্রেমাস্পদের কাছ থেকে আত্মপরিচয়টুকু গোপন করেছিল। ভালবাসার লোভে, ভালবাসা পাবার লোভে! মায়ের মৃত্যুর পর এই সুদূর বিদেশে যে যুবতী মেয়েটি ছিল ভালবাসার কাঙাল।

অথচ কী আশ্চর্য — ওদের একান্ত প্রেম তো কোনদিন দেহের সীমানায় এসে ঠেকেনি। সে সুযোগ যে কোনদিন একেবারে আসেনি, তাও তো নয়। সাবিরা সেরকম কোন ইঙ্গিতই দেয়নি। কেন? অনিচ্ছায়? নাকি বাসুদেবের জাত বাঁচাতে? অথবা এই প্রত্যাশায় যে, পুরুষই ও বিষয়ে প্রথম পদক্ষেপ করে। ভাবতে বসে মনে পড়ল : সাবির মুখচুম্বনও কোনদিন করেনি সে! আশ্চর্য! এজন্য ডাবলিন শহরে আড়াল আবডাল খুঁজতে হয় না। প্রকাশ্য রাস্তায়, পার্কে, সমুদ্রবেলায় প্রেমিক-প্রেমিকাকে জড়াজড়ি করে শুয়ে থাকতে দেখেছে। অনবরত চুম্বনরত অবস্থায় দেখেছে তাদের। হাসাহাসি করেছে, ও আর সাবিরা। নিজেরা অগ্রসর হয়নি। কেন? কার অনীহায়?

হঠাৎ মনে পড়ে গেল : দাদু ঐ কথাটা কেন বলেছিলেন সেদিন। গ্রামের কাছে ওদের

পাঁচ পুরুষের ঋণ শোধ করার দায়িত্ব দেওয়া আছে বাসুদেবের স্কন্ধে। কী সেই ঋণ? কে-কেন এত বড় দায়িত্ব ওর অজান্তে ওরই স্কন্ধে চড়িয়ে দিয়ে গেছে? জানতে হবে। বইয়ের র‍্যাক থেকে দাদুর বইখানা টেনে নিয়ে পড়তে শুরু করল আবার।

কতদূর পড়েছিল যেন?

হ্যাঁ, মনে পড়েছে। দাদুর বড়দাদু দামোদরের বিচার চলছে আদালতে। মেজ ভাই বালকৃষ্ণ চাপেকার ধরা পড়ে গেল নিজাম রাজ্যে। ভাইসরয়ের হুকুমে নিজাম সরকার বালকৃষ্ণকে সমর্পণ করলেন ব্রিটিশ পুলিশের হাতে, আর দাবি করলেন পুরস্কারের বিশ হাজার টাকা। ইংরেজ তাতে রাজি হল না। মাত্র দশ হাজার টাকা গেল নিজামের জেব্-এ — বাকি দশ হাজার দেওয়া হল যে লোকটার বাড়িতে বালকৃষ্ণ আশ্রয় নিয়েছিল, সেই বন্ধুস্থানীয় বাড়িওয়ালাকে। বাস্তবে সেই বিশ্বাসঘাতকটাই তো উদ্যোগী হয়ে বালকৃষ্ণকে ধরিয়ে দিয়েছিল।

তখনো পালিয়ে বেড়াচ্ছে আয়ার্স্ট হত্যাকারী রানাড়ে। আর চাপেকার ভাইদের সর্বকনিষ্ঠ বাসুদেব। বড়দা, মেজদা দুজনেই ব্রিটিশের কারাগারে বন্দী। এবার কী করবে বাসুদেব? গাঁয়ে ফিরে যাবার প্রশ্নই ওঠে না। সেখানে সি. আই. ডি. পুলিশের লোক ওৎ পেতে আছে। পুনার সেই মন্দিরেও ওৎ পেতে বসে আছে টিকটিকি।

দাদারা বাসুদেবকে এতদিন কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজের দায়িত্ব দেয়নি। বাচ্চা ছেলে বলে উপেক্ষা করেছে। কাজের মধ্যে কাজ মায়ের মন্দিরটা পাহারা দেওয়া। এখন তো সে কাজও হাতছাড়া। পথে পথে বাউন্ডুলের মতো ঘুরে বেড়ায়। বাসুদেব নিজেই স্থির করল তার কর্তব্য : কেমন করে মেজদা ধরা পড়ল সেটাই সে খুঁজে বার করবে। এটাই তার দেশসেবা। বিভীষণটি হায়দ্রাবাদের বাসিন্দা, মেজদার পরিচিত, কিন্তু লোকটা কে? তার ঠিকানা কী? কে বলবে ওকে? কী করে প্রতিশোধ নেবে? শুধু মেজদার প্রতি ভালবাসায় নয়, সে পরাধীন দেশবাসীকে ডেকে বলতে চেয়েছিল : "শোন ভায়েরা। মায়ের শৃঙ্খলমোচনের এই ব্রতে তোমরা শামিল হতে পার বা না পার — বিশ্বাসঘাতকতা কর না। তোমাদের স্বাধীনতার পথ পরিষ্কার করতেই আমার দাদা, মেজদা প্রাণ দিলেন, আর তোমরা ব্রিটিশের দুমুঠো বকশিসের লোভে তাঁদের ধরিয়ে দিচ্ছ! বাসুদেব চাপেকার বেঁচে থাকতে তা হবে না। আর মনে রেখ, এই বাসুদেব চাপেকারের মৃত্যু নেই। যুগে যুগে আমি ফিরে এসে বিশ্বাসঘাতকদের খতম করে যাব।"

হায়দ্রাবাদে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হল কিশোর বাসুদেব।

প্রয়োজন হল না। দোশরা ফেব্রুয়ারি, টাইমস অব ইন্ডিয়া পত্রিকায় 'সম্পাদক সমীপেষু' বিভাগে প্রকাশিত হল একটি বিচিত্র পত্র। লিখছেন গণেশ শঙ্কর দ্রাভিদ। পত্রলেখক সগর্বে ঘোষণা করছেন নিজের কীর্তি। আর সম্পাদকের মাধ্যমে পেশ করছেন

তাঁর দাবি, ব্রিটিশ সরকারের কাছে। ঐ 02.02.98 তারিখের টাইমস অব ইন্ডিয়ার একটি কাটিং সযত্নে সংকলন করে রেখেছিলেন আমার দাদিমা জীজাবাঈ, তাঁর বেতের ঝাঁপিতে, একটা কৌটায়। নিমপাতার ভিতর লুকিয়ে :

It will be remembered that soon after the tragedy of the Jubilee night a reward of Rs 20,000/- was offered by the Govt. through a public proclamation to any person or persons who could give the police a clue, leading to the detection and final conviction of the murderer. The clue was supplied by me and my brother ; but only half of the amount was divided between me and my brother ... the lynx-eyed officials even did not forget to deduct from the prize money a sum of Rs 260/- as income tax. Surely, I have a right to claim all the ducats offered by the Govt ..."

"আশা করি আপনাদের মনে আছে যে, জুবিলি রাত্রে দুর্ঘটনার পর সদাশয় সরকার বাহাদুর বিশ হাজার টাকার একটি পুরস্কার ঘোষণা করেছিলেন। বলা হয়েছিল, হত্যাকারীকে যে বা যারা ধরিয়ে দিতে পারবে তাকে ঐ অর্থ পুরস্কার দেওয়া হবে। যে সূত্র ধরে পুলিশ অপরাধীকে গ্রেপ্তার করেছে সেই সূত্রটি সরবরাহ করেছিলাম আমি ও আমার ছোটভাই। অথচ বিজ্ঞাপিত পুরস্কারের মাত্র অর্ধাংশ আমাকে ও আমার ভাইকে ভাগ করে দেওয়া হয়েছে... তা থেকে আবার আয়কর বিভাগের মার্জারাক্ষী অফিসারেরা 260/- টাকা আয়কর হিসাবে কেটে নিয়েছে। নিঃসন্দেহে, সরকার ঘোষিত সমস্ত ডুকাট দাবি করার নৈতিক অধিকার আমার আছে।"

বাঃ বাঃ বাঃ! হেসে উঠল কিশোর বাসুদেব। গণেশ দ্রাভিদ তার অনেকটা পরিশ্রম লাঘব করে দিয়েছে। কিন্তু ওর ভাইটি কে? তার কথা তো জানা ছিল না। অনুসন্ধান করে বাসুদেব জানতে পারল দু'ভাইয়ের ঠিকানা। ওরা পুনেতেই আছে এখন। ওরা বালকৃষ্ণের বন্ধুস্থানীয়। ওদের একটা বাড়ি আছে, হায়দ্রাবাদে। সেখানে গিয়ে আত্মগোপন করেছিল মেজদা। ওরা দুভাই বর্তমানে পুনেতে এসে আছে। সরকারি খরচে। কারণ খুনের মামলায় সাক্ষী দিতে হবে। সনাক্তকরণ করতে হবে। বাসুদেব আরও খবর পেল ঐ দুই দ্রাভিদ ভাই নাম করা গুণ্ডা। জালিয়াতি, ডাকাতি আর মিথ্যা সাক্ষী দেবার অপরাধে দুজনেই জেলখাটা আসামী।

কিন্তু ওটা কী লিখেছে গণেশ? 'Ducat' কী? পুনে পাবলিক লাইব্রেরিতে গিয়ে ইংরেজি অভিধান খুলে দেখল। ডুকাট মানে — 'ইউরোপে প্রচলিত এক রকমের স্বর্ণমুদ্রা। এখন তার ব্যবহার নেই' তাহলে ও 'ডুকাট' লিখল কেন? সরকার তো 'ডুকাট' দেবে বলে কোন প্রতিশ্রুতি দেয়নি — স্বর্ণমুদ্রা নয়, রৌপ্যমুদ্রা। তাহলে?

পুনে শহরের একান্তে বাস করেন মহাদেব খাণ্ডেলওয়াল। বাসুদেব যে স্কুলে পড়ত তার অবসরপ্রাপ্ত হেড মাস্টারমশাই। গভীর রাত্রে বাসুদেব গিয়ে হাজির হল তাঁর বাড়িতে। কড়া নাড়ল।

দরজার ছিটকিনি খোলার আগে জানলা দিয়ে বৃদ্ধ হেডমাস্টার মশাই আগন্তুককে চিনে নিতে চাইলেন : কে?

বাসুদেব নিচু স্বরে বললে, আমি স্যার! বাসু, বাসুদেব চাপেকার।

হেডমাস্টার মশাই কপাটটা খুলে দিয়ে সবিস্ময়ে বললেন, তুই? তোর নামে না পুলিশের হুলিয়া আছে?

— তা আছে। তাই তো এত রাত করে আপনাকে বিরক্ত করছি। আমাকে একটা কথার মানে বলে দেবেন স্যার? ইংরেজি কথার?

হেডমাস্টার মশায়ের বাক্য সরে না। এ কী অদ্ভুত পাগল ছেলে শ্রীহরি চাপেকারের। বড় ভাই ফাঁসির আসামী, মেজভাই সদ্য ধরা পড়েছে — নির্ঘাৎ ফাঁসিতে ঝুলবে, আর ঐ কিশোরবয়স্ক ছেলেটি মধ্যরাত্রে এসেছে একটা ইংরেজি কথার মানে জানতে!

দরজাটা ভিতর থেকে বন্ধ করে দিয়ে বলেন, কী কথা?

— Ducat. ডি ইউ সি এ টি!

— হ্যাঁ 'ডুকাট'। ওর মানে একজাতের স্বর্ণমুদ্রা। তা হঠাৎ এ কথার মানে জানতে এই মাঝরাতে আমাকে ঘুম থেকে টেনে তুললি কেন, বাসু?

বাসুদেব তার পকেট থেকে টাইমস অব ইন্ডিয়া কাগজের কাটিংটা বার করে দেখায়। মাস্টারমশায়ের মুখ ম্লান বিষণ্ণ একটা হাস্যরেখা ফুটে উঠল। তাঁর কণ্ঠস্বরও করুণ শোনালো। বললেন, গণেশ দ্রাভিদ এখানে একটু বিদ্যে জাহির করতে 'ডুকাট' শব্দটা ব্যবহার করেছে। প্রভু যীশুকে তাঁর এক শিষ্য ধরিয়ে দিয়ে ত্রিশটি স্বর্ণমুদ্রা বা 'ডুকাট' পুরস্কার স্বরূপ পেয়েছিল। তার নাম "জুডাস"। তাই গণেশ 'ডুকাট' শব্দটা ব্যবহার করেছে — আদর্শ বিশ্বাসঘাতকের মতো।

বাসুদেব নিচু হয়ে হেডমাস্টার মশাইকে প্রণাম করল।

— তুই এত রাত্রে কোথায় যাচ্ছিস? রাতটা এখানেই থেকে যা।

— না, স্যার। যা জানতে এসেছিলাম তা জানা হয়ে গেছে। আপনি কেন অহেতুক বিপদে জড়িয়ে পড়বেন? আমি যাই। সদরটা বন্ধ করে দিন বরং।

পুনে শহরের একান্তে একটি ছোট্ট বাড়ি। গণেশ আর রামচন্দ্র এখানে এসে উঠেছে। সরকারি ব্যবস্থাপনায়। মামলা হচ্ছে পুনের আদালতে। ওদের যে কোন দিন সাক্ষী দিতে ডাক পড়বে। সনাক্তকরণ প্যারেডে হাজির হতে হবে। বাসুদেব রোজই রাতের অন্ধকার

ঘনালে ওপাড়ায় যায়। দুভাইয়ের গতিবিধি লক্ষ্য করে। চিনে নেয় দুজনকে। ভুল না হয়ে যায় অন্ধকারে।

শেষে একদিন দুভাই রুদ্ধদ্বার কক্ষে বসেছে জুয়ার আড্ডায়। মস্তান পার্টির আরও পাঁচ-সাতজন এসে জুটেছে। চারিদিকে ছড়ানো মদের বোতল — রীতিমতো বিলাইতি — দুইভাই ইতিমধ্যেই দশ হাজার টাকা পুরস্কার পেয়েছে। সিকি-দোয়ানি, ডবল পয়সার ঝনৎকার। হঠাৎ দরজায় টোকা পড়ল।

বেরিয়ে এল ওদের মা। দেখল অল্পবয়সী তকমাধারী একজন চাপরাশি। মা বললে : কী চাই?

সেলাম করে চাপরাশিটা বললে, বড়সাহাব রামচন্দ্রজী ঔর গণেশজীকে সেলাম দিয়েছেন। কালকের মামলায় কীভাবে সাক্ষী দিতে হবে তার তালিম নেওয়ার জন্য।

মা ঘরে গিয়ে খবর দিল। গণেশ বেরিয়ে এল। খালি গা, পরনে লুঙ্গি। তাতে বেল্ট। বেল্ট থেকে ঝুলছে একটা রিভলবার। বলল, কৌনসে বড়াসাব?

চাপরাশি আবার সেলাম করে জানালো ডি. এস. পি.-সাব। পি. পি. সাবও আছেন ওখানে। থানায় অপেক্ষা করছেন, স্যার।

— ও আচ্ছা, অপেক্ষা কর। আমরা এখনি আসছি।

এমন ডাক প্রায়ই আসে। ওদের সন্দেহ হবার কোনও কারণ নেই। তৈরি হয়ে নিতে ওরা ঘরের ভিতর ঢুকল। ছদ্মবেশী চাপরাশিও সরে দাঁড়াল অন্ধকারে। পকেট থেকে বার করল বড়দার ফেলে দেওয়া রিভলবারটা। টোটা ভরাই ছিল। সেফটি ক্যাচটা সরিয়ে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইল অন্ধকারে। একটু পরেই বার হয়ে এল দু-ভাই — গণেশ আর রামচন্দ্র।

গণেশ ইতিউতি তাকিয়ে বললে, কই হে? কোথায় তুমি?

অন্ধকার থেকে ভেসে এল প্রত্যুত্তর : এই যে হুজুর! আপনাদের দুজনের পাওনা 'ডুকাট' শোধ করার জন্য এখানে অপেক্ষা করছি।

— কী? কী বললি? বেরিয়ে আয় হারামজাদা।

পরপর দুবার গর্জন করে উঠল বাসুদেবের আগ্নেয়াস্ত্রটা। তিন হাত দূরত্ব থেকে। কাটা কলাগাছের মতো লুটিয়ে পড়ল দুই বিশ্বাসঘাতক। গণেশ মারা গেল তৎক্ষণাৎ। রামচন্দ্র পরদিন।

বাসুদেব আর রানাড়ে ধরা পড়ল একপক্ষ কালের মধ্যে।

বাসুদেব তো দারুণ খুশি। আর তাকে পালিয়ে বেড়াতে হবে না। বড়দা, মেজদা দেখে নিক — সেও কম যায় না।

আহা বড়দাটা নেই। বাসুদেবের কীর্তিটা সে জেনে যেতে পারেনি।

আদালতে শ্রীহরি চাপেকার রোজ এসে এক কোণে বসে থাকতেন। তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্রটির ফাঁসি হয়ে গেছে দশবছর আগে। মধ্যম ও কনিষ্ঠপুত্রের বিচার চলছে। রায় কী হবে তা তো জানাই।

আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে আছে আঠারো বছরের কিশোর। ঠিক যে ভঙ্গিতে দাঁড়াবে পরের দশকে ক্ষুদিরাম, তারপর কানাইলাল। দৃপ্তকণ্ঠে জানিয়ে দিল আদালতকে : আজ্ঞে হ্যাঁ, হুজুর। গণেশ আর রামচন্দ্র দ্রাভিদ নামে দুই বিশ্বাসঘাতককে আমি স্বহস্তে বধ করেছি। 'But I plead not guilty, Your Honour ! Ganesh publicly claimed in the Times Newspaper all the 'ducats' offered by the govt, but he forgot to pay his own dues to the motherland. So did Ramchandra. They knew that they were traitors, Your Honour. Otherwise they would have claimed 'rupees' not 'ducats' like Judas.'

দর্শকদলে এক বৃদ্ধ কোঁচার খুঁটে তাঁর চোখ দুটো মুছলেন। তিনি বাসুদেবের মাস্টারমশাই, মহাদেব খাণ্ডেলকর।

দামোদর চাপেকারের ফাঁসি হল : আঠারই এপ্রিল, 1898. কনিষ্ঠ বাসুদেব মেজদার আগেই চলে গেল : আটই মে, 1899। দামোদরের বন্ধু আয়ার্স্ট হত্যাকারী রানাড়ে : দশই মে, 1899 মধ্যম ভ্রাতা বালকৃষ্ণ তার দুদিন পরে : বারই মে 1899.

বাজে পোড়া তালগাছের মতো দণ্ডাদেশগুলি দর্শকাসনে বসে শুনলেন মায়ের পূজারী শ্রীহরি চাপেকার। তাঁর পাশে এক নতমুখী পুত্রবধূ, আবক্ষ অবগুণ্ঠনে আবৃত তার মুখ। জীজাবাঈ। আর মায়ের পাঁজর ঘেঁষে একটি অষ্টম বর্ষীয় বালক : গোপীনাথ — আমার পিতৃদেব।

বিচারক যখন বাসুদেবের মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা ঘোষণা করলেন, তখন চট করে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে উঠেছিল কিশোর ছেলেটি। হাত দুটি জোড় করে বলেছিল : ধর্মাবতার! আমার দু-দুটি আর্জি আছে! আপনি বিচার করে রায় দিন।

মৃত্যুপথযাত্রীর শেষ আর্জি শোনার একটা রীতি আছে। সম্ভবপর হলে তার শেষ মনোবাঞ্ছা পূরণ করা হয়। বিচারক বললেন, বল?

: আজ আমার বড় আনন্দের দিন। আমাকে একটু মিষ্টি মুখ করিয়ে দেবার হুকুম হোক হুজুর। কোন সেপাইকে বলুন এক হাঁড়ি রসগোল্লা কিনে নিয়ে আসতে। আমি এখানে বসেই খাব। তাহলে বাবা আর বৌঠান খুশি হবেন। ঐ ওঁরা বসে আছেন। ওঁরা দেখবেন।

বিচারক স্তব্ধ বিস্ময়ে মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত ঐ কিশোরটির দিকে দশ সেকেন্ড নির্বাক তাকিয়ে কী যেন সমঝে নিলেন। তারপর বললেন, মঞ্জুর! তোমার দ্বিতীয় আর্জি?

: আপনি দয়া করে আমাকে দু-বার ফাঁসি দেবার হুকুম দিন, ধর্মাবতার। একবার মাত্র ফাঁসি হলে স্বর্গে গিয়ে আমি বড়দাকে কী কৈফিয়ত দেব? কোন্ হত্যাকাণ্ডের জন্য আমার ফাঁসি হল — রামচন্দ্র না গণেশ?

বিচক্ষণ বিচারক ঐ কিশোর মৃত্যুপথযাত্রীর এ আর্জি বিষয়ে কোনও নির্দেশ দিয়েছিলেন কি না, তা মামলার নথিতে কিছু লেখা নেই।

তবে জেলখানার ইতিহাসে লেখা আছে — ফাঁসির দিন ভোররাতে বাসুদেব উঠে স্নান করে, প্রাতঃকালীন আহ্নিক করে, তারপর জননী জন্মভূমির উদ্দেশে প্রণাম জানিয়ে প্রহরীদের জন্যও প্রতীক্ষা করতে থাকে। সূর্যোদয় মুহূর্তে ফাঁসি দেবার কথা। ঊষালগ্নে যখন প্রহরীবেষ্টিত শৃঙ্খলিত কিশোরকে ফাঁসির মঞ্চে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তখন করিডরের এক অন্ধ প্রাচীরের সামনে সে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে। ও জানত কোন্ 'সলিটারি সেল'-এ বন্দী আছে বালকৃষ্ণ। বাসুদেব সেই 'সেল'-এর সামনে হঠাৎ চিৎকার করে ওঠে : মেজদা, জেগে আছ?

প্রাচীরের ওপাশ থেকে প্রত্যুত্তর শোনা যায়। সারা রাতই জেগে বসে আছি রে ছোটু। তোর পায়ের বেড়ির শব্দ শুনব বলে। আমি যে জানতাম আজ তোর অভিষেক!

বাসুদেব বলেছিল, প্রণাম মেজদা, তাহলে যাই?

থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিল প্রহরীর দল!

পাষাণ প্রাচীর ভেদ করে ভেসে এল বালকৃষ্ণের কণ্ঠস্বর : ছি! 'যাই' বলতে নেই রে পাগলা। বৌঠান বলত মনে নেই? বলতে হয় : 'তাহলে আসি?' — ঠিক আছে, আয় ভাই। বড়দাকে বলিস এ হপ্তার শেষাশেষি আমিও আসছি!

জানি, আপনাদের কৌতূহল হচ্ছে জানতে — কারাপ্রাচীরের ভিতরে এত অন্তরঙ্গ গোপন কথা আমি — এই লেখক, দামোদর চাপেকার — কোন সূত্রে জানলাম? এসব কথা তো মামলার নথীতে লেখা নেই, টাইমস অব ইন্ডিয়ার সাংবাদিক তো সেই ভোররাত্রে মেজদাদু আর ছোড়দাদুর কথোপকথন শোনেনি বা কাগজে ছাপতে পাঠায়নি। সেই কৈফিয়ৎটাই দিই :

শ্রীহরি চাপেকার ঐ তিন-তিনটি শেলের আঘাত বুকে নিয়ে বেশিদিন এ ধরাধামে টিকতে পারেননি। বস্তুত ছোড়দাদুর মৃত্যুর পরই তিনি শয্যাশায়ী হয়ে পড়েন। ওঁরা আর গ্রামে ফিরে যাননি। পুনের ঐ অম্বামায়ের মন্দিরের ট্রাস্ট ওঁদের ওখানেই থাকতে দিয়েছিল। আমার পিতৃদেব, গোপীনাথ হরির উপনয়ন ইতিপূর্বেই সারা হয়ে গিয়েছিল। মন্দির ট্রাস্ট ঐ অষ্টমবর্ষীয় বালককেই পূজারী নিযুক্ত করলেন। তাঁর মা — আমার পিতামহী দেবী জীজাবাঈ তাঁকে হাত ধরে পূজাবিধির নানান প্রকরণ শিখিয়ে তোলেন।

সমগ্র পুনে শহরে মাতা জীজাবাঈ-এর একটি বিশিষ্ট সম্মানের আসন ছিল। সামনেই দেশীয় পুলিশদের ছাউনি। সেখান থেকে অনেক ধর্মভীরু প্রহরী মায়ের পূজা দিতে আসত। নির্জন মন্দির চত্বরে তারা মা-জীজাবাঈয়ের শ্রীচরণে অনেক গোপন কথা নিবেদন করে যেত। সেই অভিজ্ঞতা থেকেই ঠাম্মা — জীজাবাঈ, কারান্তরালের এইসব অন্তরঙ্গ কথা তাঁর স্মৃতিমঞ্জুষায় সঞ্চিত করে রেখে যান — যা থেকে আমি এই স্মৃতিচারণ গ্রন্থে তথ্যগুলি লিপিবদ্ধ করছি। অবশ্য জানি না, আমার এই অক্ষম রচনা কোনদিন মুদ্রাযন্ত্রের মুখদর্শন করবে কি না। ইদানীং দেশসেবকদের ধারণা হয়েছে : ভারত স্বাধীন হয়েছে অহিংস সংগ্রামে। তাই অতীতের এইসব শহিদদের কথা আজকাল আর বিশেষ আলোচিত হয় না। দামোদর-বালকৃষ্ণ-বাসুদেব তিন ভাইয়েরই জন্মশতবর্ষ অতিক্রান্ত। সারা ভারত তো দূরের কথা — পুনে মিউনিসিপ্যালিটিরও তা খেয়াল হয়নি।

আগেই বলেছি, আমার ঠাকুমা — পুনেতে তাঁর পরিচয় ছিল 'মাতা জীজাবাঈ' — দীর্ঘজীবী ছিলেন। তাঁর জন্মসাল জানি না, তবে কথা প্রসঙ্গে একদিন বলেছিলেন যে, নয় বছর বয়সে তাঁর বিবাহ হয় এবং সন্তান, অর্থাৎ আমার পিতৃদেবের যখন জন্ম হয় তখন তাঁর বয়স পনের। সে হিসাবে সম্ভবত তাঁর জন্মসাল 1875 — তাঁর প্রয়াণ আমার পুত্র গোপালের জন্মের তিন বছর পর 1947-এর জুন মাসে। মৃত্যুসময়ে তাঁর বয়স হয়েছিল বাহাত্তর। শেষ সময়ে, মৃত্যুর মাস ছয়েক আগে তিনি আমাকে একদিন ডেকে পাঠিয়ে ছিলেন। বলেছিলেন, কাল রাত্রে একটা বড় অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেছি, বিনু। স্বপ্ন স্বপ্নই ; কিন্তু আশ্চর্যের কথা, একই স্বপ্ন আমি দু-দুবার দেখেছি। একবার মধ্যরাত্রে, একবার শেষ রাত্রে। দ্বিতীয়বার স্বপ্নটা শেষ হবার আগে আমার শ্বশুরমশাইকেও দেখেছি — যাঁকে প্রথমবার দেখিনি। আমার মনে হয়েছে : এটা শুধু স্বপ্ন নয়, স্বপ্নাদেশ। তুই গোপালের মা-কেও ডেকে নিয়ে আয়। আমি সব কথা বলে যাই।

আমি ঠাকুমার আদেশ মতো আমার স্ত্রীকে ডেকে নিয়ে এলাম। উনি ওঁর অদ্ভুত স্বপ্ন দর্শনের কথা বিস্তারিত বললেন :

ঘুমের মধ্যে ঠাকুমার মনে হল — উনি অম্বামায়ের মন্দিরে পূজা দিতে গেছেন। ওঁর সঙ্গে রয়েছেন আমার পিতৃদেব, সেই আট বছরের বটু। হঠাৎ দেখলেন মন্দির সোপানের একান্তে একটি অবগুণ্ঠনবতী বসে বসে কাঁদছে। ঠাম্মা তাঁকে প্রশ্ন করলেন, তোমার কী হয়েছে মা, কাঁদছ কেন এমন করে? অবগুণ্ঠনবতী তখন তাঁর ঘোমটা খুলে ঠাকুমার দিকে তাকিয়ে বললেন, তুমি আমাকে চিনবে না মা, তোমার শ্বশুর আমাকে চিনত, তোমার সোয়ামী আমাকে চিনত।

ঠাম্মা বললেন, বেশ তো, পরিচয় দিন। তাহলেই চিনব।

— আমি তোমাদের গ্রামলক্ষ্মী। তোমার শ্বশুর গ্রাম ছেড়ে সেই যে চলে এল তারপর

আর কেউ গাঁয়ে ফিরে গেল না। তোমাদের ভিটেয় পিদিম জ্বলে না। ঝড়ে জানলার পাল্লাগুলো আছাড়ি বিছাড়ি করতে থাকে। আমার দুচোখ জলে ভরে আসে। তা হ্যাঁ গা, তোমরা কেউ আর গাঁয়ে ফিরে যাবে না?

ঠাম্মা তখন সজল নয়নে সেই গ্রামলক্ষ্মীকে বলেছিলেন, আপনি তো জানেনই মা, আমার কী অবস্থা! স্বামী শ্বশুর চলে গেছেন, দুই উপযুক্ত দেবর ...

বাধা দিয়ে গ্রামলক্ষ্মী বলেছিলেন, জানি রে, সব কথাই জানি। তাহলে কথা দে, তোর ছেলে বা নাতি কেউ যেন গাঁয়ে ফিরে এসে সন্ধে দীপ জ্বালার ব্যবস্থাটা করে। কথা দে —!

এই স্বপ্ন ঠাম্মা সে রাত্রে দুবার দেখেন। দ্বিতীয়বার স্বপ্নের শেষাশেষি ওর শ্বশুর শ্রীহরি চাপেকারকেও আবছা দেখতে পান। তিনিও একই রকম প্রত্যাদেশ করে যান। ঠাম্মার কথা শুনে আমি বলেছিলাম, আমার অবস্থা তো জানই। এই মন্দিরের পূজারী হিসাবে যা পাই তাতে কোনক্রমে গ্রাসাচ্ছদনই চলে না। তবু পুনে শহরে এই মাথা গোঁজার আশ্রয়টা ছিল বলে ...

আমাকেও বাধা দিয়ে ঠাম্মা বলেছিলেন, আমি সবই বুঝি রে বিনু। বেশ তো, গোপাল বড় হলে তাকে গ্রামে ফেরত পাঠিয়ে দিস। গ্রামলক্ষ্মী মায়ের কাছে আমার কথা দেওয়া আছে। তাছাড়া আমার শ্বশুরের আদেশ ...

দুর্ভাগ্য আমার, গোপাল বড় হল বটে, কিন্তু চির রুগ্ণ। শিশুকাল থেকেই তার হাঁপানির রোগ। এ রোগের কোন চিকিৎসাও নেই। সে রোজগার করবে কি? আমারই পোষ্য হয়ে রইল চিরটাকাল। তবে ঈশ্বর করুণাময়। মাত্র ছাব্বিশ বছর বয়সেই তাকে কোলে টেনে নিলেন। গ্রামলক্ষ্মীর ঋণ আমাদের বংশে আর শোধ করা হল না।

।। আট ।।

ট্রেনটা লিমেরিক স্টেশনে পৌঁছল কাঁটায় কাঁটায় সকাল আটটায়। বাসুদেব জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে প্ল্যাটফর্মে দাঁড়ানো যাত্রীদের লক্ষ্য করছিল। এটাই লোকাল ট্রেনটির শেষ স্টেশন। দশ মিনিট পরে যে পথে এসেছে, সে পথেই ফিরে যাবে, ডাবলিনে। ফলে স্টেশনে যাত্রী সমাগম যথেষ্ট। আজ শনিবার। অনেকে সকালের ট্রেনে ডাবলিন যেতে চায় সপ্তাহান্তটা শহরে কাটাতে।

অবশ্য কামরার শেষ যাত্রীটি নেমে যাওয়ার আগে প্ল্যাটফর্মে দণ্ডায়মান প্রবেশার্থীরা কোন হুড়োহুড়ি করল না। বাসুদেব তার সুটকেশটা হাতে নিয়ে নেমে পড়ল। ইতিউতি

তাকিয়ে দেখল — দীর্ঘদেহী আইরিশম্যানদের ভিড়ে সাবিরাকে নজর করতে পারল না। পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল নির্গমন দ্বারের দিকে। তখন ওকে দেখতে পেল।

সাবিরা বুদ্ধিমতী। জানে, প্ল্যাটফর্মে তাকে দেখতে না পেলে ঐ একটিমাত্র নির্গমনদ্বার দিয়েই বাসুদেবকে স্টেশান চত্বরের বাইরে আসতে হবে। দূর থেকে হাত তুলে সাবিরা বললে, হাই!

কাছে এসে বললে, প্রাতরাশ সেরে রওনা হয়েছ?

— না! সময় পেলাম কোথায়? স্টেশানে শুধু এককাপ চা খেয়েছি।

— তাহলে এস, রেলওয়ে কাফেটেরিয়াতে যাই। বাইরের দোকানের চেয়ে স্টেশান ক্যানটিনে সব কিছুই সস্তা। এটা রেলওয়ে কর্তৃক সাবসিডাইজড।

বাসুদেব বললে, বাপরে! এক হপ্তা আগে এসে অনেক খবর জেনে ফেলেছ তো!

— জী হাঁ। বিদুর যুধিষ্ঠিরকে কী উপদেশ দিয়েছিলেন মনে নেই? — 'নতুন কোন জায়গায় গেলে প্রথমেই তার চারপাশ এবং বিশেষ করে সেখান থেকে পালাবার রাস্তাগুলো চিনে নিও!'

বাসু হাসতে হাসতে বলল, হায় আল্লাহ্! তুমি কাফেরদের ঐ ধর্মপুস্তকগুলো এত খুঁটিয়ে পড়ে রেখেছ?

— জী নেহী খোদাবন্দ্। আমরা যখন কলেজে পড়ি, তখন চোপড়া-সাবের 'মহাভারত' ছিল টিভির হিট সিরিয়াল। ঈভন ইন লক্ষ্ণৌ।

ওরা দুজনে গিয়ে বসল রেলওয়ে ক্যান্টিনে। সেলফ সার্ভিস আয়োজন। বানরুটি, স্যালাড আর কফি নিয়ে বসল একটা কোনায়। রেস্তোরাঁটা প্রায় ফাঁকা। তিন মিনিট আগেও গমগম করছিল। একটা চেয়ারও তখন খালি ছিল না। তাঁরা এতক্ষণে ঐ ডাবলিন গামী লোকাল ট্রেনের গর্ভে।

সাবিরা বললে, কাল টেলিফোনেই তোমাকে মোটামুটি জানিয়েছি। দাদুর অ্যাটর্নি বন্ধুর যে ক্লায়েন্ট লিমেরিকে আছেন — মানে যাঁর কাছে তোমার-আমার কেস সুপারিশ করেছেন, তিনি লিমেরিকের একজন স্বনামধন্য ব্যক্তি — লিমেরিকের এম. পি. মিস্টার জার্ডিন ম্যাকলিয়ড। পর পর দু'বার এখান থেকে ইলেকশান জিতে ডেইল-এ (আইরিশ লোকসভা) সাংসদ হয়েছেন। রিপাবলিকান প্রিমিয়ার ড্যাক লিঞ্চের ডানহাত ছিলেন একসময়। 1973 -এ লিঞ্চ ইলেকশান হেরে যেতেই উনি পার্টি বদলিয়ে আই. আর. এ. পার্টির একজন স্থানীয় নেতা হয়ে উঠেছেন। তিনি বহু উপরতলার মানুষ। তাঁকে আমি চাক্ষুষ এখনো দেখিনি। তবে লিমেরিকে তাঁর অনেক, অনেকগুলি ব্যবসা আছে। সেগুলির দেখাশোনা করেন এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক, জে. জে. ম্যাককার্টনে। তিনিই আমার যাবতীয় ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। ডেমগ্রাফিক সার্ভের কাজ জোর কদমে হচ্ছে। সপ্তাহে

পাঁচদিন — সাড়ে নয়টা থেকে সাড়ে পাঁচটা। শনি-রবি ছুটি। প্রতি সপ্তাহে ওরা আমাকে দুশ দশ পাউন্ড করে দিচ্ছে। আইরিশ পাউন্ড। মানে প্রতি ওয়ার্কিং ডে-তে প্রায় সাতচল্লিশ মার্কিন ডলার।

বাসু বললে, থাকছ কোথায়? রাত্রিবাস?

— শহরের পশ্চিমে। স্যানন নদীর মোহনায়। এক বুড়ি রোমান ক্যাথলিকের বৈঠকখানায় — শুধু 'বি অ্যান্ড বি'।

— বেড অ্যান্ড ব্রেকফাস্ট?

— হ্যাঁ! বিনা পেন্স-এ। শর্ত এই : ব্রেকফাস্টের বাজার করে বুড়ি। কিন্তু আমাকে দুজনের মতো প্রাতরাশ বানাতে হয়। একটা আমি খাই একটা মোরিয়াম। তবে বাসনপত্র ওই মেজে রাখে। মায় আমার খাবার প্লেটটাও। আর রবিবার ওর ঘরদোর ভ্যাকুয়াম ক্লিনিং করে দিতে হয়। দুপুর আর রাতের খাবার বাইরে খাই।

— আমার চাকরিটা কী জাতীয়? কবে থেকে? কত পাব?

— ম্যাককার্টনে সাহেব তোমাকে আপাতত একটা 'ডেমলিশন স্কোয়াডে' কাজ দিতে পারেন। ইম্মিডেটলি।

— 'ডেমলিশন স্কোয়ার্ড' মানে?

— শোন বুঝিয়ে বলি। সাংসদ-সাহেব শহরতলিতে এক লপ্তে একটা বিরাট প্লট কিনেছেন। পাহাড়ের একটা ঢালু জমি। একশ একরের কাছাকাছি। ঐ শ্যাননের ঢালুতেই ...

— শ্যানন কী? একটা নদী নয়? একটু আগে বললে যে শ্যাননের মোহনায়।

— হ্যাঁ, শ্যানন নদীও বটে পাহাড়ও বটে। শ্যানন পাহাড়কে বেষ্টন করে নদী এই লিমেরিক শহর থেকে পাঁচ কিলোমিটার দূরে অ্যাটল্যান্টিকে পড়েছে। জায়গাটা অতি মনোরম। শ্যানন পাহাড়ের উচ্চতা বাইশ'শ ফিট। সমুদ্র ও নদী সঙ্গমের দিকে মুখ ফেরা ঢালু জমিতে 'টেরেসড হাউসিং' হবে। যেমন আছে আমাদের সিমলায়, উটিতে বা দার্জিলিঙে। বহু কোটি ডলারের পরিকল্পনা। তবে যে জমিটায় এই মালটিস্টোরিড বাড়িগুলো তৈরি হবে — ফাইভ স্টার হোটেল, শপিং কমপ্লেক্স ইত্যাদি — যেখানে পূর্ব জমানার কিছু কিছু ভাঙা পরিত্যক্ত বাড়ি-টাড়ি আছে। প্রথমে সেগুলি ভেঙে ফেলা দরকার। ভাঙার কাজ চলছে। সেই ডেমলিশন স্কোয়াডে দৈনিক হারে মজুরের কাজ করতে হবে। ওদের সপ্তাহে সাতদিনই কাজ হয়। সাবাথ ডে বলে কিছু নেই। ম্যাককার্টনি বলেছেন, দৈনিক পঁচিশ পাউন্ড করে মজুরি দেওয়া হবে। সকাল ছয়টা থেকে সন্ধ্যা ছয়টা কাজের সময়। মাঝে দুবার খাবার ছুটি, একঘণ্টা করে। ট্রান্সপোর্ট কোম্পানির খরচে।

বাসুদেব বললে, এগ্রিড! সপ্তাহে পৌনে দুশো পাউন্ড।

— তা থেকে খাই খরচটা বাদ দাও।

— তা তো বাদ দিতেই হবে। শুধু খাওয়া নয়, খাওয়া ও থাকা।

সাবিরা বলল, না। থাকার খরচ তোমার লাগবে না। তোমার 'বেড অ্যান্ড ব্রেকফাস্ট' ফ্রি!

— সে আবার কী? ধর্মশালা-টালা আছে নাকি এখানে?

— না। কিন্তু ... কী বলব? ঝোঁকের মাথায় একটা দুঃসাহসিক কাজ করে ফেলেছি। তুমি এটা নিতেও পার, প্রত্যাখ্যানও করতে পার। আমি কিচ্ছুটি মনে করব না।

— ব্যাপার কী?

সাবিরা নতমুখে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল। তারপর খুলেই বলল সবকথা :

বিশ-ত্রিশ বছর আগে আইরিশ রিপাবলিকের যে কোন শহরে — কর্ক, লিমেরিক, ওয়েক্সফোর্ড, গলওয়ে, অ্যাথলোন — ডাবলিনে তো বটেই — সহজেই অচেনা-অজানা বহিরাগত মানুষ 'শয্যা ও প্রাতরাশ'-এর শর্তে শহরবাসীর সাময়িক অতিথি হতে পারত, অর্থের বিনিময়ে। তারপর অবস্থাটা রাতারাতি বদলে গেল। রাজনৈতিক নেতারা মস্তানদের উপর ক্রমে ক্রমে নির্ভরশীল হতে শুরু করলেন। ইতালি বা অন্যান্য স্থান থেকে 'মাফিয়ার' দল এগিয়ে এল রাজনীতি-ব্যবসায়ীদের মদত দিতে। শাসকদল — ঠিক ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের গদি-আসীনদের মতো—পুলিশকে নির্দেশ দিল পার্টি-মস্তানদের বাদ দিয়ে দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে হবে। ফলে কোন শহরেই আজ মধ্যবিত্ত মানুষ অজানা-অচেনা লোককে অতিথি রাখতে চায় না। অসংখ্য ঘটনা ঘটে গেছে — অতিথি মধ্যরাত্রে আগ্নেয়াস্ত্র দেখিয়ে গৃহস্বামীর সর্বস্ব লুঠ করে নিয়ে গেছে। পুলিশ চোখ বুজে থেকেছে — কারণ, অপরাধী রাজনৈতিক নেতার চেলা-মস্তান।

এজন্যেই দুদিন ধরে ঘুরে ঘুরে সাবিরা তার বন্ধুর জন্য একটা 'বি অ্যান্ড বি'র বন্দোবস্ত করে উঠতে পারেনি। শেষমেশ ওর গৃহস্বামিনীকে একটি ঝাড়া মিথ্যার টোপ ফেলে পরীক্ষা করতে চেয়েছিল : সাবিরার স্বামী ডাবলিনে আছে। ট্রিনিটি মেডিকেল কলেজের ছাত্র। পাস করা ডাক্তার। এম. ডি. করতে এসেছে। লঙ ভেকেশানে সে লিমেরিক-এ একটা অস্থায়ী কাজ পেয়েছে অথচ থাকবার জায়গা পাচ্ছে না।

বুড়ি আগ বাড়িয়ে বলেছিল, তা এখানে অন্য বাড়ি খোঁজার কী দরকার? তোমরা যখন 'ম্যান অ্যান্ড ওয়াইফ' তখন আমার গেস্টরুমেই থাকতে পার। বেড ফ্রি, ব্রেকফাস্টও ফ্রি — যেহেতু তুমিই তিনজনের ব্রেকফাস্ট বানাবে। ওকে শুধু আমার বাগানটা সাফা রাখতে হবে। গরমের দিনে গাছে জল দিতে হয়। সেটা আজকাল আর আমি পেরে

উঠি না। বাতের ব্যথায়।

সাবিরা এক কথায় রাজি হয়ে গেছিল। খুশি হয়ে বলেছিল, মিস্ মোরিয়াম, তুমি যখন এতটা দয়া দেখালে তখন বলি, আমার তো সন্ধ্যাবেলা ছুটি হয়ে যায়, আমি ফেরার পথে রাতে তিনজনের মতো প্যাকেট ডিনার কিনে আনব। আমরা দুজন তোমার ডিনারটার ব্যয়ভার বহন করব। একসাথে নৈশাহার করব।

বুড়ি তো দারুণ খুশি।

বাসুদেব চুপচাপ শুনে যাচ্ছিল। হঠাৎ সাবিরা বলে ওঠে, বিলিভ মি, বাসু। নিতান্ত নিরুপায় হয়েই এ ব্যবস্থাটা আমাকে করতে হয়েছে। তুমি রাজি না হলে সারা দিনে খুঁজে দেখ, তোমার মাথা গোঁজার আশ্রয় পাও কি না। হোটেল অবশ্য আছে; কিন্তু তার চার্জও অত্যন্ত বেশি।

বাসু অবাক হয়ে বলল, আমি রাজি নাও হতে পারি এমন অদ্ভুত কথা তোমার মনে হল কেন, সাবিরা?

— যদি তুমি আমার সঙ্গে এক ঘরে শুতে রাজি না হও!

— কেন? আমার ভার্জিনিটি হারাবার ভয়?

সাবিরা বলল, ডোন্ট বি নটি! কী স্থির করলে বল?

— স্থির আবার কী করব? নাটকটা মঞ্চস্থ করছ তুমি। আমাকে যে চরিত্র দিয়েছ সেটাই অভিনয় করে যাব গোটা লং ভেকেশান। সচ্ছন্দে শুধু নয়, সানন্দে। এ তো আশাতীত প্রাপ্তি।

মুচকে হাসল সাবিরা। কথাপ্রসঙ্গ বদলাতে বলল, ও! আর একটা কথা! ইতিমধ্যে জানতে পেরেছি, তোমাদের ঐ 'ডেমলিশন স্কোয়াড'-এর যে গ্রুপ লিডারটি আছে, সর্দার আর কি — সে লোকটা গোটা লিমেরিক শহরের এক কুখ্যাত মস্তান। সবাই জানে, সে হচ্ছে সাংসদ মিস্টার জার্ডিন ম্যাকলিয়ডের দক্ষিণ হস্ত। লোকটা চরিত্রহীন, মদ্যপ, তার নামে একাধিক পুলিশ কেস আছে — ডাকাতি, রেপ, এমনকি খুন। কিন্তু যে কোন কারণেই হোক মামলা আদালতে ওঠে না। ও জামিনে আছে। ম্যাকলিয়ড যদি আগামী বারও ইলেকশনে জেতেন তাহলে কেউ ওর চুলের ডগা ছুঁতে পারবে না। লোকটাকে আমি দূর থেকে দেখেছি। ম্যাকলিয়ড হারলেও কেউ অবশ্য ওর চুলের ডগা ছুঁতে পারবে না।

— সেটা কেন?

— দুটো কারণে। প্রথমত ম্যাকলিয়ড নির্বাচনে হারলে ও তৎক্ষণাৎ তাঁর প্রতিপক্ষের শিবিরে যোগ দেবে। লোকটা প্রফেশনাল মাস্‌লম্যান — বিবেকের বালাই নেই। প্রতিপক্ষ — তিনি যেই হোন — ওকে সানন্দে লুফে নেবেন। দ্বিতীয়ত — বিগ বিলি

র‍্যান্ডসন-এর চুলের ডগা ছুঁতে হলে একটা টুল লাগবে। ওর হাইট ছয় ফুট তিন ইঞ্চি। বিরাট দৈত্য একটা। লিমেরিকে মানুষ আড়ালে ওকে বলে : 'সেলফিশ জায়েন্ট'!

ম্যাক্‌কার্টনে সাহেব চোখ থেকে চশমাটা খুলে টেবিলে রাখলেন। আগন্তুককে এক নজর দেখে নিয়ে বললেন, বসো ঐ চেয়ারটায়।

বাসুদেব নির্দেশমতো ওঁর দর্শনার্থীর চেয়ারে বসল। ওকে অকুস্থলে নামিয়ে দিয়ে সাবিরা তার 'ডেমগ্রাফিক সার্ভে টিমের' কাজে যোগ দিতে চলে গেছে। মিস মোরিয়ামের ঠিকানাটা দেওয়া আছে। কথা আছে, সন্ধ্যা সাড়ে পাঁচটা নাগাদ ও বাসে করে লিমেরিক স্টেশনে চলে আসবে। সেখানে লেফট্ লাগেজ রুমে রাখা আছে ওর সুটকেশটা। সন্ধ্যা সাড়ে পাঁচটা নাগাদ সাবিরাও এসে যাবে স্টেশনে। সে জরিপ পার্টি থেকে একটি জিপ গাড়ি পেয়েছে। নিজেই চালায়। ও এসে বাসুদেবকে নিয়ে যাবে তার নৈশাবাসের ঠিকানায় — শ্যানন নদীর ধারে মিস মোরিয়ামের ডেরায়।

ম্যাক্‌কার্টনি বললেন, আয়াম সরি ইয়াং ম্যান। তুমি একজন পাস করা ডাক্তার। এম. ডি. করতে এসেছ স্কলারশিপ নিয়ে। কিন্তু এই কাজটাই আমার হাতে আছে। তুমি কি পারবে? মেহনতী মজদুরের কাজ করেছ কখনো?

বাসু বলল, না স্যার। তবে আমি দারিদ্র্যের মধ্যেই মানুষ হয়েছি। দৈহিক পরিশ্রম করতে কুণ্ঠিত নই। তাছাড়া ফাইনাল পরীক্ষার আগে আমার কিছু অর্থের প্রয়োজন। সাবিরা, আই মিন যে মেয়েটি আপনার কাছে এসেছিল তার কাছে সব কথা শুনেছি আমি।

— শোন ডক্টর। পরের মুখে ঝাল খাওয়ার কোনও প্রয়োজন নেই। শর্তগুলো না হয় আবার বলি। তুমি স্বকর্ণে শুনে আমাকে জানাও যে, তুমি স্বীকৃত। প্রথম কথা : কাজটা নিছক দৈহিক মজদুরির। ডেমলিশন ওয়ার্ক। আপাতত কাজ হচ্ছে শ্যানন পাহাড়ের ঢালুতে একটা ডিস্‌টিলারি ভাঙার কাজ। সকাল ছয়টায় তোমাকে স্টেশনের পাশে তিন নম্বর গোডাউনের গেটের কাছে আসতে হবে। সেখানে একটা ট্রাক আসবে। এই কাগজে ট্রাকের নম্বরটা লেখা আছে। তোমার মতো আরও দশ-বারোজন মেহনতি মানুষ আসবে। তোমাদের স্কোয়াড্রন লিডারের নাম : বিগ বিলি র‍্যান্ডসন। তাকে আমি জানিয়ে দেব, তুমিও আজ থেকে জয়েন করছ। তোমাকে দৈনিক পঁচিশ আইরিশ পাউন্ড দেওয়া হবে — দিনের শেষে — ক্যাশ ডাউন। সপ্তাহে সাত দিনই কাজ। সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত। মাঝে দু'ঘণ্টার টিফিন ব্রেক। তুমি রাজি?

— হ্যাঁ, স্যার।

— তুমি জানতে চাইলে না, তবু এটা তোমাকে জানিয়ে দেওয়া আমার কর্তব্য : ক্যাশ ডাউন মানে তোমাকে এজন্য ইনকাম ট্যাক্স দিতে হবে না। রসিদ দিতে হবে না।

তোমার জন্য কোনও ন্যাশনাল হেলথ ইন্সিওরেন্স কার্ড থাকবে না। আমাদের পাকা খাতায় তোমার নামটাও থাকবে না। ও. কে?

— ঠিক আছে স্যার।

— তুমি গ্রীষ্মের ছুটিতে তিন সপ্তাহের অন্য কাজ করতে আসছ? তাই তো? তারপর তুমি ডাবলিনে ফিরে যাবে!

— ইয়েস স্যার?

— তুমি ভারতবর্ষ থেকে ম্যাক্‌মিলান স্কলারশিপে এম. ডি. করতে এসেছ। এখন আছ ট্রিনিটি কলেজের ফরেন স্টুডেন্স হস্টেলে। ঠিক কি না?

— আজ্ঞে হ্যাঁ, ঠিক কথা।

— তোমার পাসপোর্টটা দেখাও। নম্বারটা আমার দরকার।

বাসুদেব বিনা বাক্যব্যয়ে তার পাসপোর্টটা বার করে দিল। ম্যাক্‌কার্টনি তা দেখে প্রয়োজনীয় তথ্য টুকে নিয়ে সেটা ওকে ফেরত দিয়ে বললেন, তোমার পুরো নাম, ডক্টর বাসুদেব হ্যারি চাপেকার? ওয়েল, আমরা তোমাকে শুধু 'হ্যারি' বলেই ডাকব। আমাদের খাতাতেও ঐ নামটুকু থাকবে, বুঝলে? যেহেতু আমি অ্যাট-সোর্স কোন ইনকাম ট্যাক্স কাটছি না। কাল সকাল ঠিক ছয়টার সময় স্টেশনের কাছে তিন নম্বর গোডাউনের সামনে অপেক্ষা কর। এই কাগজে ট্রাকের নাম্বারটা লেখা আছে এটা কাছে রাখ। উইশ য়ু বেস্ট অফ ল্যক!

ধন্যবাদ জানিয়ে বাসুদেব উঠে দাঁড়ালো। দ্বারের কাছে পৌঁছেছে হঠাৎ পিছন থেকে ম্যাক্‌কার্টনি ডেকে উঠলেন, ডক্টর হ্যারি।

বাসুদেব ঘুরে দাঁড়ালো : ইয়েস, স্যার?

একটু ইতস্তত করে বৃদ্ধ বললেন, তুমি বিদেশী। পাস করা মেডিকেল ম্যান। আমার বিবেক বলছে, তোমাকে আরও একটা কথা আগে থেকেই জানিয়ে রাখা আমার কর্তব্য।

— বলুন স্যার?

— তোমাদের গ্রুপ লিডার, আইমিন, 'ডেমলিশন স্কোয়াডের' ইনচার্জ, বিগ বিলি র‍্যান্ডসন একটু 'ইয়ে' মতো। 'উইয়ার্ড' চরিত্র। ওর মনটা ভাল, কিন্তু খামখেয়ালি। আপাতদৃষ্টিতে তাকে একটু রূঢ় মনে হতে পারে। তবে সে অত্যন্ত প্রভাবশালী। আর তাছাড়া — তোমাকে জনান্তিকে জানাচ্ছি, ডক্টর : মালিকের দক্ষিণ হস্ত।

— থ্যাঙ্কু স্যার, ফর দ্য অ্যাডভাইস।

।। নয় ।।

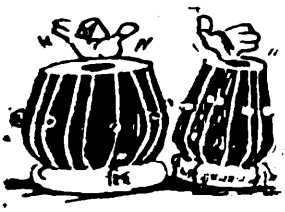

সারাটা দিন শহরে চক্কর মেরেছে। দুপুরে একটা সস্তা 'পেন্স হোটেলে' মধ্যাহ্ন আহার সেরেছে। 'পেন্স হোটেল' শব্দটা ওদেশে প্রচলিত নয়। 'পাইস হোটেলের' বাংলা করলাম আর কি — কারণ ওখানেও ঐ রকম প্রতি হাতা সুপের, প্রতি পিস বান রুটির আলাদা দাম ধরা হয়। লিমেরিক ছোট শহর। রাজধানী ডাবলিন থেকে দুশো কিমি দূরে। লোকসংখ্যা এক লক্ষের কম। তবে একটা য়ুনিভার্সিটি আছে, আছে এঞ্জিনিয়ারিং কলেজ। কলকারখানাও বেশ কিছু আছে — সিগারেট তৈরির, মদের ডিসটিলারি, এছাড়া একটা কাপড়ের মিল। এ সবই শহরতলিতে। চিমনির ধোঁয়ায় শহরকে কালিমালিপ্ত করতে পারে না তারা। শ্যানন নদীর ধারে, শ্যানন পাহাড়ের সানুদেশে সাংসদ মশায়ের টুরিস্ট কমপ্লেক্স সম্পূর্ণ হলে এখানে ভিনদেশী টুরিস্টদের আগমনও বৃদ্ধি পাবে। শ্যাননে সম্প্রতি একটি এয়ারস্ট্রিপও তৈরি হয়েছে।

সন্ধ্যা পাঁচটা নগাদ বাসুদেব রেলওয়ে স্টেশানে এসে পৌঁছালো। লেফট লাগেজ ড্রয়ার থেকে চাবি খুলে সুটকেশটা বার করল। চাবিটা কাউন্টারে জমা দিয়ে ডিপজিট মানি ফেরত নিল। তারপর স্টেশানের বাইরে এসেই দেখে সাবিরা জিপ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

— কী হল? চাকরিটা অ্যাকসেপ্ট করলে?

— শ্যিত্তর! দিনে পাঁচিশ পাউন্ড! সোজা কথা? ট্যাক্সও কাটবে না।

— তাহলে উঠে এস জিপে।

— আমরা স্ট্রেট মিস মোরিয়ামের ডেরায় যাব, নাকি একটু সান্ধ্য ভ্রমণ করতে পারি, শ্যাননের ধারে?

— আজ্ঞে না, স্যার। আমরা এখন বাজারে যাব। অনেক কিছু কেনাকাটা করতে হবে। তোমার জন্য একজোড়া সার্ভিস বুট-জুতো — মিলিটারি ডিস্‌পোজালে পাওয়া যাবে। একটা ওভরঅল। তোমার এই জামা-জুতো চলবে না।

বাসুদেব বললে, তাছাড়া আমাদের তিন প্যাকেট তৈরি ডিনার নিয়ে যেতে হবে, শর্ত অনুযায়ী। রাতের খাবার।

— না! আজকে অন্য ব্যবস্থা। আমি কাঁচা বাজার করে নিয়েছি। বুড়ির কিচেনে আমি তিনজনের মতো রান্না করব। তুমি তো 'ভেজ'? তোমার জন্য আলাদা পনীর আর স্পিন্যাচ নিয়েছি। ডিম খাও তো তুমি? ডিম তো নিরামিষ?

বাসুদেব বললে, তোমাকে যেন আজ বড় খুশি খুশি দেখাচ্ছে, সাবিরা। যেন চাকরি করতে নয়, লিমেরিকে এসেছ হনিমুনে!"

চোখ বড় বড় করে তাকালো সাবিরা। বললে, পুরুষ জাতটাই নেমকহারাম। তোমার জন্য এত করছি। আর তুমি আমার 'লেগ পুলিং' করছ।

বাসুদেব বললে, সে কী গো? তুমি হচ্ছ নাটকের পরিচালিকা। চরিত্র বণ্টন তুমি করেছ, আমার পরামর্শ না নিয়েই। তোমার নির্দেশে লিমেরিকে আমরা 'ম্যান অ্যান্ড ওয়াইফ'। ফলে ওটা কোন অপরাধই নয়।

— কোনটা?

— পরস্ত্রীর লেগ পুলিংটাই ভালগার। নিজের স্ত্রীর লেগ ধরে টানলে ...

— ডোন্ট বি ভালগার, বাসু।

মিস মোরিয়ামকে ভারি ভাল লাগল বাসুদেবের। খুনখুনে বুড়ি। হাসিখুশি মানুষ। বললেন, আমার বাইরের ঘরে 'জন্‌কে খাট'। ওতে দুজনের পক্ষে শোয়া সম্ভবপর নয়। তুমি এক কাজ কর, ডক্টর হ্যারি। এই অ্যালুমিনিয়াম-সিঁড়িটা বেয়ে আমার লফ্‌টে উঠে যাও। ওখানে একটা অ্যালুমিনিয়ামের পোর্টেবল্ 'টেপ কট' আছে। ওটা নামিয়ে নিয়ে এস।

বাসুদেব লফ্‌ট থেকে নেয়ারের খাটটা নামিয়ে আনল।

সাবিরা ঢুকল বুড়ির কিচনেটে। বুড়ি আপত্তি জানালো — এতসব হাঙ্গামা করতে গেলে কেন, বলত? বাজার থেকে তিনটে প্যাকেট-ফুড নিয়ে এলেই তো ল্যাঠা চুকে যেত!

বাসুদেব বলল, 'নৈশাহার' ব্যাপারটা কি 'ল্যাঠা চুকানো'? আমরা, ভারতীয়রা মনে করি, শরীর একটি মন্দির। তুমি যেমন চার্চে গিয়ে মোমবাতি জ্বালো, আমরা তেমনি নিষ্ঠাভরে শরীরকে খাদ্য যোগাই।

বুড়ি খুশি হল। বলল, পণ্ডিতের মতো কথা বলেছ তুমি।

সাবিরা রান্নাঘর থেকে বললে, তাছাড়া আমার রান্নার কেরামতিটাও তো হ্যারিকে জানানো দরকার।

বুড়ি বিস্মিত হয়ে বললে, তুমি তোমার 'হ্যারি'কে এ পর্যন্ত কোনদিন রেঁধে খাওয়াওনি? বল কি গো?

সাবি মনে মনে জিব কাটে। বাসু ম্যানেজ করে, ও বলতে চাইছে, আয়ার্ল্যান্ডে আসার পর তো নিজে হাতে আমাকে রেঁধে খাওয়াবার সুযোগ পায়নি। ও থাকে মেয়েদের হস্টেলে, আমি ছেলেদের। বুঝলে না, গ্র্যানি?

— গ্র্যানি? য়ু কল মি গ্র্যানি?

— হ্যাঁ বললাম। অন্যায় করেছি? আমরা ভারতীয়রা একটা সম্পর্ক পাতাতে না পারলে তৃপ্তি পাই না। তুমি আমার ঠাকুমার বয়সী। তোমাকে তোমাদের দেশের কায়দায় মিস মোরিয়াম বলতে বিশ্রি লাগে আমার।

বুড়ি জবাব দিল না। চুপ করে কী যেন চিন্তা করতে থাকে।

— তুমি রাগ করলে, গ্র্যানি? এ ডাকটা পছন্দ নয় তোমার?

বুড়ি চোখ থেকে চশমাটা খুলে তার ফ্রকের প্রান্ত দিয়ে মুছতে মুছতে বললে, না, হ্যারি, রাগ করিনি। খুশি হয়েছি। খু-ব খুশি হয়েছি! জান? আমার নাতি-নাতনিরা আছে স্টেটস-এ। মাঝে মাঝে মনটা উতলা হলে লঙ ডিসট্যান্সে ফোন করি। ওদের কণ্ঠস্বর শুনতে। যখন মনটা আকুল হয়। ওরা কথা বলে, কিন্তু আমাকে ডাকে 'মিস মোরিয়াম'। কেন? 'গ্র্যানি' বলে ডাকতে পারে না? সেই কোন যুগে ওদের গ্র্যান্ড পা-র সঙ্গে আমার বিবাহ-বিচ্ছেদ হয়েছিল বলে?

আহারাদি মিটে গেলে বুড়ি 'গুড নাইট' জানিয়ে নিজের শয়নকক্ষের দিকে চলে গেল। বলে গেল, তোমরা শোবার আগে টিভির সুইচ অফ করে দিও। লাইট-টাইট সব নিবিও।

সাবিরা বললে, ও. কে. গ্র্যানি।

দুজনেই বুঝে নিয়েছে 'গ্র্যানি' ডাকটা বুড়ির পছন্দ।

বাসু জানতে চায়, টিভিতে বি. বি. সি. ধরব?

— নাঃ। আমি শুয়ে পড়তে চাই। রান্না কেমন হয়েছিল বললে না তো?

— পালং-পনীরটা গ্র্যান্ড হয়েছিল। এগ কারিটাও। চিকেন কারি কেমন হয়েছিল তা তোমরাই জান। আমি তো খাইনি।

— ঠিক আছে। এবার তুমি একটু ঐ করিডরে গিয়ে দাঁড়াও। আমি রাতের পোশাকটা পরে নিই।

বাসু ছদ্ম বিস্ময়ে বলে, কেন? নববধূরা বুঝি বরের সামনে শাড়ি ছেড়ে নাইটি পরে না?

— বেশি ন্যাকামি কর না। এই নাও, এটা ধর...

— কী ওটা?

— তোমার স্লিপিং স্যুট। ঐ করিডরে দাঁড়িয়ে পোশাকটা বদলে এস। যাও!

বাসু কথা বাড়ালো না। পাজামা-জামা নিয়ে চলে গেল করিডরে। পর্দাটা টেনে দিয়ে সাবিরা পোশাক পরিবর্তন করে নেয়।

একটু পরে পর্দার ওপাস থেকে প্রশ্ন হয় : মে আই কাম ইন, মিলেডি?

সাবিরা বললে, আইয়ে জনাব। লেকিন বাত-চিৎ হিন্দিমে করনা চাহিয়ে। না জানে বহ বুড্‌ঢি দেওয়ার মে কান লপট্‌কে খাড়ি হ্যয় ইয়ে নহী।

বাসুদেব দেখল ইতিমধ্যে গোলাপী রঙের একটা নাইটি পরে সাবিরা তার খাটে শুয়ে পড়েছে। ভিতরে কোনও অধোবাস আছে বলে ওর মনে হল না। বাসুদেব এসে বসল

তার নেয়ারের খাটে।

সাবিরা বললে, আজ তোমার জাত পুরোপুরি গেল, বাসু! আমার স্বহস্তে রান্না করা আন্ডা-কারি খেয়েছ। দেশে ফিরে এজন্য কতটা গোবর খেতে হবে তোমাকে?

বাসুদেব জবাব দিল না। হাত বাড়িয়ে সুইচটা অফ করে দিল। জোরালো বাতিটা নিভে গেলেও ঘর অন্ধকার হয়ে গেল না। করিডরে যে বাতিটা জ্বলছে ট্রামসমের পথে আসা তার আলোয় এই বাইরের ঘরটা স্তিমিতভাবে আলোকিত। পুরো এক মিনিট অপেক্ষা করে সাবিরা বললে, কই? জবাব দিলে না?

— আমি ভাবছি!

— কী ভাবছ?

হঠাৎ কনুইয়ে ভর দিয়ে আধশোয়া অবস্থায় এপাস ফিরে বাসু বললে, আমার একটা প্রশ্নের জবাব দেবে, সাবিরা?

— বল? কী প্রশ্ন?

— আমরা এতদিনেও পরস্পরকে চুম্বন করিনি। কেন?

একটু নীরব থেকে সাবিরা বলল, প্রশ্নটা তো আমিও তোমাকে করতে পারি, বাসু?

— পার। একশবার পার। এতদিনই বা করনি কেন?

একটু ইতস্তত করে সাবিরা বললে, ঠিক জানি না। হয়তো যে অপরাধবোধে ভুগছিলাম — আত্মপরিচয় গোপন করে — সেই অপরাধের বোঝাটা বাড়াতে চাইনি বলে। অথবা কে জানে, হয়তো মনে হয়েছিল সেই আদম ঈভ-এর জমানা থেকে এ বিষয়ে পুরুষই প্রথম পদক্ষেপ করে।

বাসুদেব উঠে দাঁড়ায়। তৎক্ষণাৎ উঠে বসে সাবিরা। বলে, প্লিজ বাসু। আমাকে ভুল বুঝো না। আমাকে কোন সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা কর না। আমার তা সহ্য হবে না!

— সান্ত্বনা! মানে? কিসের সান্ত্বনা?

— সেদিন যেটাকে তুমি 'স্বাভাবিক পরিণতি' বলেছিলে আমাদের ক্ষেত্রে তা যখন সম্ভবপর নয়, কিছুতেই হবার নয়, তখন যেহেতু আমরা দুজন আজ একঘরে রাত্রিবাস করতে বাধ্য হয়েছি, তাই আমাকে কোন 'কনসোলেশন প্রাইজ' দেবার চেষ্টা কর না।

বাসুদেব ওর খাটের সামনে নতজানু হয়ে বসে পড়ে কার্পেটের উপর। দুহাত দিয়ে সাবিরার দুই বাহুমূল ধরে আকর্ষণ করে। সাবিরা নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করে। বলে, প্লিজ, নো!

থমকে যায় বাসু। বলে, নো? আন্তরিকভাবে বলছ? কেন?

— কারণটা তো এইমাত্র বলেছি : 'Better die than kiss without love.'

ধীরে ধীরে শিথিল হয়ে গেল বাসুদেবের মুষ্টি। বললে, Without love? তুমি ...

তুমি ... আমাকে ভালবাস না?

সাবিরা দুহাতে মুখ ঢেকে বললে, Can't you understand?

বাসু হাসে। বলে, হ্যাঁ সাবিরা-বিবি। বুঝেছি। ঠিকই বুঝেছি। কিন্তু ঐ উদ্ধৃতিটা কার? কবির নামটা কি? ঐ যিনি লিখেছেন সেই লাইনটা : 'বেটার ডাই দ্যান কিস উইদাউট ল্যভ।' অর্থাৎ 'নিষ্প্রেম চুম্বনের চেয়ে মৃত্যুও বাঞ্ছনীয়?'

সাবিরার হাত দুটো মুখ থেকে সরে এল। বলল, নাম মনে নেই।

বাসু বললে, তাহলে আর এক কবির চার লাইনের শয়ের শোন। এ কবির নাম : হ্যারি চাপেকার :

Better die than miss
From a blushing damsel, a kiss
If you two are in hand & glove,
And sh's head 'oer heels in love.

লাজেরাঙা চুম্বনতিয়াসীকে প্রত্যাখান করার চেয়ে,
বিশেষ যদি দেখিস্ ওর চোখে প্রেমের স্বর্গীয় আলো,
আর সেও যদি ধরা দেয় মৌনমুখর সঙ্গীত গেয়ে,
তবে সে বঞ্চনার চেয়ে, কবি, তোর মরে যাওয়াও ভালো ॥

সাবিরা খিল খিল করে হেসে উঠল। আর সেই মুহূর্তেই বাসুদেব দৃঢ় বন্ধনীতে ওকে বুকে টেনে নিল।

"অধরের কানে যেন অধরের ভাষা,
দোঁহার হৃদয় যেন দোঁহে পান করে —
গৃহ ছেড়ে নিরুদ্দেশ দুটি ভালোবাসা
তীর্থযাত্রা করিয়াছে অধরসংগমে।"

।। দশ ।।

রাত থাকতে অ্যালার্ম দিয়ে দুজনে উঠেছে। সাবিরার আজকে ছুটি, তবু সে প্রথম দিন বাসুকে স্টেশান চত্বরে পৌঁছে দিয়ে আসতে চাইল। স্টেশান ওখান থেকে মাইল তিনেকের পথ; কিন্তু ভোরবেলাতেও পাবলিক বাস যাতায়াত করে। শহরের লোককে ডাবলিন-গামী প্রথম ট্রেনটা ধরিয়ে দিতে।

তিন নম্বর গোডাউনের কাছাকাছি এসে দূর থেকে দেখা গেল রাস্তার পাশে চিহ্নিত ট্রাকটা দাঁড়িয়ে আছে। সাবিরা ওকে নামিয়ে দিয়ে আর দাঁড়ালো না। জানতে চাইল, কখন তোমাকে নিতে আসব?

বাসু বলল, কখন ছুটি হবে, কখন ফিরে আসব কিছুই বুঝতে পারছি না। তুমি অহেতুক কেন আসবে? আমি স্টেশান থেকে শ্যানন এয়ারস্ট্রিপের বাস ধরে বাড়ি চলে যাব।

টা-টা জানিয়ে সাবিরা গাড়ি ব্যাক করল।

বাসু দেখল, রাস্তার ধারে একটা চায়ের দোকান সবে খুলছে। চা বিক্রি শুরু হয়ে গেছে। চায়ের দোকানের ছোকরা ট্রাকে-বসা মজদুরকে চা সরবরাহ করছে। সেও গুটি গুটি এগিয়ে গেল কাফেটার দিকে। দুটো কুকি বিস্কিট আর এক মগ চা নেয়।

প্রায় ছয়টা কুড়ি মিনিটে একটা ফোর্ড গাড়ি এসে দাঁড়ালো ঐ ট্রাকটার পাশে। তা থেকে নেমে এল ওদের ফোরম্যান। গাড়ি চালাচ্ছিল অন্য একজন। সে মুখ বার করে বললে, ও. কে. বস? চলি তাহলে?

— হ্যাঁ। ঠিক সাড়ে ছয়টায় আসবি আবার।

ভুল হবার কোন কারণই থাকতে পারে না। এই হচ্ছে বিগ বিলি র‍্যান্ডসন। পৈত্রিক নামটা বোধকরি উইলিয়াম র‍্যান্ডসন। মুখে মুখে 'উইলিয়াম' হয়েছে 'বিল', তা থেকে 'বিলি' ; আর 'বিগ' বিশেষণটা যোগ করেছে লিমেরিকের আতঙ্কতাড়িত জনসাধারণ, যারা জনান্তিকে ওকে উল্লেখ করে 'সেলফিস জায়েন্ট' নামে। বিরাট দৈত্যের মতো মানুষটা।

লোকটা পকেট থেকে একটা লিস্ট বার করে ট্রাকে উপস্থিত মানুষগুলোকে একবার দেখে মিলিয়ে নিল। সবই চেনা মুখ। রোলকলের প্রয়োজন হল না। বাসু ওর দিকে এক পা এগিয়ে গিয়ে সবে বলতে গেছে, 'গুড মর্নিং' — কিন্তু তার আগেই লোকটা গ্রাম্য আইরিশ উচ্চারণে বললে, ম্যাক আজ যাকে নতুন বাহাল করেছে তুমিই সেই 'ডার্কি'?

'কালা আদমী' সম্বোধনটার প্রতিবাদ না করে বাসুদেব শুধু বললে, আমার নাম বাসুদেব হরি চাপেকার।

— ইয়াহ! ব্ল্যাকি হ্যারি! দেন, য়ু আর দ্যাট গাঈ।

ওর মুখে বোধহয় এক বোঁদলা চিউইং গাম, অথবা টোবাকো। ক্রমাগত সে কী যেন চিবাচ্ছে। বললে, ওয়েল, বয়েজ, সবাই উঠে পড় শালার ট্রাকে।

গাড়িতে উঠে বসে সবাই। বিগ বিলি বসল ড্রাইভারের পাশে। ওরা পিছন দিকে দুটো লম্বা বেঞ্চি দখল করে। দু'দলের মধ্যে যে কাঠের পার্টিশান তাতে মস্ত একটা জানলা। বাসুদেব বসেছিল পিছন দিকে। তাই ঝাঁকুনি তাকে বেশি খেতে হচ্ছিল। ওর পাশেই বসেছিল একজন মাঝবয়সী মেহনতী। নিজে থেকেই বললে, আমার নাম জর্জি। তোমার নাম তো শুনলাম 'হ্যারি' — কোন দেশের মানুষ তুমি?

বাসু বললে, মহারাষ্ট্র, ভারত।

জর্জি বুঝে নিতে চায়, দুটোর মধ্যে ঠিক কোনটা? 'মহারাষ্ট্র' না 'ভারত'?

বাসু বুঝিয়ে দেয়, মহারাষ্ট্র ভারতের একটা অংশ, যেমন 'লিমেরিক কাউন্টি'টা আয়ার্ল্যান্ডের একটা অংশ।

— বুঝলাম। তা তুমি প্রটেস্ট্যান্ট না ক্যাথলিক?

এবারও ধৈর্য ধরে বাসু বললে, দুটোর একটাও নই। আমি হিন্দু।

— মানে? তুমি আদপে ক্রিস্টিয়ানই নও?

— তাই তো বলছি। ধর্মে আমি হিন্দু।

জর্জি এতে কী যে মজা পেল তা সেই জানে। সবাইকে ডেকে বললে, এই শুনছ তোমরা? হ্যারি খ্রীস্টানই নয় আদপে।

বিগ বিলি পিছন ফিরে বললে, আমি জানতাম। 'হীদেন' একটা।

বাসুদেবের ওষ্ঠ প্রান্ত থেকে হাসির শেষ চিহ্নটা মুছে গেল। সে রাস্তার দিকে তাকিয়ে অপসৃয়মাণ গাছপালাগুলো নজর করতে থাকে। কিন্তু ওর সহযাত্রীরা সেটা পছন্দ করল না। একজন প্রায়-প্রৌঢ় লোক বললে, তা হোক! আমাদের মধ্যে প্রোটেস্ট্যান্ট প্লেসবিট্যারিয়ান, ক্যাথলিক, সবই আছে। ধর্মবিশ্বাসের ফারাকে তাদের মজুরির ফারাক হয় না। না হয় তুমি হিন্দু, তাতে কী হল? এস, সবার সাথে পরিচয় করিয়ে দিই। এ হল মানরো, ও প্যাটারসন, আমার নাম ব্রাউন ... ভাল কথা, তুমি লাঞ্চ বক্স নিয়ে এসেছ তো? আমরা যেখানে কাজ করতে যাচ্ছি তার ত্রিসীমানায় দোকানপাটি নেই কিন্তু।

বাসু বললে, ও! সে কথা জানা ছিল না। কাল থেকে কিছু বানিয়ে নিয়ে আসব

— হ্যাঁ! আনবে। আমাদের দুবার কাজের ছুটি হয়। দশটা থেকে এগারো — ব্রেকফাস্ট। আবার দুটো থেকে তিনটে — লাঞ্চ! হাম্বর চালিয়েছ কখনো? সাত পাউন্ড হাম্বর?

বাসু মাথা নেড়ে বলল, না।

— তুমি লিমেরিকে এসেছ কেন? কী কর তুমি? মানে তোমার জাত ভাবনা তাহলে কী?

বাসুদেব সত্যি কথাই বলল।

শুনে সবাই তাজ্জব। জর্জি ছেলেমানুষের মতো হাততালি দিয়ে লাফিয়ে ওঠে, ব কি গো? তুমি পাস করা ডাক্তার? তাহলে আবার কী পড়ছ ডাবলিনে?

— 'স্পেশালিস্ট' ডাক্তার হব বলে শিখতে এসেছি।

জর্জি চিৎকার করে বলে, হেই, বিগ বিলি, আমাদের এই নতুন ছোকরা হ্যারি আসলে একটা পাস করা ডাক্তার। আমাদের কারো কিছু ভালমন্দ হলে ও চিকিৎসা করতে পারবে। ফার্স্ট এইড নয়, রীতিমতো চিকিৎসা।

বিগ বিলি পিছন ফিরে বললে, লুক হিয়ার জর্জি। তোমরা ওকে মাথায় তুলে নাচতে পার, কিন্তু আমার কোনও অ্যাকসিডেন্ট হলে ঐ ডার্কি হীদেন যেন আমাকে টাচ না করে। আগেভাগেই বলে রাখলাম।

বাকি রাস্তায় আর কেউ কোন কথা বলল না।

শ্যানন নদীর ধার দিয়ে পাকা পিচমোড়া সড়ক। তারপরেই শুরু হল পাকদণ্ডি কাঁচা রাস্তা। বেলা সাড়ে আটটা নাগাদ ওরা এসে পৌঁছালো অকুস্থলে।

বিরাট একটা হুইস্কি ডিস্‌টিলারি। মদ তৈরির কারখানা। একদিকে খাড়া চারতলা সমান উঁচু পাঁচিল, একটাও জানলা নেই। চারতলার উপর টালির ছাদ।

সচরাচর এসব বাড়ি ছোট ছোট অংশে ডিনামাইট দিয়ে উড়িয়ে দেওয়া হয়। ধ্বংসাবশেষ অপসারিত হলে বুলডোজার চালানো হয়। এখানে সেসব ব্যবস্থা করা হয়নি। ডিনামাইটের জন্য দরখাস্ত করলেই কোম্পানিকে সব কথা বিস্তারিত জানাতে হবে। তৎক্ষণাৎ ইনকাম ট্যাক্‌সের লোকেরা হুড়মুড়িয়ে এসে হাজির হবে। হিউম্যান সেফটি ডিপার্টমেন্ট থেকে জানতে আসবে কী কী সাবধানতা নেওয়া হয়েছে। প্রত্যেকের লাইফ ইন্সিওরেন্স-এ এক্সট্রা বেনিফিটের প্রিমিয়াম ডেমলিশন কোম্পানি দিচ্ছে কি না — ইত্যাদি নানান বখেড়া। তাই কোম্পানি স্থির করেছে দশ বারোজন সাহসী মেহনতী মজদুরের সাহায্যে ঐ প্রকাণ্ড বাড়িটাকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলবে। ওদের দেওয়া হচ্ছে সাত পাউন্ড স্লেজ-হ্যামার, দেড় ইঞ্চি ব্যাসের শাবল, কোদাল, গাঁইতি। নানান মাপের করাত, বাটালি, হাতুড়ি, স্ক্রু-ডাইভার ইত্যাদি, প্রভৃতি। নিরাপত্তার জন্য আছে শুধু একটা প্রকাণ্ড জাহাজী দড়ি, যার এক মাথা বাঁধা আছে ছাদের ওক কাঠের রিজপোলের সঙ্গে। প্রত্যেকটি কর্মীর বেল্টে একটা করে ডগ-লীশ ক্লিপ। অর্থাৎ পা পিছলে গেলে তারা ত্রিশঙ্কু হয়ে ঝুলবে, ভূপতিত হবে না।

বিগ বিলি বলল, প্রথম কাজ ছাদের টালিগুলো নামিয়ে ফেলা। ওর কোনও 'স্যালভেজ ভ্যালু' নেই। আস্ত নামাতে হবে না। উঠোনে ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেল। ওদিকে কেউ যেন না যায়। ভাঙা টুকরোয় চোখ কানা হয়ে যেতে পারে।

প্যাটারসন বললে, তার চেয়ে নদীর দিকে ফেললেই হয়। জল ছিটকালে কেউ কানা হয়ে যাবে না।

বিগ বিলি ধমকে ওঠে, আমার কথার উপর কথা বলবে না, প্যাটারসন। অনেকবার একথা বলেছি ; এই শেষবার বললাম। সরকারি নির্দেশ আছে — কোন রাবিশ নদীর জলে ফেলা যাবে না। তাতে নদীর জল নোংরা হয়ে, নদীর পথ বন্ধ হয়ে যাবে। নাউ স্টার্ট!

কারখানার ভিতর দিয়ে একটা ভাঙা সিঁড়ি আছে। তাই বেয়ে সাবধানে একে একে

সবাই উপরে উঠে গেল। চারতলার ছাদে। শুধু বিগ বিলি গিয়ে বসল ট্রাকে। বসল না, শুয়েই পড়ল বেঞ্চিতে। ঝুলি থেকে একটা বাইনোকুলার বার করে ওদের কাজকর্ম তদারকি করতে থাকে।

সারা দিনের পরিশ্রমে গোটা ছাদটা নেড়া হয়ে গেল। বোধহয় একশ বছর পাড়ি দিয়ে ভিতরকার কাঠের বিম, বরগা, রাফটার, পার্লিন, ওয়ালপ্লেট আবার সূর্যালোকের মুখ দেখল। কাল থেকে শুরু হবে ছুতারের কাজ। একদল স্ক্রু-ড্রাইভার চালিয়ে, নাটবলটু আলগা করে বড় বড় কাঠের কড়িগুলোকে বিচ্ছিন্ন করবে। কুইন-পোস্ট ট্রাস। এবার সেগুলি উপর থেকে ছুঁড়ে ফেলা হবে না। ধরা-ধরি করে সিঁড়ি বেয়ে নামাতে হবে। মোটা মোটা সেকশানের সিজনড টিম্বার — ভাগ্যক্রমে উইপোকায় আক্রান্ত হয়নি। অত্যন্ত চড়া দামে এগুলি বিকাবে বাজারে। জানলা-দরজার ফ্রেম ও পাল্লা সম্বন্ধেও ঐ কথা। এমনকি দেওয়ালের গাঁথনিও — সেকালের 'সাইজড রাবল ম্যাশনরি।' সমান মাপে কাটা পাথরের গাঁথনি। চুন-সুরকির। এরও ভাল বাজার দর। কাল থেকে ট্রাক ড্রাইভার প্রথম দিনের মতো দিবানিদ্রা দিতে পারবে না। তাকে 'স্যালভেজ' মাল ঠিকাদারের গুদামে পৌঁছে দেবার জন্য বারে বারে খেপ মারতে হবে।

দু-দুবার টিফিন ব্রেক হল। বেলা দশটায় একবার, বেলা দুটোর একবার। সবাই নিজের নিজের টিফিন কৌটা বার করে ক্ষুন্নিবৃত্তি করল। প্রচণ্ড ক্ষিদেয় পেটে ইঁদুরে ডন মারছে। বাসুদেব ছাদের একপ্রান্তে গিয়ে শ্যানন নদীর দিকে মুখ করে চুপ করে বসে থাকে। এ জঙ্গলের ত্রিসীমানায় কোনও খাদ্য কিনে খাবার উপায় নেই।

দিন চার-পাঁচ এভাবেই কেটে গেল। সারা শরীরে প্রচণ্ড ব্যথা। মাংসপেশীতে অপরিসীম বেদনা। তবু ওর যোগাভ্যাস করা শরীর, তাই একেবারে শয্যাশায়ী হয়ে পড়েনি। ম্যাক্‌কাটনির পরামর্শ মতো যথাসম্ভব বিগ বিলিকে এড়িয়ে গেছে। তার ক্রমাগত 'ব্ল্যাকি' বা 'ডার্কি' সম্বোধন উপেক্ষা করেছে। দিনান্তে পঁচিশ পাউন্ড করে গুনে নিয়েছে। সই বা টিপছাপ দিতে হয়নি। ইতিমধ্যে ছাদের কাঠগুলো নেমে এসেছে। চলে গেছে ঠিকাদারের গুদামে। দরজা-জানলার পাল্লা ও ফ্রেমও খুলে নেওয়া হয়েছে। এবার শুরু হবে চারতলার বাইরের দিকের দেওয়ালটা ভাঙার কাজ। কাল বাদে পরশু সে কাজে হাত দেওয়া হবে।

সেদিন ঘটল একটা অবাঞ্ছনীয় ঘটনা। সারাদিনের কাজ সেরে ট্রাকটা যখন মজদুরদের নিয়ে স্টেশান চত্বরের তিননম্বর গুদামের কাছে ফিরে এল তখন দেখা গেল বিগ্ বিলির ফোর্ড গাড়ির পিছনে পার্ক করা আছে একটা মিলিটারি ডিসপোজালের জিপ।

ট্রাকটা এসে দাঁড়াতেই সবাই ঝুপঝাপ লাফিয়ে নামল — যে যার বাড়ি পানে

যাওয়ার বাসলাইনে গিয়ে কিউ দিল। বাসুও প্রতিদিন শ্যানন এয়ারফিল্ডের দিকে ফেরার বাস স্টপে গিয়ে লাইন দেয়। আজ সেদিকে গেল না। ওর নজর হল, জিপ থেকে নেমে সাবিরা দাঁড়িয়ে আছে রাস্তার ধারে, ফুটপাতে। তার পরনে মেরুন রঙের ফুল আঁকা সালোয়ার, পাঞ্জাবি-উড়ুনি। ভারি সুন্দর দেখাচ্ছে তাকে পড়ন্ত আলোয়।

বিগ বিলি নিজের ফোর্ড গাড়িতে উঠতে গিয়ে হঠাৎ এদিকে ফিরল। থমকে থেমে গেল। পায়ে পায়ে এগিয়ে এল জিপটার দিকে। হাত দুয়েক দূরত্বে দাঁড়িয়ে সে যেন সাবিরাকে চোখ দিয়ে গিলে খেতে থাকে। সাবিরাও চোখ তুলে তাকে দেখল। উপায় নেই। ভদ্রতার খাতিরে বাসুদেব সাবিরাকে বললে, এস, পরিচয় করিয়ে দিই। উনি আমাদের গ্রুপলিডার মিস্টার উইলিয়াম র‍্যান্ডসন।

বিগ বিলি মাথা থেকে টুপিটা খুলে মাথা ঝুঁকিয়ে বললে, নো, মাই সুইটি। আমার নাম বিগ বিলি র‍্যান্ডসন।

তারপর বাসুর দিকে ফিরে বললে, আর উনি?

— মাই ওয়াইফ!

— ওয়াইফ! গ্রেশাস মি! তোমার বউ! য়ু মিন ...

সাবি চট্ করে উঠে বসল জিপে। বললে, সো লং মিস্টার র‍্যান্ডসন। গুড নাইট।

বাসুদেবও মুহূর্তে লাফিয়ে উঠল জিপে।

গাড়িটা স্টার্ট নিল। বিদ্যুৎ বেগে বেরিয়ে গেল স্টেশান চত্বর ছেড়ে। তখনো নিষ্পন্দ দাঁড়িয়ে আছে বিগ বিলি।

ওর ফোর্ড গাড়ি থেকে ছোকরা ড্রাইভার হাঁক পাড়ে, কাম অন বস্। লেটস গো।

লোকটা এতক্ষণ ধরে সব কিছুই দেখেছে।

।। এগারো ।।

পরদিন ভোরে বাসুদেব তিন নম্বর গোডাউনে পৌঁছে দেখল ট্রাকের উপর একটি ফোল্ডিং অ্যালুমিনিয়াম টেবল আর খানতিনেক চেয়ার তোলা হয়েছে। কিছু প্যাকিং বাক্সও। বাসু সে বিষয়ে কোন কৌতূহল দেখালো না। প্রতিদিনই ওদের উপস্থিত হতে হয় কাঁটায় কাঁটায় ছয়টার সময়, কিন্তু ওদের সর্দার বিগ বিলি এসে পৌঁছায় পনের-বিশ মিনিট পরে। অকুস্থলে ট্রাকটা পৌঁছনোর পর বিগ বিলির নির্দেশে একটা এলম গাছতলায় টেবিলটা পাতা হল। প্যাকিং বাক্স খুলে কাগজপত্র সাজানো হল। তার কিছু পরেই জর্জি এসে বললে, হেই হ্যারি! তোমাকে বস ডেকেছে। শুনে এস।

বাসু ক্রো-বার দিয়ে কাঠের গা থেকে একের পর এক পেরেক উপড়ে যাচ্ছিল। ডিসটিলারিটি এক সপ্তাহে চারতলার উচ্চতা হারিয়ে নেমে এসেছে তিনতলায়। বাসু শাবলটা নামিয়ে রেখে নড়বড়ে সিঁড়ি বেয়ে সাবধানে ভূপৃষ্ঠে নেমে এল। উঠানের একান্তে একটা বিরাট এলম গাছের ছায়ায় টেবিলের উপর গোদা ঠ্যাং জোড়া তুলে বিয়ার পান করছিল লোকটা। তার কানে একটা হেড ফোন লাগানো। বোধহয় সঙ্গীতসুধা ককটেল হয়ে যাচ্ছিল বিয়ারের সঙ্গে।

বাসুকে এগিয়ে আসতে দেখেই হেড-ফোনটা নামিয়ে রাখল। সবুট ঠ্যাঙ-জোড়া রইল যথাস্থানে। বিয়ারের বোতল থেকে একটা গ্লাসে কিছু মদ ঢেলে বাড়িয়ে দিল আগন্তুকের দিকে। এটা নিতান্তই অপ্রত্যাশিত। বাসু কী বলবে ভেবে পেল না।

— সিট ডাউন, ম্যান! হ্যাভ সাম কোল্ড বিয়র।

বাসু বসল। সবিনয়ে বলল, সরি। আমি মদ খাই না। কেন ডেকেছেন বলুন!

— হ্যাঁ! কেন ডেকেছি। লুক হিয়ার, ডক্টর হ্যারি। আমি গতকাল রাত্রে ডাবলিনে আমার বসের যে সলিসিটার আছেন, ঐ যাঁর সুপারিশ নিয়ে তোমরা দু'জন ম্যাকের কাছে এসেছিলে — তাঁর সঙ্গে লং ডিস্টেন্স টেলিফোনে কিছু বাতচিৎ করেছি। তুমি জান কি জানো না, জানি না — আমি হচ্ছি লিমেরিকের যিনি সাংসদ তাঁর সিকিউরিটি ম্যান। ইন ফ্যাক্ট, লিমেরিকের বাইরে গেলে আমাকে তাঁর সঙ্গে যেতে হয় — দেহরক্ষী হিসাবে। তাই জনান্তিকে তোমার সঙ্গে কয়েকটা গোপন কথা বলে নিতে এখানে ডেকে পাঠিয়েছি।

বাসু ঘাবড়ে যায়। তবু মুখে সাহসী ভাব ফুটিয়ে বলে, বলুন?

— কাল সন্ধ্যাবেলায় জিপ নিয়ে যে মেয়েটি তোমাকে রিসিভ করতে এসেছিল, সে কে?

— কাল সন্ধ্যাবেলাতেই তো সে প্রশ্নের জবাব দিয়েছি মিস্টার র‍্যান্ডসন। এ নিয়ে আপনার এত কৌতূহলই বা কেন? এতে তো আপনার 'বস'-এর নিরাপত্তা বিঘ্নিত হচ্ছে না!

— ওর নাম কী?

— এসব কথা কেন জানতে চাইছেন, তাই আগে বলুন। আমি আপনাদের ডেমলিশন য়ুনিটে সামান্য একজন ক্যাজুয়াল লেবার। হয়তো আরও দিন পনের একাজ করব। ফলে আমার পারিবারিক সংবাদ ...

— লুক হিয়ার, ডক্টর হ্যারি! ডাবলিনের ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চ আমাকে জানিয়েছে যে, তুমি ট্রিনিটি কলেজে ফরেন স্কলারশিপ হোল্ডারদের হস্টেলে দোতলায় সতের নম্বর ঘরে থাক। তোমার দেশ ভারতবর্ষের মহারাষ্ট্র — ইন ফ্যাক্ট 'পুনে' শহরে। তোমার

পাসপোর্ট নম্বার : BJM 793421 ; এটা তোমার এম. ডি. ফাইনাল ইয়ার। এরমধ্যে কোনও তথ্য তুমি অস্বীকার করতে পার?

— না, করছি না। কিন্তু কী আশ্চর্য। এসব তথ্যের প্রয়োজন হচ্ছে কেন?

— পাসপোর্টটা তোমার সঙ্গে আছে?

— না, আমার বাক্সে আছে।

— সেটাতে লেখা আছে তুমি অবিবাহিত। ঠিক কি না?

— আপনি এতসব কথা কেন জানতে চাইছেন আগে সেই কথাটা বলুন।

— তুমি কাল যে মেয়েটিকে দেখিয়েছিলে সে তোমার ওয়াইফ নয় — হতে পারে না — সে একটা 'কল গার্ল'। তোমার স্ত্রীর পরিচয়ে লিমেরিকের একটি পরিবারে সে এ শহরের সূচীতা নষ্ট করছে। নন-প্রস্টিট্যুট এরিয়ায় প্রস্টিটুশন ইজ প্রহিবিটেড।

— না, মোটেই তা নয়। সে আমার গার্ল ফেন্ড। কলগার্ল নয়। আপনি ঠিক কী চান বলুন তো?

— নাউ য়ু আর টকিং, ডক্টর। আমি ঐ মেয়েটিকে একটি সন্ধ্যার জন্য ধার নিতে চাই। ও এসে আমাকে বুঝিয়ে বলুক যে, প্রস্টিটিউশন ওর প্রফেশন নয়। ও জাস্ট ওর বয় ফ্রেন্ডের সঙ্গে লিমেরিকে বেড়াতে এসেছে। ব্যস্।

বাসুদেব জবাব দিল না। একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকল দানবটার দিকে। এখন মনে হচ্ছে ও শুধু দানব নয়, পিশাচও। বিয়ারের তলানিটুকু কণ্ঠনালীতে ঢেলে দিয়ে লোকটা উঠে দাঁড়ালো। বাসুদেবও উঠে দাঁড়ায়। বাসুদেবের মাথাটা ওর বুক সই-সই।

লোকটা ক'বোতল বিয়ার গলায় ঢেলেছে তা আন্দাজের বাইরে। টেবিলের নিচে অনেকগুলো খালি বোতল গড়াগড়ি যাচ্ছে। মদ্যপটা জড়িয়ে জড়িয়ে বললে, আজ রাত নটা নাগাদ আমার ফোর্ড গাড়িটা তোমাদের বাড়িতে যাবে, মানে ঐ বুড়ি মোরিয়ামের 'শ্যানন ভিয়ু ভিলায়'। তোমার বান্ধবীকে বলবে, সে যেন তৈরি থাকে। ঐ গাড়িতে আমার বাগানবাড়িতে সে চলে আসবে। আমার সঙ্গে ডিনার করবে। আমি জানি, সে তোমার মতো 'ভেজ' নয়। পানাহারের ভালই আয়োজন হবে, বুঝলে? সরি, তোমাকে নিমন্ত্রণ করতে পারছি না। কারণ ঐ ডার্কির ইন্টারভিয়ুটা আমি জনান্তিকে নিতে চাই। রাত এগারোটা নাগাদ ঐ গাড়িতেই সে ফেরত যাবে, অফ কোর্স ইফ শি কুড স্যাটিসফাই মি!

— তার মানে?

— মানে? এখনো বোঝনি? আমি অনেক-অনেক মেয়ের জনান্তিক ইন্টারভিয়ু নিয়েছি। ব্লন্ড, ব্রুনেট অ্যান্ড রেডহেডেড। কিন্তু কোনও ব্ল্যাকির ইন্টারভিয়ু নেওয়ার সৌভাগ্য আমার হয়নি। তুমি এবার যেতে পার।

বাসুদেব উঠে দাঁড়ালো। তার অন্তঃকরণ দাউ দাউ করে জ্বলছে, ঠিক যেমন জ্বলে উঠেছিল প্রায় একশবছর আগে ওর ঠাকুর্দার-ঠাকুর্দা দামোদর চাপেকারের বুকটা, র‍্যান্ড-সাহেবের প্লেগরুগী পরীক্ষার কানুন শুনে। চলতে শুরু করতেই পিছন থেকে মদ্যপটা ডেকে ওঠে, লুক হিয়ার, ডার্কি। আর একটা কথা শুনে যাও। আমার ঠাকুর্দার ঠাকুর্দা ছিল ব্যাভেরিয়ার ব্যারন। সে তার পছন্দমতো প্রজাদের মা-বউ-মেয়েদের ডেকে পাঠাতো রাজপ্রাসাদে। তারা ব্যারনকে ইন্টারভিয়ু দিয়ে স্যাটিসফাই করত। পরদিন ভোররাতে ফিরে যেত বাপ-ভাই-স্বামীর সংসারে — কখনো পেটকোঁচড়ে ব্যারনের দেওয়া উপহার বেঁধে নিয়ে। একেক রাত্রে এক্ একজন। যারা ব্যারনকে স্যাটিসফাই করতে রাজি হত না, তারা আর ফিরে যেত না। প্রাসাদের গ্রেভ-ইয়ার্ডে তারা আজও শুয়ে আছে 'ডুমস-ডে'র প্রতীক্ষায়। কথাটা তোমার বান্ধবীকে বুঝিয়ে দিও। কেমন? য়ু মে গো নাউ।

একটা হিক্কার দমক থামাতে মুখে হাত চাপা দিল মদ্যপটা।

বাসুদেবের মনে পড়ে গেল অন্য একটা কথা। বললে, কিন্তু ব্যাভেরিয়ার ব্যারনের উপাধি তো ছিল : 'র‍্যান্ডল্ফ'।

— রাইট! তাহলে তো তুমি জানই। সেই জার্মান র‍্যান্ডল্ফ-এর একটি শাখা চলে আসে ব্রিটেনে — তারা আইরিশ র‍্যান্ড। আর একটি শাখা — আমার পূর্বপুরুষ, চলে যায় সিসিলিতে। সেই বংশেই জন্মেছে 'মাফিয়া ডন'। এত কথা বলছি শুধু তোমাকে বোঝাতে যে, পৃথিবীটা যেমন ছিল তেমনিই আছে। তুমি যেন কোন চালাকির চেষ্টা কর না, ডার্কি। আমার সঙ্গে চালাকি করে আজ পর্যন্ত কেউ প্রাণে বাঁচেনি। আর তুমি ঐ রকম প্যাঁচামার্কা মুখ করে আছে কেন বল তো? ও তো জাস্ট তোমার গার্ল ফ্রেন্ড — বোন বা বউ তো নয়। ধরে নাও আজ সে আমার সঙ্গে ডেটিং করছে। গার্ল ফ্রেন্ডরা তো তা করেই থাকে। করে না?

সব শুনে মুহূর্তমধ্যে মনস্থির করল সাবি। বলল, কটা বলেছে? রাত নয়টা? অল রাইট। এখন পৌনে সাতটা। কেয়ারফুলি শোন — যা যা বলছি। ও লোকটা সব পারে। আমি রাজি না হলে আমাকে পাঁজাকোলা করে তুলে নিয়ে যেতে পারে। লিমেরিকের একটা লোকেরও হিম্মৎ হবে না প্রতিবাদ করতে। ও হচ্ছে পার্টি-মস্তান নম্বার ওয়ান।

— তুমি কী করতে চাও?

— সম্ভবত ওর লোক সন্ধ্যা থেকেই এ বাড়িটা পাহারা দিচ্ছে। যাতে আমি পালাতে না পারি। আমি আমার সুটকেশ গুছিয়ে দিচ্ছি। তুমি জিপটা নিয়ে একাই চলে যাও শ্যাননের ধারে গ্রেভ-ইয়ার্ডের পুবদিকের গেট-এ। আমি পিছনের দরজা দিয়ে লুকিয়ে

খালি হাতে বের হব। অলিগলি পথে গ্রেভ-ইয়ার্ডে পৌঁছে যাব। তুমি আমাকে রাত আটটা কুড়ির লোকালটায় তুলে দিয়ে ফিরে আসবে। কাল জিপটা আমাদের সার্ভে পার্টিকে ফেরত দেবে। বলবে, একটা জরুরী টেলিফোন পেয়ে আমি রাত্রে ডাবলিনে ফিরে গেছি। গ্র্যানিকেও সেই কথা বলবে।

— তুমি কলেজ হস্টেলেই ফিরে যাচ্ছ তো?

— আপাতত তাই। কাল রাত দশটা নাগাদ তোমাকে টেলিফোনে জানাব। তুমি কী করবে?

— আমি থেকে যাব। বিগ বিলিকেও ঐ কথা বলব। একটা জরুরী টেলিফোন কল পেয়ে তুমি আজ ফিরে গেছ — দু-তিনদিন পরে ফিরে আসবে।

— কিন্তু দু-তিনদিন পরে তো আমি ফিরব না।

— আমি জানি। কিন্তু সেই আশ্বাস দেওয়াই ভাল। ও যেন বুঝতে না পারে তুমি ওর নাগালের বাইরে পালিয়ে গেছ, চিরদিনের মতো।

মিস মোরিয়াম শুনে দুঃখিত হল, আহা যাবার আগে দুটো কথাও বলে যেতে পারল না। বাসু বুড়িকে সান্ত্বনা দিল, সে তো তিন-চারদিনের মধ্যেই ফিরে আসছে।

রাত নয়টার সময় যথা প্রত্যাশিত বুড়ির সদর দরজায় কলবেল বাজল। বাসু ইচ্ছে করেই সদরের দিকে গেল না। বুড়ি আগন্তুকের সঙ্গে কথা বলে ফিরে এসে বাসুকে জানালো, একটি ছোকরা একটা ফোর্ড গাড়ি নিয়ে এসেছে। সাবিকে খুঁজছিল, সে ডাবলিনে ফিরে গেছে শুনে তোমার সঙ্গে দেখা করতে চাইছে।

অগত্যা বাসু এগিয়ে গেল। বিগ বিলির ছোকরা ড্রাইভার। সাবিরার নির্দেশমতো তার পার্টটুকু আউড়ে গেল — সন্ধ্যারাত্রে একটা জরুরী টেলিফোন পেয়ে সাবি ডাবলিনে চলে গেছে রাত আটটা কুড়ির লোকাল ধরে। দিন তিনেক পরেই সে ফিরে আসবে।

ছোকরা বললে, এমন একটা আশঙ্কা 'বস'-এর ছিলই। এটা তোমরা ভাল করলে না ডক্টর হ্যারি। তুমি কি অনুগ্রহ করে তোমাদের ঘরের ভিতরটা আমাকে দেখতে দেবে?

— কেন বলত?

— বলব। পরে। আপত্তি আছে? ধর যদি বলি, তোমাদের ঘরে কোনও হেরইনের প্যাকেট আছে কি না, তাই দেখতে চাই?

বাসু বলল, বেশ তো, এস না ভিতরে।

ছোকরা মোরিয়ামের গেস্টরুমে ঢুকল। ওয়াড্রোব, বাথরুম, আলমারি মোটামুটি তল্লাসি করে বলল, ঠিক আছে। চল বাইরে যাই।

বাইরে এসে বললে, ডক্টর হ্যারি, তুমি বিদেশী। তোমাকে একটা কথা জানিয়ে রাখা কর্তব্য বলে মনে করছি। বিগ বিলির সঙ্গে ডবল ক্রশ করে কেউ প্রাণে বাঁচেনি। ও কতগুলো মানুষকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দিয়েছে তা আমিই জানি না। তুমি এ ভুল কর না।

— কী ভুল?

— দিন-তিনেক পরে যদি সাবিরা খাতুন ফিরে আসত তাহলে তোমাদের যৌথ কক্ষে তার কিছু নিদর্শন পড়ে থাকত। ছাড়া জামা-কাপড়, জুতো, মোজা, ব্রা — কিছু না কিছু। তা নেই। তার মানে সে আর কোনদিনই ফিরবে না। সে পালিয়ে গেছে।

বাসু অবাক হল ঐ নাম না জানা ছোকরা ড্রাইভারের মুখে সাবিরা খাতুন নামটা শুনে। বললে, বেশ তো! তাই যদি হয়। যদি না-ই ফেরে। বিগ বিলি ডাবলিনে গিয়ে ...

— তুমি জান না। স্বেচ্ছায় ফিরে এসে বিগ বিলির কাছে এক রাতে ইন্টারভিয়ু না দিয়ে গেলে দেখ, 'ভিজিলেন্স' ওর পিছনে লাগবে — ইন্টারর্নাল সিকিউরিটির পুলিশ। সন্দেহজনক প্রমাণ পাওয়া যাবে — মিস সাবিরা খাতুন খাতাকলমে ইন্ডিয়ান পাসপোর্টে পড়তে এসেছে বটে আসলে যে ইরান বা পাকিস্তানের এসপাওমেজ-এর এজেন্ট!

স্তম্ভিত হয়ে গেল বাসুদেব।

লোকটা মিলিটারি কায়দায় স্যালুট করে অ্যাবাউট টার্ন করল!

।। বারো ।।

পরদিন সকালে ফোর্ড গাড়ি থেকে নেমে বিগ বিলি নিঃশব্দে ট্রাকে উঠে বসল। তার ড্রাইভারের সঙ্গে বাসুদেবের চোখাচোখি হল; কিন্তু সেও কোনও কথা বলল না। ট্রাকটা প্রতিদিনের মতো একই রাস্তা বেয়ে এসে থামল শ্যানন পাহাড়ের সেই ডিস্‌টিলারিটার সামনে। এখন আর যা চারতলা নয়। তিন তলা। ছাদ নেই, জানলা-দরজা খুলে নেওয়া হয়েছে, পার্টিশান দেওয়াল শাবল দিয়ে খুবলে খুবলে নামিয়ে নেওয়া হয়েছে। এখন প্রধান সমস্যা বাইরের মোটা দেওয়ালটা নামানো। ভাঙাভাঙিতে দেওয়ালে হঠাৎ একটা বিরাট ফাটল দেখা দিয়েছে। সকাল থেকে জল্পনা হচ্ছে, কীভাবে ঐ দেওয়ালটা ভেঙে ফেলা যায়। প্যাটারসন এ কাজে সবচেয়ে অভিজ্ঞ। তার মতে এখন ডিনামাইট চার্জ করাই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ পন্থা। অল্প বারুদের বিস্ফোরণেই দেওয়ালটা হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়বে। কিন্তু বিগ বিলি তাতে রাজি নয়। বারুদের লাইসেন্স-এর জন্য দরখাস্ত করতে হলেই সব জানাজানি হয়ে যাবে। ইনকাম ট্যাক্স থেকে হেল্‌থ ডিপার্টমেন্ট সবাই অনুসন্ধান করতে ছুটে আসবে।

বিগ বিলি হঠাৎ বাসুদেবের দিকে ফিরে বলল, লুক হিয়ার, হ্যারি। তুমি ঐ পাঁচিলটার উপরে উঠে যাও। এরা সবাই একসঙ্গে শাবল দিয়ে ঠেলা দেবার সঙ্গে সঙ্গে তুমি ঐ দেওয়ালে একটা লাথি মারবে। ওটা হুড়মুড়িয়ে নিচে ভেঙে পড়বে।

বাসু বললে, কিন্তু দেওয়ালের সঙ্গে আমিও যে হুড়মুড়িয়ে নিচে পড়ব তিনতলা থেকে।

— না! পড়বে না! দেওয়ালে লাথি মেরেই একলাফে তুমি ভিতরের দিকে সরে যাবে।

বাসু বললে, তাতে বিপদের প্রচণ্ড সম্ভাবনা। আমার মৃত্যুও হতে পারে। স্তূপের ভিতর চাপা পড়ে। তুমি কী মনে কর প্যাটারসন?

প্যাটারসন ডেমলিশন স্কোয়াডের সবচেয়ে সিনিয়র, সবচেয়ে অভিজ্ঞ। কিন্তু সে কিছু বলার আগেই চিৎকার করে ওঠে বিগ বিলি : লুক হিয়ার ডার্কি! আমাকে আমার কাজ শেখাতে এস না। যে লাথি মারবে তার কিচ্ছু হবে না।

বাসু রুখে ওঠে, তাহলে আপনিই লাথিটা মেরে দেখান না।

— শাট আপ, য়ু স্টুপিড নিগার। আমি মনিব, তুমি চাকর। তোমাকে যা অর্ডার করা হচ্ছে তা করতে তুমি বাধ্য!

বাসুদেব উঠে দাঁড়াল। তাকিয়ে দেখল চারিদিকে। দেখল, সবাই ঘনিয়ে এসেছে এই অপমানকর তিরস্কারে।

বাসুদেব বললে, লুক হিয়ার, মিস্টার র‍্যান্ডসন। আপনি জানেন, আমার নাম ডক্টর বাসুদেবহরি চাপেকার। আমি সাদা কি কালো সেটা কোন কথা নয়। আর মনে রাখবেন আপনি আমার মনিব নন, জাস্ট আমাদের গ্রুপ লিডার।

— ব্লাডি স্টুপিড নিগার! আই হেট য়ু ইন্ডিয়ান্স!

— স্নো হোয়াট? আই অলসো হেট মাফিয়া অ্যান্টিসোশালস্!

বিগ বিলি মুষ্টিবদ্ধ হাতে এগিয়ে এল। বললে, কী বললি? আর একবার বল্?

বাসুদেব বললে, অহেতুক চিৎকার করছেন কেন? সারা দুনিয়ার সবাই তো মাফিয়াদের ঘৃণা করে। আপনি কেন ধরে নিচ্ছেন যে, আপনি তাদের একজন, তা কি আমি বলেছি?

লোকটা যুক্তির পথে গেল না। আরও জোরে চিৎকার করে উঠল, গেট আউট! য়ু ফেকিং নিগার! গো ব্যাক টু য়োর নিগারস কান্ট্রি — ইন্ডিয়া!

বাসুদেব শান্তকণ্ঠে বললে, আপনার গায়ে শক্তি আছে এটা আমরা সবাই জানি। কিন্তু একটা কথা মনে রাখবেন, মিস্টার র‍্যান্ডসন। আজ থেকে দু'হাজার বছর আগে ঐ ইন্ডিয়ানরা মন্দির বানিয়েছে। আন্ডার গ্রাউন্ড সিউয়ারেজ বানিয়েছে, জ্যোতির্বিজ্ঞানে অঙ্ক

কষেছে। আর সেই সময়ে আয়ার্ল্যান্ডের মানুষ পশুচর্মে দেহ আবৃত করে জঙ্গলে জঙ্গলে খরগোশ খুঁজে বেড়াতো! তারা ছিল গুহাবাসী অর্ধ-অসভ্য। আপনি এভাবে জাত তুলে আমাকে অপমান করতে পারেন না।

— ইজ দ্যাট সো? অপমান করতে না পারলেও তোর বাপের নামটা তো ভুলিয়ে দিতে পারি —

হঠাৎ সে একলাফে বাসুদেবের দিকে ঘনিয়ে এল আর সজোরে চপেটাঘাত করল ওর বাঁ-গালে। এই অপ্রত্যাশিত আঘাতে বাসুদেব প্রায় তিন হাত দূরে ছিটকে গিয়ে পড়ল। চোখের সামনে ঝিকমিক করে উঠল তারার ঝাঁক।

প্রচণ্ড যন্ত্রণার মধ্যেও বাসুদেব চোখ তুলে দেখল। দেখতে পেল তার ভূলুণ্ঠিত দেহের দুদিকে দুটি পা দিয়ে জিব্রাল্টার প্রণালীর উপর দণ্ডায়মান পৌরাণিক কলোশাস মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে আছে বিগ বিলি। তার দুটি হাত মুষ্টিবদ্ধ। অস্পষ্ট ভেসে এল জর্জির সাবধানবাণী — খবরদার মাথা তুলিস না, হ্যারি। উঠে বসতে গেলেই বিগ বিলি তোকে এই তিনতলা থেকে শ্যাননে ছুঁড়ে ফেলে দেবে।

বিগ বিলি গর্জন করে ওঠে : য়ু শাট আপ, জর্জি।

তারপর প্রায় এক মিনিট চরাচর নিস্তব্ধ। বাসুদেব জর্জির উপদেশটা শুনল। মাথা তুলল না। চোখ খুলল না। ধীরে ধীরে কেমন যেন আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল সে। অজ্ঞান নয় — কিন্তু পুরো সচেতনও নয়।

ঐ অবস্থায় সে যেন কিছু জাগর-স্বপ্ন দেখল। প্রথমে দেখল একজন অশ্বারোহী রাজপুরুষকে। মুখে কালো চাপ দাড়ি, হাতে বর্শা, কটিবন্ধে দীর্ঘ তরবারি, মাথায় রত্নখচিত উষ্ণীশ! চিনতে পারল বাসুদেব : ছত্রপতি শিবাজী!

তারপর দেখল, কাঠগড়ায় দাঁড়ানো এক আসামীকে। মাথায় পাগড়ি, কপালে হোমভস্মের ত্রিপুণ্ড্রক! নিজের ডিফেন্স নিজেই দিচ্ছেন : লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলক। বলছেন : আপন পৌরুষে যদি আত্মসম্মান রক্ষা করতে পার, তবেই পারবে, নচেৎ নয়।

তারপর ধূপের ধোঁয়া যেভাবে মিলিয়ে যায় ঠিক সেভাবেই মিলিয়ে গেলেন লোকমান্য তিলক। অথবা চলচ্চিত্রের 'ফেড আউট — ফেড ইন!' লোকমান্যের উপরেই সুপার ইম্পোজ হল যাঁর আলেখ্য তাঁর ছবি দেখেছে দাদুর ঘরে। মাথায় কালো পাগড়ি দুই কানে চুনি বসানো দুল। ওষ্ঠপ্রান্ত দৃঢ়নিবদ্ধ : দামোদরহরি চাপেকার। ডান হাত তুলে ওকে আশীর্বাদ করলেন। বললেন, ভুলো মৎ বেটা! ইয়ে হ্যয় মা-বহিনকী ইজ্জৎকা সওয়াল!

কতক্ষণ এভাবে পড়ে ছিল নিজেরই খেয়াল নেই। এক সময় সে চোখ তুলে তাকালো। দেখল তিনতলায় কেউ নেই। নৈঃশব্দের মধ্যে সে একাই পড়ে আছে

মেঝেতে। ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল। কাউকে দেখতে পেল না। নড়বড়ে সিঁড়ি বেয়ে সে নেমে এল একতলায়। তিনতলার দেওয়ালটা যেমন ছিল তেমনই আছে। জর্জি এগিয়ে এসে বলল, কাম অন হ্যারি! আমরা ফিরে যাব। ডিনামাইটের যোগাড় না হলে ঐ দেওয়ালটা ভাঙা যাবে না। প্যাটারসন বলেছে। নাও এটা ধর —

বাসুদেব জানতে চাইল, কী ওটা?

— তোমার আজকের আধারোজ মজুরি : সাড়ে বারো পাউন্ড।

ফেরার পথে কারও সঙ্গে কোন কথা হল না। ওরা নিজেদের মধ্যেও কথাবার্তা বলছিল না। অবস্থাটা রীতিমতো থমথমে। বাসুদেব বুঝতে পারে সমস্ত মজদুরই তার প্রতি সহানুভূতিশীল — কিন্তু প্রতিবাদ করার হিম্মৎ কারও নেই। এ পরিস্থিতির সঙ্গে ও পরিচিত। মহারাষ্ট্রেও এ অভিজ্ঞতা হয়েছে তার, পুনেতে, থানেতে, খাস বোম্বাইয়ে! মহাদেব-সেনা অথবা পার্টি মস্তানরা অন্যায় করলে প্রতিবাদ করা যায় না। প্রতিবাদী কণ্ঠ তাহলে স্তব্ধ হয়ে যায়।

বাসুদেব ট্রাক থেকে নেমে স্টেশানে ঢুকল প্ল্যাটফর্ম টিকিট কেটে। ফ্লাওয়ার স্টল থেকে কিছু ফুল কিনল। গ্র্যানির জন্য এক প্যাকেট নৈশাহার কিনে ফিরে এল বাসে করে, বাড়িতে।

সাবি নেই কাল থেকে। বাসু বুড়িকে বললে, গ্র্যানি, তোমার খাবারের প্যাকেটটা ধর। আমি রাত্রে কিছু খাব না। আমার উপবাস। একটা ব্রত আছে। আমি স্নান করে পূজায় বসব। কেউ আমার খোঁজ করতে এলে বল, আমি বাড়ি নেই।

বুড়ি রাজি হল।

সারাদিনই আকাশ ছিল কালো করে। সন্ধ্যায় শুরু হল ঝড়। আর তারপর মুষলধারায় বৃষ্টি। স্নানান্তে বাসুদেব এসে তার সুটকেসটা খুলল। বার করল দাদুর স্মৃতিচারণ গ্রন্থ। রাখল টেবিলের উপর। দিদা ওর সুটকেসের তলায় সাজিয়ে দিয়েছিল একটা রঙিন আলোকচিত্র — পুনে শহরের অম্বামাঈয়ের মূর্তি। দেওয়ালী উৎসব রাত্রে সুসজ্জিতা দেবী মূর্তির আলোকচিত্রটি তুলেছিল ওর এক বন্ধু। তারই এনলার্জড কপি। ফ্রেমে বাঁধানো নয়। শক্ত বোর্ড-এর উপর আঠা দিয়ে সাঁটা ছবিটা ল্যামিনেট করা। সেটাকেও বার করে টেবিলের উপর খাড়া করে রাখল। যে প্লাস্টিক ব্যাগে দাদুর গ্রন্থী-দেওয়া উপবীতগুলি ছিল তা থেকে একটা নতুন পৈতা বার করে পুরাতন উপবীতটা পরিবর্তন করল। হঠাৎ নজর হল — ঐ প্লাস্টিক প্যাকেটে রয়েছে কিছু রক্তচন্দন-চূর্ণ আর গুগগুল। আগরবাতি বা ধূপকাঠি। আশ্চর্য! এতো আগে নজর পড়েনি। এগুলো কে সাজিয়ে দিয়েছে? দাদু না দিদা? কেন? আজকের এই ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ বিপদসঙ্কুল সন্ধ্যাটার আশঙ্কা

করেছিল নাকি ওরা?

ছবিটাকে টেবিলে বসিয়ে পুষ্পাঞ্জলি দিল। তার সামনে দাদুর স্মৃতিচারণ গ্রন্থটি সাজিয়ে পূজায় বসল বাসুদেব চাপেকার। প্রথমেই উপবীতটা আঙুলে জড়িয়ে পদ্মাসনে অষ্টোত্তরশত গায়ত্রী মন্ত্র জপ করল। তারপর দাদুর শিক্ষামতো সর্বপ্রথম অর্চনা করল সিদ্ধিদাতা গণেশের — গজাসুরদমনকারী বিনায়ক — যাঁকে স্বমর্যাদায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন লোকমান্য তিলক ; স্বাধীনতা আন্দোলনের রামকেলী-মুহূর্তে :

দেবেন্দ্রমৌলিমন্দারমকরন্দকণারুণা।
বিঘ্নং হরন্তু হেরম্বচরণাম্বুজরেণবঃ ॥
একদন্ত মহাকায়ং লম্বোদরং গজাননং।
বিঘ্ননাশকরং দেবং হেরম্বং প্রণমাম্যহম্ ॥

দেবরাজ ইন্দ্রের মস্তকস্থিত মন্দার পুষ্পের পরাগে যাঁর পাদপদ্ম রক্তিম সেই হেরম্ব আমার বিঘ্ন হরণ করুন। যিনি একদন্ত, মহাকায়, লম্বোদর, গজানন, সেই বিঘ্ননাশকারী হেরম্বদেবকে আমার প্রণাম।

তারপর বাসুদেব অম্বাদেবীর ধ্যানে বসল। ধ্যানমন্ত্র জানা নেই। শুধু একটা শ্লোক হঠাৎ ওর মনে পড়ে গেল। দাদুর মুখে শুনেছিল। এত সহজ সংস্কৃত যে, অর্থবোধে অসুবিধা হয়নি :

"ন জানামি দানং ন চ ধ্যানযোগং
ন জানামি তন্ত্রং ন চ স্তোত্রমন্ত্রম্।
ন জানামি পূজাং ন চ ন্যাসযোগং
গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানী ॥"

হে ভবানী মাতা! আমি মন্ত্র-তন্ত্র, পূজাবিধি, ধ্যানযোগ কিছুই জানি না। কিন্তু এটুকু জানি যে, একমাত্র তুমিই অগতির গতি। তুমি ছত্রপতি শিবাজী মহারাজকে আশীর্বাদ করেছিলে। তাই তিনি অত্যাচারী মহাশক্তিধর আলমগীরকে শায়েস্তা করেছিলেন। তুমিই আমার পূর্বপুরুষ দামোদরহরি চাপেকারকে আশীর্বাদ করেছিলে। তাই তিনি মহাশক্তিধর কমিশনার র‍্যান্ডকে পথকুক্কুরের মতো হত্যা করেছিলেন। আজ ঐ বলদর্পী দানবটা আমার ইজ্জতের মাথায় পয়জার মেরেছে। ভারতমাতার অপমান করেছে। আমাকে আমার দাদুর-দাদু আদেশ করেছেন : ইয়ে হ্যয় মা-বহিনকী ইজ্জৎ কা সওয়াল। তুমি আমাকে বল ভবানীমাতা! কীভাবে আমি প্রতিশোধ নেব? কীভাবে প্রমাণ করব: সত্যমেব জয়তে, নানৃতম?

দু'চোখ বুজে বাসুদেব পুনে মন্দিরের অম্বাদেবীকে ধ্যান করতে থাকে। আবার প্রচণ্ড ঝড় উঠল। আবার নামল বর্ষার ধারা। কতক্ষণ ধ্যান করেছে খেয়াল নেই। বাহ্য জগতে

ফিরে আসার পর অনুভব করল ঘরটা এতক্ষণে ধূপ আর গুগ্‌গুলের গন্ধে পরিপূর্ণ। যে মোমবাতিটা জ্বেলে ধ্যানে বসেছিল সেটা তলানিতে পৌঁছে গেছে। জানলার পাল্লার ফাঁক দিয়ে বৃষ্টির একটা ধারা ঘরে মেঝেতে নেমে এসেছে। বিসর্পিল রেখায় চলে গেছে ঘরের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে। বাসুদেবের অন্তঃকরণ বললে — ঐ বৃষ্টির ধারাটিতেই মা যেন কী একটা ইঙ্গিত পাঠিয়েছেন। কী সেটা? ওর নজর হল জলের ধারাটা এসে যেখানে থেমেছে সেখানে পড়ে আছে ওর ড্রেসিং গাউনটা। হুক থেকে ঝুলছিল। হাওয়ার দমকে কখন মাটিতে লুটিয়ে পড়ে আছে। সেই ড্রেসিং গাইনের কটিবন্ধে রেশম রশিটা কুণ্ডলী পাকিয়ে বিচিত্র ভঙ্গিতে কী যেন একটা ভয়ঙ্কর ইঙ্গিত বহন করছে। বাসুদেব চমকে মায়ের আলোকচিত্রটির দিকে দৃকপাত করল। আশ্চর্য! চরণযুগল নয়, মুখমণ্ডল নয়, প্রথমেই ওর নজর পড়ল মাতৃকণ্ঠে প্রলম্বিত বিচিত্র উপবীতটির উপর। সেই মুহূর্তেই ওর মস্তিষ্কের কোন বিস্মৃতিরন্ধ্রে অনুরণিত হল দাদুর উদাত্ত কণ্ঠে শোনা সেই অম্বামাঈর ধ্যানমন্ত্রটি :

"শার্দুলস্কন্ধারূঢাং নানালঙ্কারভূষিতাং।
চতুর্ভুজাম মহাদেবীম **নাগযজ্ঞোপবীতিনীম** ॥"

মা অম্বাদেবী ব্যাঘ্রপৃষ্ঠে আসীন, তাঁর অঙ্গে নানা আভরণ, তিনি চতুর্ভুজ এবং তাঁর কণ্ঠে **নাগের যজ্ঞোপবীত**। সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করল ভবানীমাতাকে।

রাত দশটায় প্রতিশ্রুতি মতো ডাবলিনের ছাত্রী নিবাস থেকে টেলিফোন করল সাবিরা। সে ওখানেই আর একটা সাময়িক জরিপের কাজ জুটিয়ে নিয়েছে। ডাবলিনেই থাকবে বাকি ছুটিটা। বাসুদেব তার চরম অপমান অথবা মর্মান্তিক সিদ্ধান্তের কথা কিছুই জানালো না। চাপেকার বংশের সপ্ত পুরুষে মন্ত্রগুপ্তির প্রেরণা আছে ধমনীর প্রতিটি রক্তকণিকায়।

পরদিন সে কাজে গেল না। দেখা করল ম্যাক্‌কাটনি সাহেবের সঙ্গে। তাঁকে বললে, স্যার, একটা মর্মান্তিক দুঃসংবাদ পেয়েছি গতকাল লং ডিসটেন্স টেলিফোনে। আমার পিতৃদেব মৃত্যুশয্যায়। আমাকে দেখতে চান। আমাদের হিন্দুদের নিয়ম, শেষ সময়ে মৃত্যুপথযাত্রীর জ্যেষ্ঠপুত্র বাবার মুখে গঙ্গাজল দেবে।

ম্যাক্‌কাটনি বললেন, আই নো। 'সত্যজিৎ রে'র 'পথের পাঞ্চালি'তে দেখেছি। তুমি যেতে পার। দেখা করে আসতে। দিন সাতেকের মধ্যে আমি তোমার বদলি আর কাউকে নেব না। আমার আন্তরিক সমবেদনা জানাই।

দুপুরেই বাসু ফিরে এল ডাবলিনে। ওর এক গুজরাতি বন্ধু — বড়লোকের ছেলে — প্রয়োজনে ভারতীয় ছাত্রদের টাকা ধার দেয়, যাবতীয় কলেজ সার্টিফিকেটের'

অরিজিনাল কপি বন্ধক রেখে। সে জানে। এরা পাস করে বেরিয়ে মোটা রোজগার করবে, আর চাকরির আগে তাদের দরকার হবে ঐ সার্টিফিকেটগুলোর অরিজিনাল কপি। হপিং ফ্লাইটে বাসু বিকালেই চলে এল ডাবলিন থেকে লন্ডনে। মধ্যরাত্রে একটা ভারতগামী এয়ার ইন্ডিয়ার ফ্লাইটে ইকনমি ক্লাস সিট পেয়ে গেল একটা। পরদিনই রৌদ্রকরোজ্জ্বল বোম্বাই এয়ারপোর্ট।

॥ তের ॥

বুড়ো-বুড়ি তো ওকে পেয়ে দারুণ খুশি। এমন অপ্রত্যাশিত আগমনের হেতুটা কী, বাসুদেব কিছুতেই ভাঙল না। বলল, কেন জোর করে আমাকে দিয়ে মিছে কথা বলাবে? বিশেষ কারণে হেতুটা জানানো যাবে না। তাই ধরে নাও না কেন, ফাইনাল পরীক্ষার আগে অম্বামাঈয়ের আশীর্বাদ নিতে এসেছি। তোমাদের প্রণাম করতে এসেছি।

বুড়ো এক কথায় মেনে নিল। এটা ওদের বংশের ধারা। শ্রীহরি চাপেকারও জানতে পারেননি, দামোদর কোথা থেকে কী করে জোড়া রিভলবার যোগাড় করেছিল।

বাসুদেব আলমারি ঘেঁটে বার করল তার 'জুয়োলজি অনার্স যুগে'র বইগুলো। বোম্বাই ন্যাচারাল হিস্ট্রি সোসাইটি প্রকাশিত জে. সি. ড্যানিয়াল লিখিত 'দ্য বুক্ অব ইন্ডিয়ান রেপটাইলস' একটি প্রামাণিক গ্রন্থ। বহু নেড়ে চেড়ে বাসুদেবের পছন্দ হল যে বিষধরটিকে তার বাংলা নাম বঙ্করাজ ; ইংরেজি : Saw-Scaled Viper ; প্রজাতিগত বৈজ্ঞানিক নাম : *Echis Carinatus* (একিস কারিনাটাস)।

ভারতে চারটি বিষধর সাপকে বলা হয় Big Four বা 'বড়দা'। একেবারে 'গুরু': শঙ্খচূড় — তিনি তো সর্পকুলের অপ্রতিদ্বন্দ্বী সম্রাট। বাকি তিনজন কোবরা (গোক্ষুর, কেউটে, কালনাগিনী প্রভৃতি), চন্দ্রবোড়া (রাসলস ভাইপার বা ভাইপেরা রাসেলী), এবং এই ইনি : বঙ্করাজ। এটিকে বেছে নেওয়ার বিশেষ কারণ — বঙ্করাজ আকারে চারজনের মধ্যে সবচেয়ে ছোট। সচরাচর ফুটখানেক লম্বা। এই শতাব্দীর প্রথম দশকে ইংরেজ সরকার ঢেঁড়া দিয়ে ঘোষণা করেছিল যে-কেউ একটি মৃত বঙ্করাজ এনে কালেকটার সাহেবকে দিলেই এক আনা বকশিস দেওয়া হবে। সরকারি হিসাবে লেখা আছে এক সপ্তাহে 1,15,921টি মৃত বঙ্করাজ কালেকটারিতে পৌঁছায়।

যে তথ্যটা লেখা নেই তা হচ্ছে ঐ কালেকটার-সাহেবের আর্দালী পরের সপ্তাহেই দেশে নতুন দালান তুলতে শুরু করেছিল — বলাবাহুল্য যে, খিড়কির দরজা দিয়ে সে ডবল পয়সার বিনিময়ে মৃত সাপগুলি গ্রামবাসীদের বিক্রয় করত। ফলে আজও ভারত

নির্বঙ্করাজ হয়নি।

গ্র্যান্ট রোড ব্রিজের 'ট্রপিক্যাল ফিস অ্যান্ড রেপটাইল এম্পোরিয়ামের' বৃদ্ধ মালিক বাসুদেবকে দেখেই চিনতে পারল। পুনে কলেজের জীববিজ্ঞানের জন্য এককালে সে ঐ বুড়োর দোকান থেকে অনেক অনেক জীবজন্তু কিনেছে। দোকানি বললে, আসুন স্যার, এবার অনেক দিন পরে এলেন মনে হচ্ছে।

বাসুদেব বললে, আমি এখন নিউ ইয়র্কে জুলজি পড়াই। গ্রীষ্মের ছুটিতে দেশে এসেছিলাম। আজ আপনার দোকানে এসেছি একটা বিশেষ জাতের বিষাক্ত সাপের খোঁজে। আমাদের কলেজের জন্য।

বিবরণ শুনে বৃদ্ধ দোকানদার বললে, আপনার বরাত ভাল প্রফেসর-সাব, গত সপ্তাহেই একজোড়া 'স-স্কেলড ভাইপার' এসেছে আমার দোকানে। রাজপুতানা থেকে, আসুন দেখাই।

কাচের বড় বাক্সের মধ্যে ছিল নাগদম্পতি। কর্তা প্রায় পনের ইঞ্চি, গিন্নি মাত্র নয় ইঞ্চি। বৃদ্ধ দোকানদার বললে, খরিদ করলে আপনার পক্ষে দুটো একসাথে নেওয়াই লাভের হবে। কারণ এরা বাচ্চা পাড়লে মার্কিন মুলুকের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে বা চিড়িয়াখানায় চড়া দামে বেচতে পারবেন। মার্কিন মুলকে এ সাপ নেই। পশ্চিম আফ্রিকা থেকে ইরান, পাকিস্তান, ভারতবর্ষ হচ্ছে এর রেঞ্জ। এরা সবরকম আবহাওয়াতেই নিজেদের মানিয়ে নিতে পারে। পশ্চিম আফ্রিকার মরু উত্তাপেও এরা টিকে আছে, আবার ইরানের বরফ পড়া ঠাণ্ডাতেও।

বাসুদেব বললে, জানি। আমাদের এক জোড়াই ছিল কলেজ এম্পোরিয়ামে। মদ্দাটা আছে। মাদীটা বেমক্কা মারা গেল। তাই আমি শুধু ঐ ছোট্ট মাদীটাই কিনব। কত দেব?

— অজানা খদ্দের হলে হাজারের কম ছাড়তাম না। তবে আপনি পুরনো খদ্দের। আটশ দেবেন প্রফেসর-সাব।

দরদাম করে পাঁচ শ'য় রফা হোল।

দোকানি জানতে চায়, প্রফেসর সাব, আপনি এটাকে কীভাবে নিয়ে যাবেন?

— সেটাই তো ভাবছি।

— শুনুন স্যার! বিদেশে এ জাতীয় বিষাক্ত সাপ নিয়ে যাওয়া বড় ঝকমারির কাজ। আমার এক জাপানি খদ্দেরের একটা চন্দ্রবোড়াকে তো কাস্টমস-এর লোকেরা মেরেই ফেললে!

— তাহলে?

— তাই তো বলছি। আমি ওকে একটা ইন্ডিয়ান টোব্যাকোর কাঠের বাক্সে তুলোর ভিতর বসিয়ে দেব। দু'তিন দিন না খেলে ও মরবে না। বাক্সে খুব সূক্ষ্ম কিছু ফুটো থাকবে,

যাতে হাওয়া যেতে পারে। চুরুটের প্যাকেট বলে ওটাকে পাচার করতে হবে। কাল যাবেন বললেন না? আপনি এয়ারপোর্টে যাওয়ার পথে এটাকে ডেলিভারি নিয়ে যাবেন। হাতব্যাগে রাখবেন না, সুটকেশে প্লেনের লাগেজ কম্পার্টমেন্টে দিয়ে দেবেন।

বৃদ্ধ দোকানদারের পরামর্শমতো বাসু ওটাকে অনায়াসে হিথ্রো এয়ারপোর্টে নিয়ে আসতে পারল। যাত্রী পিছু কতটা টোবাকো বহন করা যায় সে হিসাব দোকানদারটির জানা ছিল। লন্ডন হিথ্রো এয়ারপোর্টে বাসুদেবকে বিশেষ বেগ পেতে হল না। সে 'ইমিগ্রেন্ট' নয়, ছাত্র — ছুটিতে ইন্ডিয়া গিয়েছিল।

বিকালবেলা একটা হপিং ফ্লাইট ধরে লন্ডন থেকে ডাবলিন, সেখানে থেকে লিমেরিক।

বোম্বাইতে বাসুদেব অহেতুক মাথাটা কামিয়ে এসেছে। ও জানত, না হলে ওর ভারতীয় বন্ধুরা ওর পিতার মৃত্যুসংবাদটা সহজে নেমে নেবে না। বুড়ি মোরিয়ামকে সে বুঝিয়ে দিল — বাবার মৃত্যু হলে মাথা কামানো হিন্দুদের একটা রীতি।

এয়ারপোর্টে কাচের বোয়ামে কিছু শুকনো মটর কিনে নিল। রুদ্ধদ্বার কক্ষে এবার সে চুরুটের বাক্স থেকে বিষধরটিকে বোয়ামে স্থানান্তরিত করল। বুড়ো দোকানি কিছু গুঁড়া খাবার দিয়ে দিয়েছিল। বয়ামে আগে থেকে সেই খাদ্যচূর্ণ কিছু দিয়ে রেখেছিল বাসুদেব। আহা বেচারা দুদিন অনাহারে আছে। ওর পরিকল্পনা, নিখুঁতভাবে ছকা। অব্যর্থ! তাই বোম্বাই বাজার থেকে একটা ছোট সাঁড়াশি আর একজোড়া উইকেট কিপারের গ্লাভস কিনে নিয়ে এসেছে। ও লক্ষ্য করে দেখেছে দুপুরে লাঞ্চের পরে বিগ বিলি তার ওভারকোটের ডান দিকের পকেট থেকে বার করে টোব্যাকো পাইপ আর পাউচ। এক পাইপ ধোঁয়া গিলে সে হাঁকাড় পাড়ে, নাউ বয়েজ, হারি আপ। ইচ টু হিজ পোস্ট!

এ একেবারে নিত্যি ত্রিশ দিন।

পরদিন সকাল ছয়টায় বাসুদেব হাজিরা দিল স্টেশনের তিন নম্বর গুদামে। তার কাঁধে একটা ঝোলা, তাতে ওর খাবার জলের বোতল, টিফিন বাক্স, কালকের না পড়া খবরের কাগজ আর কাগজে জড়ানো একটা কাচের বোয়াম।

অনেকেই ওকে সহানুভূতি জানালো। বাপ কারও চিরদিন থাকে না। তবু দুনিয়াদারী করে যেতে হয়, এ জাতীয় মোহমুদ্গরি তত্ত্ব কথাও শোনালো কেউ কেউ। ওকে কেন মাথা কামাতে হয়েছে সে বিষয়েও অনেকে প্রশ্ন করল।

বিগ বিলি এল যথারীতি কুড়ি মিনিট দেরিতে। ট্রাকে ওঠার আগে সে পাইপ ধরালো — টোব্যাকো পাউচটা কোন পকেটে থাকল তা বিশেষ করে নজর করল বাসু। বিগ বিলি সহানুভূতির ধার দিয়েও গেল না।

ওর নেড়া মাথা সম্বন্ধেও প্রশ্ন করল না কিছু। শুধু একটা স্বগতোক্তি করল আকাশের

দিকে মুখ করে : সো দ্য ডার্কিজ ব্যাক অ্যাজ উল ব্রেনার। হাউ লাভলি হি লুকস্।

ডিস্টিলারি অনেকটা ভাঙা হয়ে গেছে গত এক সপ্তাহে। সেই ত্রিশঙ্কু প্রাচীরটি নিশ্চিহ্ন। বলা বাহুল্য, পদাঘাতে নয় — চোরাই বারুদ জোগাড় করতে হয়েছিল বিগ বিলিকে।

বেলা একটার সময় লাঞ্চ ব্রেক হবে। তার মিনিট পনের আগে যেন প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে বাসুদেব নেমে এল নড়বড়ে সিঁড়ি দিয়ে। কাঁধে তার ঝোলা ব্যাগ। প্রতিদিনের মতো বিগ বিলি প্রকাণ্ড ওভারকোটটা তার ওয়ার্ক টেবিলের পাশে একটা গাছের ডালে ঝুলিয়ে রেখে গেছে। সকাল থেকে বাড়ির ত্রিতলে কাজ তদারকি করছে। বাসুদেব সাবধানে ইতিউতি তাকিয়ে দেখল। কেউ তাকে নজর করছে না। ওভারকোটের পকেটে হাত বাজিয়ে দেখল — কোন পকেটে ও আজ পাইপ পাউচ রেখেছে। নিমেষ মধ্যে নিজের ঝোলা থেকে কাচের বোয়ামটা বার করে তার ভিতরকার জীবটিকে ঐ ওভারকোটের ডান পকেটে চালান করে দিল। ল্যাপেলে বোতাম আছে। সেটা বন্ধ করে দিল সযত্নে। যাতে নাগরাজ বেরিয়ে পালাতে না পারে।

বাসুদেবের পরিকল্পনাটি নিখুঁত : আজ সে মধ্যাহ্ন আহারে বসবে ঐ ওভারকোটটির কাছাকাছি। পাশেই থাকবে তার ঝোলাটা। তাতে আছে সেই সাঁড়াশি। ওর দৃঢ় বিশ্বাস: পাইপ-পাউচ বার করবার জন্য বিগ বিলি পকেটে হাত ঢোকালেই ক্রুদ্ধ বঙ্করাজ তাকে দংশন করবে। বিগ বিলি নিশ্চয় হাতটা টেনে বার করবে আর দেখা যাবে তখন বঙ্করাজ তার আঙুল কামড়ে ঝুলছে। বাসুদেব ক্ষিপ্রহাতে সাঁড়াশিটা দিয়ে চেপে ধরবে বঙ্করাজকে। দংশনের পরমুহূর্তে নাগরাজ নির্বিষ। ওর বিষথলিতে বিষ জমতে ঘণ্টা তিন-চার লাগে। সুতরাং বাসুদেব সদর্পে ঐ সর্পরাজের মাথাটা তার ভারী মিলিটারি বুট দিয়ে থেঁৎলে দেবে আর দ্যাখ না দ্যাখ মৃত জন্তুটাকে শ্যানন নদীর জলে ছুঁড়ে ফেলে দেবে। ওটা কী ছিল, ভালভাবে সবাই বুঝে ওঠার সুযোগই পাবে না। জুয়োলজিতে ফার্স্টক্লাস ডিগ্রি পাওয়া বাসুদেব জানে : বঙ্করাজের দংশনে তাৎক্ষণিক যন্ত্রণা হয় না আদৌ। কিন্তু অবধারিত মৃত্যু হতে সময় নেয় ঘণ্টা তিন-চার। এজন্যই এত খুঁজে খুঁজে *Echis Carinatus* সংগ্রহ করে এনেছে — ভারতীয় সর্পরাজ্যের চার প্রধানের ভিতর থেকে ঐ ক্ষুদ্রতমদেহী অংশীদারকে।

মানুষ ভাবে একরকম, বাস্তবে ঘটনা ঘটে অন্যরকম। 'দ্য জ্যাকল' নির্ভুল টিপেই ফায়ার করেছিল, কিন্তু নিতান্ত ঘটনাচক্রে ঠিক তার পূর্বমুহূর্তে দ্য গল মাথা নিচু করেছিলেন। হিটলারের যে চেয়ারে বসার কথা, যে চেয়ারে তিনি বসেওছিলেন, সেটার নিচেই নির্দিষ্ট সময়ে টাইম-বমটা বিস্ফোরিত হয়েছিল, কিন্তু নিতান্ত ঘটনাচক্রে ঠিক পূর্ব মুহূর্তে হিটলার ঐ চেয়ার ছেড়ে বাথরুমে উঠে গেছিলেন।

কিন্তু এখানে ব্যাপারটা কী ঘটল?

লাঞ্চ আওয়ার্সের শেষাশেষি বিগ বিলি এগিয়ে গেল তার ওভারকোটটার দিকে। বাসুদেব তখন সমগ্র ইন্দ্রিয়গ্রামকে সজাগ করে অপেক্ষা করছে। তার একটা হাত ঝোলার ভিতর সাঁড়াশিটাকে শক্ত করে ধরে আছে। কিন্তু এ কী। বিগ বিলি ধীরে সুস্থে পকেট থেকে পাইপ পাউচ বার করে আনল। আবার হাত ঢুকিয়ে বার করল তার লাইটার। আরাম করে পাইপ টানতে থাকে।

স্তম্ভিত হয়ে বসে রইল বাসুদেব। বঙ্করাজ দংশন করল না কেন? অন্তত বঙ্করাজের গায়ে হাত লাগায় চমকে উঠল না কেন বিগ বিলি?

— নাউ বয়েজ! লাঞ্চ ইজ ওভার। লেটস গো ব্যাক টু ওয়ার্ক।

বাসুদেব এতক্ষণে বুঝতে পেরেছে রহস্যটা কী।

ওভারকোটের নিচে কিছু নড়া-চড়া করছে। নিঃসন্দেহে বঙ্করাজ। অর্থাৎ ওর ওভারকোট পকেটে একটা ছোট্ট ফুটো আছে। তাই দিয়ে সর্পরাজ অন্তর্হিত হয়েছে অন্ধকারতর এলাকায় — কোটের গরম কাপড় আর লাইনিঙের মাঝের ফাঁকের জায়গাটুকুতে।

কী সর্বনাশ। এখন?

ফেরার পথে বাসুদেব জর্জির কাছে জানতে চায়, বিগ বিলি থাকে কোথায়? কে কে আছে ওর পরিবারে?

জর্জি বলে, ও থাকে ভিক্টোরিয়া হিলসে। নিকলসন অ্যাভিন্যুর শেষ বাঙলোটায়। কেন? যাবে দেখা করতে?

— না। তা নয়। এমনিই জানতে চাইছি। কে কে আছে ওর পরিবারে?

— ওর দ্বিতীয় পক্ষের বউ। প্রথম পক্ষের ছেলে আর এ পক্ষের মেয়ে।

বাসুদেবের মনটা খারাপ হয়ে গেল। সে মনে মনে ভবানী মাতাকে আর্তকণ্ঠে বললে — এ তুমি কী করলে মা? বিগ বিলির পাপে কি ঐ নিরাপরাধীদের ভিতর কেউ প্রাণ দেবে? এখন আমার কী কর্তব্য?

পরদিন সকালে বিগ বিলি তার ছেলেমেয়েদের নিয়ে ব্রেকফাস্টে বসেছে। ছেলেমেয়ে স্কুলে যাবে, ও যাবে কাজে। স্ত্রী দ্রুত হস্তে পরিবেশন করছে। বিগ বিলির আহার শেষ হয়ে এসেছে। কফির কাপে চুমুক দিচ্ছে সে। পুত্রটি স্কুল-লিভিং ক্লাসে পড়ে। সে টোস্টে মাখম মাখাতে ব্যস্ত। মেয়েটির আহার শেষ, হয়েছিল। সে বাপের অনুমতি নিয়ে টেবিল ছেড়ে উঠে পড়ল। বিগ বিলি বললে, জুলি, আমার ওভারকোটের পকেট থেকে পাইপ-

পাউচটা বার করে দিয়ে যা তো, মা!

জুলি বিনা বাক্যব্যয়ে বাপের ওভারকোটের পকেটে হাত ঢুকিয়ে দিল। নিরাপদে বার করে আনল পাইপ ও পাউচ। চলে যাবার জন্য সে পা বাড়িয়েছে, বাপ বললে, কী রকম কাজ করিস দ্যাখ তো? কোটটা পড়ে গেল মাটিতে।

সত্যিই ওভারকোটটা অসাবধানে মাটিতে পড়ে গেছে। জুলি বললে, সরি, ড্যাড।

ওভারকোটের কলারটা ধরে হুকে টাঙাতে দিয়ে ওর নজর গেল মাটির দিকে। কী যেন একটা কিলবিল করছে। জুলি ঝুঁকে দেখতে যেতেই লম্বাটে জীবটা কুণ্ডলী পাকিয়ে বসল। জুলি বললে, এ ম্যা! ওটা কী?

সকলেরই নজর গেছে সেদিকে। বিগ বিলি পাইপটা নামিয়ে রাখে। ওর ছেলে ববি, মাখম মাখানো রুটিটা চিবাতে চিবাতে উঠে এসে কাছে গিয়ে দেখতে চায়। মিসেস র‍্যান্ডসন বলে ওঠেন, লর্ড হ্যাভ মার্সি অন আস। ইটস এ স্নেক। বিষাক্ত সাপ একটা!

বিগ বিলিও চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়েছে। বলে, গাঁওয়ারের মতো চিৎকার কর না তো তুমি! তোমাদের স্কুলে এটুকুও শেখায়নি যে, গোটা আয়ার্ল্যান্ডে কোনও জাতের সাপ নেই। না বিষাক্ত, না নির্বিষ।

এগিয়ে এসে ঝুঁকে পড়ে দেখল সবাই। মিসেস র‍্যান্ডসন বাদে। সে কাছেই ভিড়ল না। বঙ্করাজ এখন আত্মরক্ষার্থে নিজেকে গুটিয়ে অপেক্ষা করছে। বোধকরি সে জানে — মাত্র একবারই সে দংশন করতে পারবে। একজনকে। ওরা যে তিনজন।

বাপ জানতে চাইল, ওটা কী রে, ববি?

বিগ বিলি নিজে স্কুলের শেষ ধাপ পর্যন্ত পৌঁছাতে পারেনি। তাই মুখে যতই তর্জন-গর্জন করুক, মনে মনে সে পুত্রের জ্ঞানকে শ্রদ্ধা করে। জীববিজ্ঞান ববিকে পড়তে হয়

সে গম্ভীরভাবে বললে, 'অলীগোকীটা'!

— তার মানে?

— বড় জাতের কেঁচো।

বাপ ধমকে ওঠে, ইডিয়ট। কেঁচো কখনো এক বড় হয় না। আর এমন কুণ্ডলী পাকিয়েও থাকে না, ওটা কেঁচো নয়, কিছুতেই নয়।

ববি নিজেকে শুধরে নেয়, সরি ড্যাড। এটা সেসিলিয়ান।

— সেটাই বা কী?

— কেঁচো বা সাপের মতো দেখতে। হাত-পায়ের বালাই নেই। এক ফুট পর্যন্ত লম্বা হয়। ওরা একজাতের উভচর — অ্যাম্ফিবিয়ান।

মা জানতে চায়, সাপের মতো কামড়ায়? বিষ আছে?

ববি হাসে, না মা! উভচরেরা কামড়ায় না। ব্যাঙ, সালামান্ডারের জ্ঞাতি ভাই এরা।

নির্বিষ এবং আপোডা।

— 'আপোডা' মানে?

— APODA — যে জন্তুর পা নেই।

বিগ বিলি তার স্লিপারের একটা পাটি ছেলের দিকে বাড়িয়ে ধরে বলে, ওটাকে মেরে ফেল। আর ডাস্টবিনে ফেলে দিয়ে আয়।

আদেশমতো ববি চটিটা তুলে নেয়। বঙ্করাজও ফনা তুলে তৈরি হয়। সেও বুঝতে পেরেছে ব্যাপারটা। হঠাৎ বিগ বিলি ছেলের উদ্যত হাতটা ধরে ফেলে বলে, হোল্ড অন ফর এ মিনিট। আবার মাথায় একটা মতলব এসেছে। ওটাকে মারব না। ধরব। মার্থা, একটা খালি কাচের বোয়াম দাও তো, আর তোমার কিচেন-গ্লাভস-এর একটা পাটি।

— তোমার মতলবটা কী বলতো?

— আমাদের ডেমলিশন পার্টিতে একটা ব্ল্যাকি নিগার আছে। হীদেনটা এসেছে ভারতবর্ষ থেকে। সে দেশ আয়ার্ল্যান্ডের মতো পুণ্যভূমি নয়। বিষাক্ত সাপে ভরা। আমি ওকে নিয়ে একটু মশকরা করতে চাই।

ববি বলে, গ্লাভস কী দরকার? ও কামড়ায় না।

— আই নো। কিন্তু ঐ ডার্টি সরীসৃপটাকে আমি স্পর্শ করব না।

— ড্যাড! ওটা সরীসৃপ নয়, উভচর।

— তুমি চুপ করবে? যথেষ্ট পাণ্ডিত্য দেখিয়েছে। যা বলছি কর। কিচেন গ্লাভস আর সাঁড়াশিটা নিয়ে এস।

ভয়ে নয়, নিতান্ত ঘৃণায় বিগ বিলি স্পর্শ বাঁচিয়ে সাঁড়াশি দিয়ে বঙ্করাজকে কাচের বোয়ামে ভরে ফেলল।

রোজ ব্রেকফাস্টের ব্রেক হয় সকাল নয়টায়। আজ হল পনের মিনিট আগে। কারণ ছিল। কাচের বোয়ামে বন্দী নির্বিষ জীবটিকে সবাই দেখেছে। আর প্রাতরাশের সময় ঐটাকে বাসুর গায়ে ছুঁড়ে দিয়ে ভয় দেখানোর পরিকল্পনার কথাও সবাই গোপনে জেনে বসে আছে। ব্রেকফাস্টের সময় দারুণ একটা মজা হবে এটা সবাই জানে, সবাই প্রতীক্ষা করছে।

প্রাতরাশের সময় সবাই নেমে এল উঠানে। শ্যাননের জলে হাতমুখ ধুয়ে সকলে গোল হয়ে বসেছে। বাসুদেব বারে বারে বিগ বিলির ওভারকোটটাকে লক্ষ্য করে — আশ্চর্য! দূর থেকে একটুও বোঝা যায় না বঙ্করাজ কোথায় লুকিয়ে আছে। কোথাও কোন নড়া-চড়ার সঙ্কেত নেই। ওদিকে নজর না থাকলে বাসুদেব হয়তো অনুভব করত,

দলের সবাই কী একটার প্রত্যাশায় দম ধরে অপেক্ষা করছে।

যে যার ঝোলা পেড়ে নামায়। তা থেকে বার করে টিফিন বাক্স আর জলের বোতল, অথবা চায়ের ফ্লাস্ক। বাসুদেবও মাটিতে থেবড়ে বসেছে আসন পেতে। কোলের উপর তার টিফিন বাক্স, পাশে জলের বোতল। ওর লক্ষ্য হল, সবাই একদৃষ্টে ওর দিকে তাকিয়ে আছে! একটু অবাক হয়ে বাসু বলল, অমন করে কী দেখছ তোমরা?

— কিছু না। তোমার জামাটা বেশ সুন্দর। নেড়া মাথায় দারুণ মানিয়েছে।

বাসুদেব হেসে কী জবাব দিতে গেল। আর ঐ সঙ্গেই খুলে ফেলল তার টিফিন বাক্সটা।

কী সর্বনাশ!! স্যান্ডউইচ আর আপেলের উপর কুণ্ডলী পাকিয়ে বসে আছে বঙ্করাজ।

প্রচণ্ড চিৎকার করে লাফিয়ে উঠল বাসুদেব। সাপ সমেত টিফিন বাক্সটা ছুঁড়ে ফেলে দিল জঙ্গলটাকে লক্ষ্য করে। ওর সঙ্গীসাথীরা ওর নাচানাচি দেখে হেসে গড়িয়ে পড়ে।

বাসুদেব তখন তিন হাত দূরে লাফিয়ে পড়ে চিৎকার করছে, ওটা সাপ! মারাত্মক বিষাক্ত সাপ! কোন ঝোপঝাড়ে লুকিয়েছে। তোমরা উঠে এস ওখান থেকে।

জর্জি, প্যাটারসন, ব্রাউনের দল হাসতে হাসতে ঘাসের উপর গড়াগড়ি খায়। বিগ বিলির চোখে জল এসে গেছে। চিৎকার করে বললে, য়ু ইডিয়ট ডার্কি! তুমি জান না? গোটা আয়ার্ল্যান্ডে কোন সাপ নেই। বুঝলে গর্ধভ? ওটা সিভিলিয়ান।

পাঁচ হাত দূরে দাঁড়িয়ে জুয়োলজিতে ফাস্ট ক্লাস সেকেন্ড হওয়া কালো মানুষটা বললে, কী? 'সিভিলিয়ান'? বুঝেছি! না। ওটা 'সেসিলিয়ান' নয়। সাপ!

— মূর্খ, গর্ধভ কোথাকার!

হাসতে হাসতে আহারান্তে সবাই যে যার কাজে ফিরে গেল। বিগ বিলি তার বাঁ-হাতের তালুটার দিকে একবার তাকিয়ে দেখল। সেখানে ছোট্ট দুটি দংশন চিহ্ন। বোয়াম থেকে বার করে বাসুদেবের লাঞ্চবক্সে পাচার করবার সময় ঐ 'সিভিলিয়ান' না কী যেন জন্তুটা ওর তালুতে কামড়ে দিয়েছিল। বিগ বিলি ভ্রূক্ষেপও করেনি।

যে যার কাজে যোগ দিল। বাসুদেব ঐ তৃণাচ্ছাদিত অংশটা থেকে যতদূর সম্ভব দূরে গিয়ে পেরেক ছাড়াতে বসল। বেলা একটার সময় লাঞ্চ ব্রেকে সকালের সেই মর্মান্তিক রসিকতার প্রসঙ্গ আবার উঠল। এবার কিন্তু বিগ বিলি সোৎসাহে যোগ দিতে পারল না। সে ভাল করে লাঞ্চ খেতেও পারল না। বলল, মাথাটা ঘুরছে। আজ দুপুরে কিছু খাব না।

সাড়ে তিনটে নাগাদ বিগ বিলি বললে, প্যাটারসন, আমার শরীরটা খুব জুতের লাগছে না। সর্দি-গর্মি বোধহয়! আমি একটু নিচে গাছতলায় গিয়ে শুয়ে থাকি।

সওয়া চারটে নাগাদ প্যাটারসন বললে, হ্যারি। চল, নিচে গিয়ে দেখি, বিগ বিলি কেমন আছে। তুমি ডাক্তার মানুষ। ভাল বুঝবে।

ওরা নেমে এল নিচে। দৈত্যের মতো মানুষটা গাছের গায়ে ঠেশান দিয়ে চুপ করে বসে আছে। দু-হাতে কপালে রগ দুটো টিপে ধরে। প্যাটারসন বললে, মাথা ধরাটা ছাড়েনি?

বিগ বিলি জবাব দিতে গেল। পারল না। ওর মুখ দিয়ে কিছু গ্যাঁজলা বার হল। ঘোলাটে দুচোখ মেলে সে কী যেন খুঁজছে। প্যাটারসন ওর কাঁধ ধরে একটা ঝাঁকি দিয়ে বললে, হাই বিলি! অমন করছ কেন? কী হয়েছে তোমার? শুধু মাথা-ব্যথা নয়? আর কিছু কষ্ট হচ্ছে শরীরে কোথাও?

ধাক্কা দিতেই দৈত্যের মতো দেহটা নিয়ে বিগ বিলি লুটিয়ে পড়ল মাটিতে।

একশ বছর আগে সুসজ্জিত হ্যানসম থেকে ঠিক এই ভঙ্গিতেই কি লুটিয়ে পড়েছিল র‍্যান্ডসনের পূর্বপুরুষ কমিশনার র‍্যান্ড — পুনার রাস্তায়? দামোদরহরি চাপেকারের গুলি খেয়ে? — বাসু ভাবতে থাকে। তার মনে পড়ে যাচ্ছে জুওলজি ক্লাসে প্রফেসর রামানুজমের লেকচার : "সাপের বিষ কয়েক জাতের জটিল যৌগিক প্রোটিন। মানবদেহে শারীরবৃত্তীয় এবং প্রাণ-রাসায়নিক বিক্রিয়ার ব্যাখ্যা আজ তোমাদের বোঝাব। তোমরা নোট করে নাও। শঙ্খচূড়, কোবরা, চন্দ্রবোড়া, আর বঙ্করাজ এই চার বিগ ফোরের বিষে এমন একটি উপাদান থাকে যা মূলত একটি 'এনজাইম'। তার নাম Haemolysin — রক্তকণিকার সংস্পর্শে ঐ এনজাইম হিমোগ্লোবিনকে স্থানচ্যুত ও স্বধর্মচ্যুত করে। ফলে রক্তকণিকা অক্সিজেন গ্রহণে অসমর্থ হয়ে পড়ে। শুরু হয় শ্বাসকষ্ট, ক্রমে শ্বাসরোধ। মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ হতে থাকে।

— হেই হ্যারি! তুমি তো একজন ডক্টর। দেখ না। কী হল ওর?

বাসুদেব বাহ্যজগতে ফিরে আসে। পুনার রাস্তা থেকে কমিশনার র‍্যান্ড-এর মৃতদেহটি অপসারিত। প্রফেসর রামানুজমের ক্লাসও শেষ হয়ে গেছে। লক্ষ্য করে দেখে, ওদের গোটা দল বিগ বিলিকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে। একটা মারাত্মক কনভালশনের পর বিরাট দৈত্যটা স্থির হয়ে গাছ তলায় পড়ে আছে। যেন মিল্টনবর্ণিত 'বি এলজিবাব'! সকলের অনুরোধ বাসু হাঁটু গেড়ে বসল। ওর হাতটা তুলে নিয়ে নাড়ি দেখল। বাহুমূলে আবার নাড়ি দেখল। চোখটা খুলে কী যেন লক্ষ্য করল। চিবুকের তলায় হাত দিয়ে কিছু অনুভব করল। তারপর নিজের মাথা থেকে চুপিটা খুলে ফেলে নিঃশব্দে একপাশে সরে দাঁড়াল।

প্যাটারসন চিৎকার করে ওঠে, হোয়াট ডু য়ু মিন? হি ইজ ডেড? অ্যাবসার্ড!

বাসুদেব নতমস্তকে বললে, প্রথম দিনই বিগ বিলি তোমাকে বলেছিল ও অসুস্থ হলে আমি যেন ওকে স্পর্শ না করি। আয়াম সরি। নিগার অর নো নিগার, ডাক্তার হিসাবে আমি তার সে অনুরোধটা রাখতে পারিনি।

প্যাটারসন চিৎকার করে ওঠে, এ হতে পারে না! ইম্পসিবল! তোমরা ওকে ঘিরে

দাঁড়িয়ে থাক আমি এক্ষুনি টেলিফোনে ম্যাক্‌কাটনিকে ডেকে পাঠাচ্ছি। আর একটা অ্যাম্বুলেন্স।

শ্যানন বিচ থেকে জেনারেল হসপিটাল পনের মিনিটের ড্রাইভ।

এল অ্যাম্বুলেন্স। আধঘণ্টার মধ্যেই পৌঁছে গেল হাসপাতালে। ট্রাকে চেপে গোটা দলটাও এল সেখানে। এমার্জেন্সি ওয়ার্ডের ডাক্তার তার রেজিস্ট্রিতে বিগ বিলির পুরো নামটা লিখে তারপর মাত্র তিনটি অক্ষরে ওর রোগ বর্ণনা করল : D. O. A.

প্যাটারসন বলে, তার মানে কী? D. O. A. ?

ছোকরা ডাক্তার বললে, আয়াম সরি। দ্য পেসেন্ট ইজ ডেড অন অ্যারাইভাল। আপনারা কোন রুগীকে আনেননি হাসপাতালে। এনেছেন একটি মৃতদেহ!

মৃত্যুর হেতুটা বোঝা যাচ্ছে না। ফলে লিমেরিক মিউনিসিপ্যাল মর্চুয়ারিতে শব ব্যবচ্ছেদ করলেন প্যাথলজিস্ট। পরদিন স্পেশাল মেসেঞ্জার মারফত ডাবলিনের করোনার রিপোর্টটা পেলেন।

"মৃতের নাম উইলিয়াম র‍্যান্ডসন ওরফে বিগ বিলি। বয়স একচল্লিশ। দীর্ঘ ও বলিষ্ঠ দেহী। অসাধারণ দৈহিক ক্ষমতা ছিল। হাতে পায়ে অসংখ্য ছোট ছোট কাটা-ছেঁড়ার দাগ। যে কাজ উনি করতেন তাতে এগুলি সবই স্বাভাবিক। ওঁর সহকর্মীদের হাতে-পায়েও অনুরূপ কাটা ছেঁড়ার দাগ দেখা গেছে। ঐ ছোট-খাট কাটাকুটির সঙ্গে মৃত্যুর কোন সম্পর্ক নেই। অজ্ঞাত হেতুতে মস্তিষ্কের একটি ধমনী ছিন্ন হয়ে 'ব্রেন হেমারেজে' মৃত্যু হয়েছে।"

এমন রিপোর্ট পেলে করোনার সচরাচর ইনকোয়েস্ট করেন না। কিন্তু এক্ষেত্রে করতে হল। কারণ বিগ বিলি একটি গোপন প্যারামিলিটারি অর্গানিজেশানের সদস্য। শাদা বাঙলায় শাসকশ্রেণীর পার্টি-মস্তান। ফলে করোনারকে ইনকোয়েস্ট করতে হল। করোনার তদন্ত করে জানালেন মৃত্যু অজ্ঞাতকারণে হলেও অস্বাভাবিক নয় — আত্মহত্যা বা হত্যা নয়।

বিগ বিলিকে যেদিন সমাধিস্থ করা হল সেদিন তার পরিবারের এবং ডেমলিশন স্কোয়াডের সব কর্মীরাই হাজির। শুধু একজন মাত্র অনুপস্থিত। প্যাটার্সন জর্জিকে কানে কানে বললে, এটা হ্যারি ঠিক করল না। হতে পারে সে খ্রীস্টান নয়, হিন্দু। বিগ বিলিও ওকে যখন তখন 'নিগার-ব্ল্যাকি-ডার্কি' বলে অপমান করত, তবু বিগ বিলি মানুষটা তো মরেই গেল। বিগ বিলির ফিউনারাল অ্যাটেন্ড করলে তার কিছু জাত যেত না। ভদ্রতার খাতিরে...

সে কথা বাসুদেবও জানত। কিন্তু তবু সে সমাধিক্ষেত্রে গেল না। একটা শাবল নিয়ে গাম বুট পায়ে সে ট্যাক্সি চেপে চলল অকুস্থলে। সেই শ্যাননের ধারে ভাঙা বাড়িটায়

— যেখানে ঝোপেঝাড়ে এখনো লুকিয়ে আছে তার অপকীর্তি : বঙ্করাজ!

এতক্ষণে আবার তার থলিতে জন্মেছে মারাত্মক বিষ। কোনও অসাবধানী আইরিশ ম্যান তার গায়ে পা দিলেই বঙ্করাজ তাকে দংশন করবে। তা হতে দেবে না বাসুদেব। মা ভবানীর নির্দেশে সে ঐ পাপকে আয়ার্ল্যান্ড নিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছিল। সেই পাপের স্খালন সে স্বহস্তে করে যাবে। সাপ বেশিদিন বাঁচে না। বংশবৃদ্ধির উপায়ও বঙ্করাজের নেই, কারণ তার জোড়া নেই। তবু সাপটাকে মেরে ফেলতে হবে।

ট্যাক্সি-ড্রাইভার যে বিগ বিলির মস্তান দলের লোক তা জানা ছিল না বাসুর। ভাঙা বাড়িটা থেকে পঞ্চাশ মিটার দূরে ট্যাক্সিটা থামিয়ে ও যখন শাবল হাতে নেমে পড়ল তখন ট্যাক্সি-ড্রাইভার বলল, লুক হিয়ার মিস্টার ইন্ডিয়ান। তুমি এখানে কেন এসেছ বল তো? বিগ বিলির সমাধিস্থলেই বা গেলে না কেন?

বাসুদেব চমকে ওঠে। তারপর বলে, আমাদের হিন্দুদের একটা রীতি আছে। আত্মীয়-বন্ধু বা প্রিয়জন যেখানে মারা যায় সেখান থেকে কিছুটা মৃত্তিকা তুলে নিয়ে নদীর জলে বিসর্জন দিয়ে কিছু মন্ত্র বলতে হয়। তাতে মৃত-আত্মার স্বর্গলাভ ঘটে। এটাই আমাদের বিশ্বাস। তুমি আধঘণ্টা অপেক্ষা কর প্লিজ। মিটারে যা উঠবে আমি তার ডবল পেমেন্ট করব।

ট্যাক্সি-ড্রাইভার বলল, তার দরকার হবে না। বিগ বিলি ছিল আমাদের লিডার। ও অনেক উপকার করেছে আমার। তুমি হিন্দুরীতিতে যা করণীয় তা করে এস। আমি অপেক্ষা করব। ট্যাক্সি ফেয়ার নেবই না আমি। বিগ বিলির আত্মা শান্তি পেলেই আমি খুশি।

শাবলটা নিয়ে বাসুদেব এগিয়ে গেল সেই ঝোপটার দিকে। যেখানে বঙ্করাজকে ছুঁড়ে ফেলেছিল সেদিন।

॥ চৌদ্দ ॥

ফোনিক্স পার্কে সেই মিশরীয় সভ্যতার অমরতার প্রতীক বিশাল পক্ষী-মর্মরের পাদদেশে এসে বসেছে দুটি মরমানব শিশু। ওরা একই দেশের মানুষ। দুটি ব্রিলিয়ান্ট ভারতীয় ছাত্রছাত্রী। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে এসেছে বিদেশে — জ্ঞানলাভের আশায়। একজন শারীরবিদ্যায় চূড়ান্ত শিক্ষা নিয়ে ভারতবর্ষে ফিরে যেতে চায়, আর্ত ভারতীয়ের সেবা করতে ; অপরজন সমাজবিজ্ঞানে শিক্ষা নিয়ে ফিরে যেতে চায় ভারতীয় সমাজকে সেবা করতে। যদি না ভারত তাদের প্রত্যাখ্যান করে। সেবা করতে না দেয়।

কিন্তু ভারত তো আজ ভারতীয়ের ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা-স্বপ্ন নিয়ে চলে না। ভারতে যাঁরা

আজ রাজনীতির মাধ্যমে সংবিধানকে কব্জা করে দেশের শাসকের ছদ্মবেশে বিভিন্ন প্রান্তে শোষক হয়ে বসেছেন, তাঁদের মতে ওরা ভারতীয় হলে কী হবে : ওরা ভিন্ন ধর্মের।

গোল ওয়ালকর, বাল থ্যাকারে, আদবানীর মতে : সাবিরা খাতুন আজ ভারতে এক অবাঞ্ছিত উপদ্রব। অপরপক্ষে বাসুদেব চাপেকার হচ্ছে বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ সন্তান। বাবরি মসজিদ ধ্বংস করে সেখানে যাঁরা রামমন্দির বানাতে চান তাঁদের মতে ব্রাহ্মণের ঘরণী হতে পারে না ঐ ম্লেচ্ছ মুসলমান। তারা মনুসংহিতার বিশ্বাসী, যে মনুর মতে ব্রাহ্মণেরা দেবতা।

"দেবাধীনং জগৎ সর্বং মন্ত্রাধীনং তে দেবতাঃ।
তং মন্ত্রং ব্রাহ্মণাধীনং ব্রাহ্মণ নাম দেবতা ॥

(জগৎপ্রপঞ্চ দেবতাদের অধীন আর দেবতারা অধীন মন্ত্রের। সেই মন্ত্র আবার বামুনদেবের কব্জায়। ফলে বামুনরাই দেবতা।)

মুসলমানেরা ভারতে থাকতে পারে, তবে "তাদের হিন্দুদের অধীনে থাকতে হবে। তাদের নাগরিত্বের অধিকার দেওয়া চলবে না।" (গোলওয়ালকর)।

ওদিকে আবার মৌলবাদী মুসলিমদের নেতা মওছদি সাহেবের মতে, বাসুদেব হচ্ছে কাফের। "কাফের কখনো ভাল হয় না। কাফের কখনো সচ্‌বাত বলে না।" (ইসলাম প্রচার সমিতির পুস্তিকা থেকে)

"কাফের হত্যার মধ্যে তাই কোন পাপ নেই, পরম করুণাময় খোদাতালার সেটাই তো ইচ্ছা।" (মৌলানা সইদা, ঢাকা, বাংলাদেশ)

অথচ কী বিচিত্র এই জগৎনিয়ন্ত্রার লীলাখেলা। তিনি একের হৃদয়ে প্রেম-ভালবাসা অপরের দিল-এ ইস্‌ক-মহব্বত পয়দা করলেন। ওরা পরস্পরকে ভালবেসে ফেলেছে। ওরা নীড় বাঁধতে চায়। ওরা দুজনে দুজনকে এত ভালবেসেছে যে, দুজনের কাছে দুজনে প্রতিশ্রুত : প্রয়োজন হলে অনন্তকাল তারা প্রতীক্ষা করবে। ওরা চায় না ওদের দাদু-দিদা কিংবা বড়ি আব্বা ব্যথা পাক। তাঁরা তাঁদের সংস্কারাচ্ছন্ন অন্তঃকরণ নিয়ে যতদিন না এ জীবনযন্ত্রণা থেকে অব্যাহতি পান ততদিন ওরা অন্য কোনও জীবন সঙ্গী বা সঙ্গিনী বেছে নেবে না। প্রতীক্ষা করবে। ফোনিক্স-এর মূর্তির ছায়ায় বসে ওদের মনে হয়েছে দু-দশটা বছর কিছুই নয়। তারপর যদি চিচওয়াড় গ্রাম অথবা ভারতবর্ষ ওদের যৌথসেবা গ্রহণ না করে তাহলে ওরা বিদেশে পাড়ি জমাবে। যেমন দিওয়ানা হয়েছিলেন খোরানা। ভারত তার গোঁড়ামী নিয়েই পড়ে থাকুক, রাজনীতি-ব্যবসায়ী মৌলবাদীদের সেবাদাসত্ব করতে থাক। ওরা বিদেশে চলে যাবে আবার।

বাসুদেব ইতিমধ্যে সব কথা খুলে বলেছে সাবিরাকে। সেই রাত আটটা কুড়ির ট্রেনে সাবিরাকে লিমেরিক স্টেশানে ট্রেনে তুলে দেওয়া থেকে শুরু করে বিগ বিলির শেষ

কনভালশান পর্যন্ত। বলল, সাবিরা তুমি কি মনে কর আমি হত্যাকারী? আমি খুনী?

— না! বিগ বিলি তো সর্পাঘাতে মরেছে।

— হাঃ! এটা কোন যুক্তি নয়। তাহলে তো রিভলবার দিয়ে যে হত্যা করেছে, সেও যুক্তি দেখাবে : ও তো মরেছে একটা ছোট্ট সীসার গোলকের প্রচণ্ড আঘাতে।

সাবিরা তার কালো চুলে ভর্তি মাথাটা ঝাঁকিয়ে বললে. না, বাসু! দুটো এক জিনিস নয়। একশ বছর আগে-পিছে র‍্যান্ড আর র‍্যান্ডসন মরেছে একই পাপে। ক্ষমতা দর্পে ওরা অন্ধ হয়েছিল, মানুষকে তার স্বাভাবিক মর্যাদা দিতে ভুলেছিল। জননীজাতির সম্মান তারা দেয়নি। তারা তাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেছে মাত্র! ওদের অত্যাচারের ইতিহাস আরও পুরানো। ব্যাভেরিয়ার ব্যারন তার প্রজাদের মা-বৌ-বোনদের ইচ্ছামতো তুলে নিয়ে এসে প্রাসাদে দু-চার রাত আটকে রাখত। বিগ বিলি যেমন আমাকে উঠিয়ে নিয়ে যেতে চেয়েছিল তার বাগান বাড়িতে। আয়ার্ল্যান্ডের থানা-পুলিশ এ বিষয়ে অন্ধ, যেহেতু বিগ বিলি ছিল শাসকদলের পার্টি-মস্তান। সারা পৃথিবীতে আজ এ জিনিস ঘটছে। ভারতে তো বটেই। একই ঘটনা হয়েছিল পুনেতে একশ বছর আগে। কমিশনার র‍্যান্ড ছিল শাসকদলের পার্টি-মস্তান। তোমার ঠাকুর্দা এবং তুমি ন্যায়বিচার করে ওদের শাস্তি দিয়েছ শুধু — মৃত্যুদণ্ড দিয়েছ। তার বেশি নয়। বঙ্করাজ সাপটা ছিল এক্সিকিউশনার — ঘাতকমাত্র।

বাসুদেব বললে, তবু আমি মনে সান্ত্বনা পাচ্ছি না, সাবিরা। আমি দু-দুটি মারাত্মক ভুল করেছি — আয়ার্ল্যান্ড রিপাবলিক আমাকে এম. ডি. হতে সাহায্য করেছে আর আমি নিজের ভুলে সে দেশটাকে বিষাক্ত করে দিয়ে গেলাম।

— কী ভুল করেছ তুমি?

— দুটি ভুল। প্রথম ভুলটা করেছি বোম্বাই-এ। আমার উচিত ছিল পুরুষ-সাপটাকে খরিদ করা। কিন্তু সেটা দৈর্ঘ্যে বড় ছিল বলে আমি মাদী সাপটাকে পছন্দ করেছিলাম। এ একটা মারাত্মক ভ্রান্তি। জীববিজ্ঞানী হিসাবে আমার এ ভুলের কোন ক্ষমা নেই। আমি অনুশোচনায় মরে যাচ্ছি, সাবিরা।

— সেটাকে 'ভুল' বলছ কেন? কী ভুল হল তাতে?

— দ্বিতীয় ঘটনার কথা শুনলেই বুঝবে। দ্বিতীয়টা ভুল নয়। আমি জেনেশুনে সে কাজটা করেছি। বিগ বিলিকে যেদিন কবর দেওয়া হচ্ছে সেদিন আমি একটা শাবল নিয়ে চলে গিয়েছিলাম ঐ ভাঙা বাড়িটায়। আমার মনে হয়েছিল ঐ বঙ্করাজটাকেও হত্যা করা আমার কর্তব্য। আয়ার্ল্যান্ড আমার কাছে কোনও অপরাধ করেনি। বঙ্করাজটা আরও দু-দশটা মানুষকে কামড়াতে পারে।

— তুমি তাকে খুঁজে পেলে না শেষ পর্যন্ত?

— সেটাই তো ট্র্যাজেডি সাবিরা : আমি তাকে খুঁজে পেয়েছিলাম। ঐ ভাঙা ডিস্টিলারির একটা ভগ্নস্তূপের কোটরে। মাটি থেকে হাতখানেক গভীর একটা গর্তে। আমাকে দেখেই বঙ্করাজ ফোঁস করে ফণা তুলল। আমিও শাবলটাকে মাথার উপর তুললাম। আশ্চর্য! অপরিসীম আশ্চর্য! শত্রুর সঙ্গে দ্বৈরথসমরে কোনও বিষাক্ত সাপ কখনো যা করে না — ও তাই করল। উদ্যত ফণা ধীরে ধীরে নামিয়ে নিয়ে লেজটাকে উঁচু করে সাষ্টাঙ্গ প্রণামের ভঙ্গিতে শুয়ে পড়ল। আমার মনে হল ও বলছে : ও তুমি! তুমি তো আমার শত্রু নও। আমার বন্ধু। তোমার আরব্ধ কাজ আমি শেষ করেছি বন্ধু। এখন তো তোমার প্রতিদান দেবার পালা। মানুষ তো চিরকালই এভাবে প্রতিদান দেয়, না-মানুষদের। এস। মার। শাবলটা মেরে থেঁতলে দাও আমার মাথাটা।

সাবিরা রুখে ওঠে : এ তোমার কবি কল্পনা।

— একজ্যাক্টলি। আমি জীববিজ্ঞানী। আমি তোমার চেয়ে সে কথা বেশি জানি, সাবিরা। এসব আমার নিজের মনগড়া কথা। কিন্তু তাহলে ও আমাকে আক্রমণ না করে, এভাবে শুয়ে পড়ল কেন? পরক্ষণেই দেখলাম — একটি অতি দুর্লভ দৃশ্য। ওর সারা দেহটা থর্‌থর করে কেঁপে উঠল। লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি বছর ধরে ওরা যা করে এসেছে সাপটা তাই করছে। সাপ নয় — সাপিনী। বঙ্করাজ ও নয়, বঙ্করানী। লেজের দিকে গর্ভ থেকে একে একে পাঁচটি ছোট ছোট সাপ বেরিয়ে এল — কেঁচোর মাপে। বঙ্করাজ এক দুর্লভ জাতের সাপ — সরীসৃপ হওয়া সত্ত্বেও সে ডিম পাড়ে না, বাচ্চার জন্ম দেয়।

প্রসবযন্ত্রণায় ক্লান্ত জননী মাথাটা তুলতে পারছে না। কিন্তু একদৃষ্টে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। সাপের চোখে এমন দৃষ্টি আমি কখনো দেখিনি, সাবিরা। আমার মনে হল, ও বলছে, এখন আমি প্রসবযন্ত্রণায় ক্লান্ত। তোমার যে উপকার করেছি, তার প্রতিদান যদি এভাবেই দিতে চাও তাহলে শাবল হাতে আর একদিন এস, বন্ধু! দ্বৈরথ সমরে আমাদের মুলাকাৎ হবে।

আমার শ্যিভালরিতে বাধল, সাবিরা! প্রসবযন্ত্রণায় ভূশয্যালীনা সদ্যোপ্রসূতির মাথাটা থেঁতলে দিতে পারলাম না। আর তাছাড়া — নাটকের সেটাই তো শেষ নয়। এরপর যে আমাকে অশ্বত্থামার সেই ক্ষমার অযোগ্য পাপ কাজটা করতে হবে।

— অশ্বত্থামার কোন পাপ?

— পাণ্ডব শিবিরে প্রবেশ করে সদ্যোজাত পঞ্চপাণ্ডব শিশুকে হত্যা করা।

আমি জীববিজ্ঞানী। আমি অন্তর থেকে বিশ্বাস করি : সূর্যের এই তৃতীয় গ্রহে জীবনধারণের স্বত্বাধিকারে মানুষ আর না-মানুষদের সমান একতিয়ার।

আমি বঙ্করানীকে হত্যা করে আসতে পারিনি, সাবিরা — তার সদ্যোজাত সন্তানদেরও নয়।

সাবিরা ওর হাতটা টেনে নিয়ে সান্ত্বনা দেবার স্বরে বলল, তুমি বোধহয় ঠিকই করেছ, বাসু। বিগ বিলির পাপে গোটা আয়ার্ল্যান্ডটা আর নিরাশীবিষ রইল না।

দুজনেই অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইল। শেষে বাসুদেব জানতে চাইল : কী ভাবছ, সাবিরা?

— ভাবছি, ভারতবর্ষের কথা! যারা রাজনৈতিক ক্ষমতালাভের মোহে বাবরি মসজিদ ধ্বংস করে দিল, যার ফলে সারা ভারতে এবং বহির্ভারতে হাজার হাজার হিন্দু প্রাণ দিল সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায়। যার প্রতিশোধ নিতে বোম্বাই ব্লাস্টে আবার হাজার হাজার মানুষ প্রাণ দিল, এরা সবাই কি বিগ বিলি র‍্যান্ডসন নয়? একদিকে ঐ গোলওয়ালকর, বাল থ্যাকারে, আদবানী, সঙ্ঘপরিবার, শঙ্করাচার্যের ধর্মান্ধতা অন্যদিকে মওছদ্দি ছায়েব, মৌলানা সইদা আর মৌলবাদী মুসলমান-স্বার্থান্বেষীর দল? বিগ বিলি যেমন আয়ার্ল্যান্ডে সাপ আমদানি করল — ওরাও তো তেমনি নিজ নিজ স্বার্থে ভারতে সাম্প্রদায়িক-সর্পকে আমদানি করছে! স্বাধীনতার পর তিন-তিনটে দশক এ সাপ ভারতে ছিল না। আমরা মোটামুটি মিলেমিশে ছিলাম — নব্বই কোটি হিন্দু আর দশ কোটি মুসলমান! ওরা গদির লোভে কোথা থেকে আজ সাম্প্রদায়িক সর্পকে আমদানি করে দুধ-কলা দিয়ে পুষছে, বাসু? আমরা কি ওদের শায়েস্তা করতে পারব না?

বাসু বলল, আমরা চেষ্টা করে দেখব ভারতে ফিরে গিয়ে। লোককে বোঝাব। কিন্তু এ প্রশ্নের শেষ জবাব দেবে ভারতবর্ষের আগামী প্রজন্ম। তারা ঐ রাজনীতি-ব্যবসায়ীদের বিতাড়িত করে সংবিধানের মাধ্যমেই সুশাসককে ভারতমাতার সেবার ভার দিতে পারবে, কি পারবে না।

সম্পূর্ণ উপন্যাস

‘ওরা হিন্দু না ওরা মুসলিম ?...’

নারায়ণ সান্যাল

এক

1989 সাল। আষাঢ় মাস। ভাগলপুরের গঙ্গা এখনো কূল ছাপায়নি। বর্ষা সবে নেমেছে। বঙ্গোপসাগরের বার্ষিক আশীর্বাদ মৌসুমী মেঘের বাহন হয়ে এসে পৌঁছেছে গাঙ্গেয় উপত্যকায়। ভাগলপুরেও। দু'হাজার বছর আগে যখন ভাগলপুরের নাম ছিল চম্পানগরী, তখনো যেমন আকাশ কালো করে ছুটে আসত মেঘের দল, আজও তাই আসে।

আজ জুম্মাবার। শেষ দুটো পিরিয়ড অফ্। তেজনারায়ণ জুবিলি কলেজ থেকে বেলা তিনটে নাগাদ রওনা হলেন প্রফেসর জামালউদ্দীন চৌধুরী সাহেব। এক হাতে ঝোলা ব্যাগ, অপর হাতে ছাতা। এখন অবশ্য বৃষ্টিটা ধরেছে। পথঘাটে ছোপছোপ জল।

প্রফেসর চৌধুরী অবশ্য বাস্তবে 'প্রফেসর' নন, এতদিনে রীডার। তবে পাড়া-বেপাড়ার সবাই ওঁকে ডাকে ঐ 'প্রফেসর' নামে। পনের বছর আছেন এই কলেজে। বহুদিনের প্রাচীন কলেজ। শতবার্ষিকী হয়ে গেছে দু' বছর আগে। বর্তমানে ভাগলপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদিত কো-এডুকেশন কলেজ। ওঁর বয়স যে চল্লিশের বেড়া ডিঙিয়েছে তা হঠাৎ দেখলে বোঝা যায় না। মুখে চাপ দাড়ি, অথচ গোঁফটা কামানো। মাথার চুল কাঁধের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। বাবরি ধরনের। পাক ধরেনি এখনো। কুচকুচে কালো। সেই কালো চুলের সঙ্গে মানানসই তালশিরের সফেদ টুপি। কলেজে উনি ইংরেজি পড়ান। এই কলেজেরই ছাত্র; এই ভাগলপুর থেকেই ইংরেজিতে এম. এ. করেছেন। ওঁর হাতব্যাগে একটি বই—পাবলিক লাইব্রেরির। ইচ্ছে, বাড়ি ফেরার পথে বইটি বদল করে নতুন একখানা ইংরেজি উপন্যাস নিয়ে যাবেন। শনি-রবি ছুটি। অকৃতদার একা মানুষ। বাড়িতে দ্বিতীয় প্রাণী নেই। সময় কাটে না।

কলেজ থেকে বার হয়ে ছাতাটা খুললেন। বৃষ্টি নেই। কিন্তু রোদের তেজ আছে। রাস্তাটা পার হয়ে উত্তরমুখো বাসস্টপেজে এসে দাঁড়ালেন।

সেখানে আগে থেকেই দুটি ছাত্রী লেডিজ-ছাতা মাথায় বাসের জন্য অপেক্ষা করছিল। ওদের বাঁহাতে বই। ডান হাত তুলে কপালে ছুঁইয়ে বললে, আদাব, স্যার!

'নমস্তে, সাব' শুনতে অভ্যস্ত চৌধুরী সাহেব একটু চমকে উঠলেন।

প্রতি নমস্কার করে বললেন, আদাব। তোমরা দু'জন তো ফোর্থ ইয়ারের। নয়?

কলেজে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ইদানীং এত বেড়ে গেছে যে, প্রত্যেকের নাম আর আগেকার জমানার মতো স্মরণে রাখতে পারেন না।

নিকটবর্তিনী বললে, আমার নাম জহুরা। এ ফতিমা। আমরা দু'জনেই ফোর্থ ইয়ারের। তবে ইংলিশ অনার্স নয়।

চৌধুরী সাব হেসে বললেন, সেটা না বললেও চলবে। অনার্সের ছাত্রছাত্রীদের প্রত্যেককেই নামে চিনি। তা তোমাদের তো কোনোদিন এই রুটের বাসে যেতে দেখেছি বলে মনে পড়ছে না।

জহুরা বললে, না স্যার, আজ আমরা একটু অন্য দিকে যাচ্ছি। আমাদের এক অসুস্থ বন্ধুকে দেখতে। জেনারেল হাসপাতালে।—ভিজিটিঙ আওয়ার্স চারটে থেকে সাড়ে ছয়টা। ওর সঙ্গে দেখা করে যে-যার বাড়ি যাব।

কলেজে কো-এডুকেশন। চৌধুরী মেয়েটিকে প্রশ্ন করলেন, ফোর্থ ইয়ারে পাস-অনার্স মিলিয়ে এখন কতজন ছাত্রী পড়ে?

জহুরা তার বান্ধবীর দিকে তাকায়। সে নিরুত্তর শ্রাগ করে। জহুরা বললে, ঠিক সংখ্যাটা বলতে পারব না, স্যার। তবে মনে হয়, জনাকুড়ি।

—তার মধ্যে কতজন মুসলমান?

এবার উত্তর দিতে জহুরাকে কোনো অসুবিধা ভোগ করতে হলো না। বললে, এই আমরা দু'জনই।

চৌধুরী সাহেব ঝুঁকে পড়ে বাস-রাস্তার শেষ দিগন্তের দিকে তাকিয়ে দেখলেন। কোনো বাস আসছে না। বিপরীত পথের দক্ষিণমুখী একটি সাত নম্বরের বাস রাস্তার ওপ্রান্তে এসে দাঁড়ালো। যাত্রী নামল না কেউ। উঠল কিছু। বাসটা ছাড়ল।

চৌধুরী বললেন, তোমরা কি জান, সারা ভারতে সব জাতের নারীদের মধ্যে সাক্ষরতার অনুপাত প্রায় চল্লিশ শতাংশ? সে হিসাবে মুসলমান নারীদের সাক্ষরতার অনুপাত কত হবে আন্দাজ করতে পার?

দু'জনেই নেতিবাচক মাথা নাড়ল। চৌধুরী বললেন, এগারো শতাংশ। অথচ ভাগলপুরের এই আমাদের কলেজে দেখা যাচ্ছে মুসলিম ছাত্রীর অনুপাত সেই হিসাবের চেয়েও অনেক কম।

ফতিমা বলে, শুধু একটা ইয়ার ধরে হিসাবটা করা কিন্তু ঠিক স্ট্যাটিসটিক্যালি বাস্তবানুগ হচ্ছে না, স্যার।

—করেক্ট! কিন্তু আমি গোটা কলেজের ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা নিয়ে এই স্ট্যাটিসটিক্সটা আগেই কষে দেখেছি। সর্বভারতীয় সাক্ষর-মহিলাদের ক্ষেত্রে মুসলমান সাক্ষর-মহিলার শতাংশ যেক্ষেত্রে আটাশ,—চল্লিশে এগারো—শুধু ভাগলপুর জেলায় যা আটত্রিশে ষোলো। আর আমাদের কলেজে সব ইয়ার মিলিয়ে ছাত্রীসংখ্যার মাত্র তের শতাংশ মুসলমান। ছয় শতাংশ খ্রীস্টান, আর বাদবাকি একাশি শতাংশ হিন্দু! তার মানে গোটা ভারতের তুলনায়, গোটা জেলার তুলনায় ভাগলপুর শহরে মুসলমান পরিবারেরা স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে তত উৎসাহী নয়। হিসাব তাই বলছে না?

ওরা কোনো জবাব দিল না। উৎসাহ দেখালো না এ বিষয় নিয়ে আলোচনাটা চালিয়ে যেতে। এদিকে বাসের কোনো পাত্তা নেই। চৌধুরী বললেন, এক কাজ করা যাক। একটা অটো নিয়ে, চল, আমরা তিনজনেই জেনারেল হসপিটালে চলে যাই। ওখান থেকে আমি পায়ে হেঁটে লাইব্রেরিতে চলে যাব। সেখানেই যাচ্ছি আমি! লাইব্রেরিটা হাসপাতাল থেকে মিনিট দশেকের পায়ে-হাঁটা দূরত্বে।

ছাত্রী দু'জন রাজী হলো। চৌধুরী একটা অটোরিকশাকে ডাকলেন। কিছুটা দরাদরি করে তিনজনে উঠে বসলেন। জহুরা বসল মাঝখানে। অটোরিকশাটা ছাড়ল। কথোপকথন চালিয়ে যেতে চৌধুরী প্রশ্ন করেন, তোমাদের বান্ধবীর কী হয়েছে? আই মীন, অসুখটা কী জাতীয়?

জহুরা জবাব দিল না। ফতিমার দিকে আবার তাকালো। সে ও-পাশ থেকে বললে, ঠিক জানি না, স্যার। শুনেছি পয়েজনিং কেস!

—পয়েজনিং! কেউ ওকে বিষ খাইয়েছে? বধূহত্যা?

—না, স্যার! ও...মানে, ঠিক জানি না...শুনেছি, সুইসাইড করতে চেয়েছিল।

এর পর প্রতিবর্তী প্রেরণায় যে প্রশ্নটা ওঠার কথা প্রফেসর চৌধুরী সেটা উচ্চারণ করলেন না। জানতে চাইলেন না—কোন অসহ্য হেতুতে একটি তরুণী এই রূপরসশব্দগন্ধস্পর্শময় পৃথিবীর সব আকর্ষণ হারিয়ে 'বামির হাতে দীপশিখাটির' মতো একেবারে নিঃশেষে মুছে যেতে চেয়েছিল।

জহুরা এবার নিজে থেকেই বলে, আপনি হয়তো ওকে চিনবেন, স্যার। বছর-তিনেক আগে আমাদের সঙ্গে পড়ত। ফার্স্ট ইয়ারেই বিয়ে হয়ে যায়। কলেজ থেকে নাম কাটিয়ে সংসার করতে যায়।

—কী নাম বল তো?

—স্মৃতিলেখা দ্বিবেদী!

—ইয়েস! আই রিমেম্বার। স্মৃতিলেখা। বেশ ফর্সা, মিডিয়াম হাইট, বোধহয় বাবুপুর থেকে ডেলি প্যাসেঞ্জারি করত।

জহুরা ঠোঁট বাঁকিয়ে বললে, তবে তো স্যারের সব কিছুই মনে আছে। মায় ওর গায়ের রঙটা পর্যন্ত।

শ্যামাঙ্গী জহুরার এ কথার মধ্যে কোনো অভিমান ছিল কিনা ভ্রূক্ষেপই করলেন না অধ্যাপকমশাই। জবাবে বললেন, হ্যাঁ, সব কিছুই মনে আছে, কারণ ওর দাদাও ছিল আমার ছাত্র। বিশ্বনাথ। তোমাদের চেয়ে দু'বছরের সিনিয়ার। একসঙ্গে দুই বোনে বাবুপুর থেকে বাসে করে কলেজে আসত। তা স্মৃতিলেখা হঠাৎ...

মাঝপথেই থেমে যান। অটোরিকশাটা এসে হাসপাতাল গেটের বাইরে দাঁড়াল। চৌধুরী ওদের পয়সা মেটাতে দিলেন না। ওরা দু'জন জানত স্মৃতিলেখার কেবিন নম্বর। ফলে কাউকে কিছু জিজ্ঞাসা না করেই ওঁরা এসে পৌঁছালেন ফিমেল ওয়ার্ডের দ্বিতলে।

দুর্ভাগ্য ওঁদের। কেবিনের সামনে একটা বোর্ড ঝোলানো আছেঃ 'নো ভিজিটার্স অ্যালাওড'।

ছাত্রী দু'জন বললে, বৃথাই দৌড়াদৌড়ি হলো। সোমবারে আবার এসে খোঁজ নেব বরং। চৌধুরী বললেন, তোমরা তাহলে যাও। এখানে আমার একটি ছাত্র ডাক্তার হিসাবে চাকরি করে। এলাম যখন তখন দেখে যাই, সে আছে কি না।

এবার ওঁর ভাগ্য ভাল। ডক্টর কুমার ঘরেই ছিলেন। ভিজিটার্স স্লিপ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ডক্টর কুমার একেবারে ঘর ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে এলেন, আসুন, আসুন স্যার! আপনি আবার স্লিপ দিয়েছেন কেন? সোজা নক্ করে ঘরে ঢুকবেন।

চৌধুরী বলেন, তাই কি পারি? তুমি যে তখন কোনো রোগিণীকে পরীক্ষা করছ না তা বাইরে থেকে কী করে বুঝব?

—যা হোক। কী খাবেন বলুন, চা-কফি না ঠাণ্ডা? তার আগে বলুন, হাসপাতালে এসেছিলেন কেন? কোনো আত্মীয়-টাত্মীয় কি অসুস্থ হয়ে অ্যাডমিটেড হয়েছেন?

—হ্যাঁ। তবে আত্মীয় নয়, ছাত্রীঃ স্মৃতিলেখা দ্বিবেদী। অবশ্য বিয়ের পর এখন নিশ্চয়ই দ্বিবেদী উপাধি নয় ওর।

—পয়েজনিং কেস? অ্যাটেম্পট টু সুইসাইড?

—সেই রকমই তো শুনেছি। ঠিক জানি না।

—কেসটা ঠিকই শুনেছেন। নামটা ভুল!

—তার মানে?

—মেয়েটি প্রচুর পরিমাণে স্লিপিং পিল খেয়ে আত্মহত্যা করতেই চেয়েছিল। তবে ওর নাম স্মৃতিলেখা নয়—শুধু 'দ্বিবেদী' উপাধিটাই বদলায়নি—বিয়ের পর ওর গোটা নামটাই পালটে গেছিল, স্যার। হাসপাতালে যে রোগিণীটি এখন মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা কষছে তার নাম জুলেখা আহ্‌মেদ।

—আই সী! তার মানে ও একটি মুসলমান ছেলেকে সাদি করেছিল।

—তাই করেছিল। আর সেই অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করতেই পরশু দিন সুইসাইড করতে চেয়েছিল!

প্রফেসর চৌধুরী নীরব রইলেন। ডক্টর কুমার নিজে থেকেই বললে, আয়াম সরি, স্যার। যদি আপনার মনে আঘাত দিয়ে থাকি! কিন্তু আমি যা বলেছি তা নির্জলা সত্যি! মেয়েটি জীবনে একটিই ভুল করেছেঃ একটি মুসলমান ছেলেকে ভালবাসা।

চট্ করে উঠে দাঁড়ালেন অধ্যাপক চৌধুরী। বললেন, তুমি ব্যস্ত মানুষ। বেশিক্ষণ তোমাকে বিরক্ত করা উচিত হবে না।

—না, স্যার। বসুন! আপনি আমার উপর রাগ করেছেন। কিন্তু পুরো কেস-হিস্ট্রিটা শুনলে আর আমার উপর রাগ করতে পারবেন না।

—তুমি কি এখন আমাকে ওর পুরো কেস-হিস্ট্রিটা শোনাতে চাও?

—না, স্যার। আমি নই। তবে ঐ মেয়েটির দাদা এসে বসে আছে কাল থেকে—সারাদিন খায়নি-দায়নি, বাড়িও যায়নি। তার বোন বাঁচল কি মরল তা সে না জেনে যাবে না। রাত্রেও বাড়ি ফেরেনি। সেও বোধহয় আপনার ছাত্র। তাকে ডেকে পাঠাচ্ছি। সেই আপনাকে কেসটা বলবে। আমি বরং আবার ক্ষমা চেয়ে নিই—যদি আমার কথায় আঘাত পেয়ে থাকেন।

ডক্টর কুমারের আর্দালী ভিজিটার্স ওয়েটিং রুম থেকে ডেকে নিয়ে এল বিশ্বনাথ দ্বিবেদীকে। চুল উস্কোখুস্কো। গায়ে ময়লা হাফ-শার্ট। বোতামগুলো লাগানো নয়। পরনে জিন্‌স্-এর প্যান্ট, পায়ে চপ্পল। একদিনেই বেচারি বাজে-পোড়া তালগাছের মতো হয়ে গেছে। অধ্যাপক চৌধুরীকে সে চিনতে পারল ভালই। দু'হাত তুলে নমস্কার করে বললে, আপনি স্যার, লেখাকে দেখতে এসেছেন? খবর পেলেন কার কাছে?

জামালউদ্দীন সে কথার জবাব দিলেন না। ওর একটি বাহুমূল দৃঢ়মুষ্টিতে ধরে ডক্টর কুমারকে বললেন, ঠিক আছে। আজ চলি। কাল বিকালে এসে জেনে যাব জুলেখা কেমন আছে।

ওর বাহুমূল ধরে আকর্ষণ করে বললেন, এস বিশ্বনাথ।

বাইরে এসে বললেন, ডাক্তার কুমার বলল, তুই কাল থেকে এখানে পড়ে আছিস। বাড়ি যাসনি! কেন?

—বাড়িতে এখন কেউ নেই স্যার। সদরে তালা দিয়ে আমার বউ বাপের বাড়ি চলে গেছে বাচ্চাটাকে নিয়ে।

—আই সী! আজ খেয়েছিস কী?

—খেতে ইচ্ছে করছে না স্যার, কয়েক কাপ চা খেয়েছি শুধু।

—বুঝেছি। আয় আমার সঙ্গে।

ওকে নিয়ে রাস্তায় নামলেন। কাঁধে ব্যাগ, এক হাতে ছাতা, অপর হাতে দৃঢ়ভাবে তখনো ধরা আছে ছাত্রের বাহুমূল। রাস্তার কলে তখনো জল ছিল। বললেন, মুখ-হাত ভাল করে ধুয়ে নে।

ঝোলা ব্যাগ থেকে ওঁর তোয়ালেটা বার করে দিলেন। চিরুনিটাও।

সামনেই একটা মিষ্টান্ন ভাণ্ডার। ছাত্রকে নিয়ে এসে বসালেন। বৃদ্ধ দোকানির কাছে গিয়ে নিম্নস্বরে জানতে চাইলেন, আমি বসে খেলে আপত্তি হবে কি?

দোকানি—তার মাথায় ছোট ছোট চুল, পিছনে টিকি, চোখ তুলে দেখল। বললে, না না, আপত্তি কিসের? তবে আপনারা ঐ কেবিনে গিয়ে বসুন।

জামালউদ্দীন দেখলেন, পর্দা-ঝোলানো একটি কেবিনের ব্যবস্থাও আছে। তার ওপর একটি নোটিস বোর্ডে লেখাঃ জেনানা।

উনি বলতে গেলেন, ওঁর সঙ্গে কোনো মহিলা নেই; কিন্তু দোকানি ওঁর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললে, বিশিষ্ট মেহ্‌মানদের জন্য ঐ কেবিনটি সংরক্ষিত। জেনানা সঙ্গে থাক-না-থাক।

চৌধুরীসাহেব হাসলেন। বুঝলেন ব্যাপারটা। মাথায় অর্কফলার বিজয় বৈজয়ন্তী সত্ত্বেও লোকটা মুসলমান খদ্দেরকে ফেরাতে চায় না—মুসলমানপ্রীতিতে নয়—ব্যবসায়িক হেতুতে। তাই কেবিনের মাথায় যদিও লেখা আছে 'মহিলা', তবু ঘরটা অন্য প্রয়োজনেও ব্যবহৃত যেমন, চৌধুরীসাহেবের মতো মৌলবাদী সাজ-পোশাকে যারা পথেঘাটে ঘোরা-ফেরা করেন। যাঁদের দেখলেই বোঝা যায়ঃ 'নেড়ে'! তালশিরের টুপিতে, দাড়িতে!

বিশ্বনাথকে নিয়ে উনি মহিলা-কেবিনে গিয়ে বসলেন। দোকানের ছোকরা চাকর ফ্যানটা খুলে দিল, টেনে দিল পর্দাটা। দোকানের বৃহত্তর অংশে যেসব হিন্দু মেহ্‌মান বসেছেন তাঁদের চোখের আড়ালে পড়লেন ওঁরা দু'জন।

চৌধুরী ছয়খানা করে হিঙের কচুরি, আলুর দম আর জিলাবির অর্ডার দিলেন।

বিশ্বনাথ বললে, অ্যাত কে খাবে?

উনি সে কথার জবাব না দিয়ে বললেন, জুলেখার খসম্ কোথায়?

—লেখার কোনো স্বামী নেই, স্যার।

—মারা গেছে? লেখা কি বিধবা?

—না না, মারা যাবে কেন? রসিদ লেখাকে তালাক দিয়ে দিয়েছে।

—রসিদ? ওর স্বামীর নাম রসিদ? কী করত সে?

—আজ্ঞে হাঁ। রসিদ আহ্‌মেদ। রাজপুরে ওদের আদিবাড়ি। ও এই ভাগলপুরেই একটা গ্যারেজে কাজ করত। ওর বাবার মোটরগাড়ি সারানোর রিপেয়ারিং গ্যারেজ আছে। ও নিজে মোটর মেকানিক। অটোমোবাইল এঞ্জিন রিপেয়ারিঙের কাজ জানত। ভাল ফুটবলও খেলতো—সেন্টার হাফে। কী করে ওদের প্রেম-মহব্বৎ হয়েছিল জানি না। লেখা তো আমার সঙ্গেই বাবুপুর থেকে বাসে করে আসত। কিন্তু একসঙ্গে ফিরত না। ও একটা কোচিং-ক্লাসে পড়ত। আসলে সেটা মিছে কথা। ও কলেজ পালিয়ে রসিদের সঙ্গে ম্যাটিনি শো দেখত! ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে যাওয়ায় বাবা একদিন লেখাকে ধরে বেধড়ক পিটল। ব্যস্! পরদিনই সে হাওয়া! থানা কেস নিলই না। থানা অফিসার ছিলেন মুসলমান। তাঁর যুক্তিঃ লেখা প্রাপ্তবয়স্কা।

ইতিমধ্যে খাবার এসে গেছে। চৌধুরী সাহেব রাতের খাবার ঐ দোকানেই সেরে নিলেন। বাড়িতে অবশ্য হাতে গড়া রুটি আর তরকারি বানানো আছে। নষ্ট হবে না।

সেটা দিয়ে কাল নাস্তা সারা যাবে। উনি জানতে চাইলেন, ওরা সাদী করেছে, কতদিন আগে?

—বছর দুই।

—তারপর? রসিদ ওকে তালাক দিল কেন?

—সেটা স্যার, ঠিক জানি না আমি। লেখা খুব বড় জাতের কোনো অন্যায় করেছিল নিশ্চয়।

—তারপর? সেই দুঃখেই কি ও বিষ খেয়েছে?

—সেটা তো আছেই। তাছাড়াও ওর ভোগান্তি তো বড় কম হয়নি। দোরে দোরে ভিখারির মতো ঘুরেছে। কেউ ঠাঁই দেয়নি।

সব কথা বিশ্বনাথ জানে না। কারণ বাড়ির সঙ্গে—বাবা-মা, দাদা-বৌদির সঙ্গে ওর নিজেরও সদ্ভাব নেই। ওর অপরাধ—ব্রাহ্মণ সন্তান হওয়া সত্ত্বেও সে প্রেমে পড়ে কলেজের এক সহপাঠিনীকে বিবাহ করেছে। মেয়েটি অব্রাহ্মণ, জাতে উগ্রক্ষত্রিয়। ফলে বাবুপুরের পৈত্রিক ভিটা ছেড়ে ও চলে এসেছে, অগতির গতি ভাগলপুর শহরে। এখানে একটা প্রেস-এ প্রুফ-রীডার। ওর স্ত্রী অবশ্য স্কুলটীচারীর একটা কাজ পেয়েছে। বিশ্বনাথ স্পষ্ট করে বলেনি, তবে চৌধুরী সাহেব আন্দাজ করে নিলেন—যেহেতু গৃহিণীর উপার্জন কর্তার চেয়ে বেশি, তাই ঘরওয়ালীর ইচ্ছানুযায়ীই বিশ্বনাথকে দুনিয়াদারী করতে হয়। ওদের একটি সন্তানও হয়েছে। কয়েক মাস বয়স। ওর স্ত্রী এখনো মেটার্নিটি লীভে!

চৌধুরী জানতে চাইলেন, তো সদর দরজায় চাবি দিয়ে তোর বউ কোথায় গেছে? এত রাগই বা হলো কেন তার?

—লেখা ভাল হয়ে উঠলে তাকে আমাদের বাড়িতে আশ্রয় দেব বলেছিলাম বলে। গেছে বাপের বাড়ি।

মর্মাহত হলেন চৌধুরী সাহেব। হিন্দু-মুসলমানের সম্প্রীতির জন্য তিনি অনেক চেষ্টা করেছেন, অনেক নির্যাতনও সহেছেন। এ বিষয়ে তাঁর মতাদর্শ অত্যন্ত উদার। তাই এ খবরে ওঁর মনটা খারাপ হয়ে গেল।

আহারান্তে বললেন, তুই আমার বাড়িতে চল বিশু। জানিসই তো আমি একা থাকি!

সে কথা জানা ছিল না বিশ্বনাথের। তবু বললে, আপনার কোনো অসুবিধা হবে না তো?

—কিসের অসুবিধা? আমি একা মানুষ। আমার একটা নেয়ারের খাট আছে। বাড়তি মশারিও আছে। তুই বাইরের ঘরে শুবি। রাতের খাবার তো মোটামুটি হয়েই গেল। কাল সকালে দু'জনে নাস্তাপানি সেরে আবার হাসপাতালে এসে খবর নেব—জুলেখার অবস্থার কোনো পরিবর্তন হয়েছে কি না।

বিশ্বনাথ রাজী হয়ে গেল। বললে, কাল রাতে দু' চোখের পাতা এক করতে পারিনি, স্যার। হাসপাতালের ঐ ওয়েটিং হলে কী মশা! এক-একটা চড়াই পাখির মতো!

হাসলেন চৌধুরী সাহেব ওর উপমাটা শুনে।

দুই

জামালউদ্দীন চৌধুরীর আবাসস্থল শহরের একান্তে। গঙ্গার ধারে। জায়গাটার নাম 'বড়িবিবিমহল্লা'। কোন নবাব, বা আমীর-ওমরাহের বড়বিবির স্মৃতিবিজড়িত তার হদিস পাওয়া যায় না। কিন্তু ঐ মহল্লাটা মুসলমান-অধ্যুষিত। বিশ-পঁচিশটি দ্বিতল ও ত্রিতল বাড়ি। এক-এক মোকামে তিন-চারটি পরিবার। মহল্লার একদিকে গঙ্গা, বাকি তিনদিকে হিন্দুপাড়া। জামাল সাহেব থাকেন স্থানীয় এক হেকিমের দ্বিতল মোকামের একতলায়। দুখানি ঘর নিয়ে। একতলায় অবশ্য তিনটি কামরা—তৃতীয়টি হেকিম সাহেবের দাওয়াখানা।

জামালউদ্দীন হেকিম সাহেবের ভাড়াটিয়া এ-বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু মাসিক কত ভাড়া দেন সেটা হিসাব করতে হলে একটা জটিল অঙ্কের মাধ্যমে তা নির্ধারণ করতে হবে। প্রথম কথা, হেকিম সাহেব থাকেন দ্বিতলে—স্ত্রী-পুত্রবধূ-নাতি এবং এক স্বামীত্যক্তা কন্যাকে নিয়ে। পুত্রটি পাটনায় চাকুরিরত—মাঝেমাঝে সপ্তাহান্ত কাটিয়ে যায়। অধ্যাপকমশায়ের নাস্তা এবং রাতের আহার্য উপর থেকে নিচে নিয়ে আসে হেকিম সাহেবের সাত বছরের নাতি আবদুল—যে নাকি আবার চৌধুরী সাহেবের ছাত্র। স্কুলে পড়ে—কিন্তু সকালে বা সন্ধ্যায় তাকে পড়তে আসতে হয় অধ্যাপকমশায়ের কাছে। ফলে, জামাল সাহেব ঠিক ভাড়াটিয়া নন, বলা যায় পেয়িং-গেস্ট। আবার ওদিক থেকে তিনি 'আতালিক' অর্থাৎ রেসিডেনশিয়াল প্রাইভেট টিউটার।

জামাল সাঁহেবের আদিবাড়ি চান্দেরী গ্রামে। ভাগলপুর শহর থেকে প্রায় বিশ কিলোমিটার দূরে। ভাগলপুর থেকে সুলতানগঞ্জ বা মুঙ্গের যাবার পাকা সড়কের ধারে পাশাপাশি তিনটি চাষীপ্রধান বর্ধিষ্ণু গ্রাম। বাবুপুর, চান্দেরী আর রাজপুর। বাবুপুর হিন্দুপ্রধান গ্রাম—অবশ্য গ্রামের একান্তে আট দশ ঘর মুসলমানের বাস। অধিকাংশই মজুরচাষী—হেঁদু জোতদারের ক্ষেতে দৈনিক হারে মজুরি খাটে। চান্দেরী গ্রামটিতে মুসলমান অধিবাসীর অনুপাত কিছু বেশি। শতকরা পঁচিশ ঘর মুসলমান। এদের অবস্থা অপেক্ষাকৃত ভাল। কারণ এরা অধিকাংশই জোলা বা তাঁতি। নিজস্ব তাঁত খুব অল্প লোকেরই আছে। সুতার যোগান দেয় রাজপুর গ্রামের মহাজনেরা। তৈরি মাল নিয়েও যায় তারা—হাটে-বাজারে বেচতে। রাজপুর পুরোপুরি মুসলমান গ্রাম। হিন্দু একঘরও নেই। এভাবে মেরুকরণ হয়েছে স্বাধীনতার ঠিক পূর্বযুগে। 1945-এর ভাগলপুর দাঙ্গার পর। অবশ্য তারপর এই দীর্ঘ চার দশক এ-অঞ্চলে আর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা হয়নি। ওরা শান্তিতেই বাস করে পাশাপাশি গ্রামে।

জামালউদ্দীনের বাপজান চান্দেরী গাঁয়ের নামকরা লোক: পীরসাহেব। 'পীর' ঠিক নন, তিনি হচ্ছেন প্রাক-স্বাধীনতা যুগের মহা শক্তিধর 'সাঁইপীরের' খাদিম অর্থাৎ সেবক। সাঁইপীরের আজ্ঞাবহ একজোড়া জিন ছিল; তাদের মাধ্যমে তিনি অনেক বুজুর্গের মোজেজা দেখিয়ে গেছেন। অর্থাৎ দিব্যশক্তির ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রমাণ। জামালের আব্বাজান তাঁরই খাদিম। দাবী করতেন, পীরবাবা তাঁকে উত্তরাধিকার সূত্রে ঐ জিনজোড়াকে উপহার দিয়ে গেছেন। সেই সুবাদে আব্বাজান মাথায় রেখেছিলেন পিঙ্গল জটা, পরনে গেরুয়া লুঙ্গি। মুসলমান সমাজের অনেকেই তাঁর ফুঁ-পাড়া পানি, কবচ-মাদুলি নিয়ে যেতেন। সেটাই তাঁর উপার্জন। আব্বাজান সন্ন্যাসী ছিলেন না তা বলে। জামালউদ্দীনের আম্মাজানের বেহেস্ত গমনের আগেই—যখন তিনি শয্যাশায়ী, উত্থানশক্তি-রহিতা—তখনই তিনি জামালের বিমাতাকে নিকা করে ঘরে এনেছিলেন। তখন জামালের বয়স

আট।

জামাল তাঁর বাবাকে শ্রদ্ধা করতে পারেননি কোনোদিনই। বাল্যকাল থেকেই তাঁর মনে হতো ঃ তাঁর রোগজীর্ণা জননী উপেক্ষিতা। বাপের ঐ সব ঝাড়ফুঁক, জলপড়া আর মাদুলি-কবচেও তাঁর আস্থা ছিল না। জননীর পরলোক গমনের সঙ্গে সঙ্গে, মাকে মাটি দিয়েই, সংসার ত্যাগ করেছিলেন জামাল। তখন তাঁর বয়স দশ।

প্রথমে এক ট্রাক-ড্রাইভারের শাগরেদি। পেটভুক্তি—বিনা মাহিনায়, তাঁকে নানান কাজ করতে হতো। গাড়ি ধোয়া থেকে ড্রাইভার সাহেবের দেহে তৈলমর্দন। কয়েক মাসের মধ্যেই সে কাজ ছেড়ে চলে আসেন ভাগলপুরে। একটি মুসলমান হোটেলে ছোকরা চাকরের কাজ করতে। সেখান থেকে চলে আসেন এক উকিলবাবুর মোকামে। অ্যাডভোকেট জলিল সাহেবের বাড়ির চাকর হিসাবে।

এখানেই তাঁর ভাগ্য ফিরে যায়। অ্যাডভোকেট সাব ওঁর বুদ্ধিসুদ্ধি দেখে চাকরের পদ থেকে উন্নীত করলেন সংবাদবহের পদে—মেসেঞ্জার পিয়ন। অচিরেই উকিলবাবুর নজর হলো ঐ নিরক্ষর ছেলেটা নিজের চেষ্টায় হিন্দিটা শিখে ফেলেছে—সে সাক্ষর! জলিলউদ্দীন গুণীর কদর করতে জানতেন, নিঃসন্তান ভদ্রলোক ওঁকে ভালও বেসে ফেলেছিলেন। কোথাও কিছু নেই একদিন ধেড়ে বয়সে জামালকে স্কুলে ভর্তি করে দিয়ে এলেন। বললেন, তুই লেখা-পড়া শেখ। তোকে আমি উকিল বানিয়ে ছাড়ব।

উকিল অবশ্য হতে পারেননি জামাল সাহেব—চেষ্টাও করেননি। উনি যে বছর এম. এ. পাশ করেন সে বছর বেহেস্তে চলে যান জলিলউদ্দীন অ্যাডভোকেট-সাব।

উকিলবাবুর বিষয়-সম্পত্তি অবশ্য কিছুই পাননি তিনি। সেসব দখল করেছে তাঁর রিস্তেদারেরা, আইন-মোতাবেক। কিন্তু জামালউদ্দীন তাঁর পালকপিতাকে আজও সমান শ্রদ্ধা করেন। তাঁর প্রয়াণ-তিথিতে আজও জামাল সাহেব একদিনের জন্য ছুটি নেন। সমস্ত দিন উপবাস করেন। সূর্যোদয়ের আগে ভাগলপুরের জামা-মসজিদে পৌঁছে যান ফজরের নামাজে যোগ দিতে। ফিরে আসেন সন্ধ্যার নামাজের পর। দিনটি বিকিয়ে দেন মৌনভাবে ঈশ্বর চিন্তায়—'ইত্তেকাফ' করে—ঐ প্রয়াত আত্মার শান্তিকামনায়, শ্রদ্ধাবিনম্র হৃদয়ে।

বিশ্বনাথকে নিয়ে এলেন বড়িবিবিমহল্লায়, নিজের মোকামে। বললেন, বিশু, তুই বাইরের ঘরে নেয়ারের খাটটা পেতে নে। মশারি খাটিয়ে শুয়ে পড়। তোকে খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছে।

বিশ্বনাথ বলে, স্যার, লেখার কী হবে? ওর তো কোথাও ঠাঁই হবে না!

জামাল সাহেব বললেন, আল্লাতালার দুনিয়াটা কি এতই ছোট? রসিদ ওকে 'তালাক' দিয়েছে বলে ওর জীবনটাই কিছু বরবাদ হয়ে যায়নি। ওকে বোঝাতে হবে, মনে সাহস ফিরিয়ে আনতে হবে। বাঁচবার সদিচ্ছাটা ওর মনে জাগ্রত করতে হবে। তুই কার কাছে খবর পেলি?

বিশ্বনাথ যা এলোমেলোভাবে বললে তা থেকে এটুকু বোঝা গেল যে, রসিদ যখন জুলেখাকে 'তালাক' দেয় তখন ওরা ছিল গ্রামের বাড়িতে। কী একটা উৎসবের ছুটিতে ওরা সবাই গাঁয়ের বাড়িতে গিয়েছিল। সেখানেই—যেটুকু শুনেছে বিশ্বনাথ—জুলেখা কী একটা জঘন্য অপরাধ করে ফেলে। ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে যায়। পুত্রবধূকে তো দৈহিক শাসন করা যায় না—তাই রসিদের বাবা, আলিজান, পাঁচ মেহ্‌মানের সামনে রসিদের গালেই বসিয়ে দেয় এক বিরাশি-সিক্কার থাপ্পড়। বলে, হেঁদুর মেয়ে সাদি করার শখ মিটেছে? যা দূর হয়ে যা তোরা দুটোই!..রসিদের সমস্ত আক্রোশটা গিয়ে পড়ে জুলেখার ওপর। সে এক উঠোনভর্তি মেহ্‌মানের সামনে তিন-তিনবার 'তালাক' উচ্চারণ করে তার স্ত্রীকে বর্জন করে।

—তারপর? এক উঠোনভর্তি মানুষ তারপর কিছু করল না?

—কী করবে? রসিদ ওকে তালাক দেবার পর তো সে আর আলিজান সাহেবের পুত্রবধূ নয়। পরিবারের দৃষ্টিতে সে এক 'বেগানা' মেয়ে। তাই ওরা তাকে বাবুপুরে গ্রামে পৌঁছে দিয়ে আসে।...বাকিটা কাল বলব, স্যার! আমার ভীষণ ঘুম পাচ্ছে। গতকাল দু'চোখের পাতা এক করতে পারিনি।

—ঠিক আছে। তুই শুয়ে পড়।

লাইব্রেরি থেকে বইটা বদলে আনা হয়নি। এত সন্ধ্যা রাতে ওঁর শোওয়ার অভ্যাস নেই। বিশ্বনাথ শুয়ে পড়ার পর উনি বাইরের বারান্দায় একটা ক্যাম্বিসের ইজিচেয়ার পেতে বসলেন। এই বারান্দা থেকে গঙ্গা দেখা যায়। সন্ধ্যা হয়ে গেছে। তবু বেশ কিছু নৌকা ভাসছে মাঝ গঙ্গায়। অধিকাংশই মাছমারাদের নৌকা। অনেকে সারারাত নদীতেই থাকবে, পরদিন ভাগলপুর বাজারে টাট্‌কা মাছের যোগান দিতে।

জামাল সাহেব বিশ্বনাথের অসমাপ্ত কাহিনীর শেষাংশটা কল্পনায় সম্পূর্ণ করতে থাকেন।

চোখের উপর দেখতে পান, অবগুণ্ঠিতা একটি নতমুখী বালিকাবধূর পিত্রালয় প্রত্যাবর্তনের দৃশ্য। 'বালিকাবধূ' অবশ্য ঠিক বলা যায় না ওকে। স্মৃতিলেখা জহুরা-ফতিমার সহপাঠিনী—তার বয়স আঠারো-বিশ হবেই। তবু মাত্র দু'বছর হলো বিয়ে হয়েছে তার। বিবাহিত জীবনের হিসাবে সে দুই বছরের বালিকা—দাম্পত্যজীবনে হাঁটি-হাঁটি পা-পা শিখতে গিয়ে আছাড় খেয়ে পড়েছে। রাজপুর গ্রামের আট-দশ জন নিশ্চয় ওকে বাসে করে নিয়ে এসেছিল বাবুপুরে। মাইল তিনেকের দূরত্ব। বাসে অনেকেই হয়তো কৌতূহলী হয়েছিল—একটি স্ত্রীলোক-চোরকে কি সবাই থানায় ধরে নিয়ে যাচ্ছে?...তারপর? বাবুপুর স্টপেজে পৌঁছে হয়তো স্মৃতিলেখাই অবগুণ্ঠনের ভিতর থেকে নিম্নকণ্ঠে বলেছিল, আর আপনাদের আসতে হবে না। আমি নিজের বাড়ি চিনে যেতে পারব।...কিন্তু বাসে করে এতদূর যারা এসেছে, তারা কি রাজী হয়েছিল? তামাশাটা না দেখে ফিরে যেতে? 'তামাশা' বইকি! হেঁদু গাঁয়ের বামুনের মেয়ে! প্রেম-মহব্বতের খেল দেখিয়ে বাড়ি ছেড়ে পালালো! বাপ গেল থানায়—খেদিয়ে দিল বড় দারোগা। সেই বিদ্যেধরী আজ 'তালাক' পেয়ে গাঁয়ে ফিরে এসেছে। বামুনবাড়িতে তার অভ্যর্থনাটা কী জাতের হলো সেই তামাশা না দেখে কি ওরা ফিরতে পারে?

তারপর কি মেয়েটি ফিরে আসে ভাগলপুরে?—ছোড়দার কাছে? বিশ্বনাথ দ্বিবেদীর আশ্রয় ভিক্ষা করতে? বিশ্বনাথের স্ত্রী কি ননদকে ঘরে ঢুকতে দিয়েছিল? না কি দোরগোড়া থেকেই হাঁকিয়ে দিয়েছিল?

এভাবে একটি স্নেহাস্পদা ছাত্রীর লাঞ্ছনার কাল্পনিক দৃশ্য মনে মনে আঁকতেও খারাপ লাগল। উনি উঠে চলে গেলেন গঙ্গার ধারে।

পরদিন সকালে উঠেই বিশ্বনাথ তাড়াহুড়া করে হাসপাতালে চলে গেল। নাস্তাপানি না সেরেই।

চৌধুরী সাহেব পীড়াপীড়ি করলেন না। বিশ্বনাথের আপত্তির হেতুটা তিনি বুঝে উঠতে পারলেন না। উগ্রক্ষত্রিয় বংশের এক সহপাঠিনীকে বিবাহ করেছে বলেই সে যে তার 'বামনাই-মৌলবাদের' সম্পূর্ণ উর্ধ্বে উঠতে পেরেছে তার প্রমাণ এখনো পাননি। কাল মিষ্টান্ন ভাণ্ডারে এক টেবিলে খাওয়া অথবা সহোদরা ভগ্নীকে বাড়িতে ঠাঁই দিতে চাওয়ার কথা জানা থাকা সত্ত্বেও।

কিছু পরীক্ষার খাতা দেখার কাজ বাকি ছিল। সারাটা দিন তাতেই কেটে গেল। আজকের দিনটাও বর্ষণমুখর। বর্ষা ক্রমে জাঁকিয়ে নামছে। বিকেলের দিকে বৃষ্টিটা ধরল—বিদায়ী সূর্য একবার মুখ দেখালেন পশ্চিমাকাশে। ঘড়ি দেখলেন চৌধুরী সাহেব। চারটে বাজে। ছাতাটা নিয়ে রওনা হয়ে পড়লেন হাসপাতালের দিকে।

প্রথমেই গেলেন ডক্টর কুমারের কাছে। শুনলেন, রোগিণীর জ্ঞান ফিরেছে। বিপদের আশঙ্কাও আর কিছু নেই। তবে দুর্বল খুব। দু'চার দিন আরও হাসপাতালে রাখা হবে। কোনো নতুন উপসর্গ না হলে বুধবার সকালে ওকে বাড়ি যেতে দেওয়া যেতে পারে।

চৌধুরী জানতে চাইলেন, ওকে হাসপাতালে নিয়ে এসেছিল কে? ভর্তিই বা করালো কে? তার চেয়ে বড় কথা জেনারেল-ওয়ার্ডে না রেখে ওকে তোমরা দেখছি ফিমেল-ওয়ার্ডের কেবিনে রেখেছ। খরচটা কে দিচ্ছে?

ডক্টর কুমার বললেন, তা তো জানি না, স্যার! আমার জানার কথাও নয় অবশ্য। আমার কোনো কৌতূহলও হয়নি।

—কিন্তু আমার হয়েছে, কুমার। তুমি কি খবরটা আমাকে জানাতে পার?

—শিওর!

'এমার্জেন্সি'তে ফোন করলেন। তারা বলতে পারল না। রিসেপশানও নয়। কুমার বললেন, একটু বসুন, স্যার। আমি জেনে এসে আপনাকে জানাচ্ছি। চায়ের কথা বলি?

—না, থাক। চা আমি দিনে দুবারই খাই।

—আমার উপর রাগ করে বলছেন না তো?

—না। রাগ করব কেন? ও! বুঝেছি। সেই তোমার কালকের কথায়? না, কুমার। সেজন্য আমি রাগ করিনি। যাও জেনে এস। আমি অপেক্ষা করছি।

ডক্টর কুমার মিনিট দশেকের মধ্যেই ফিরে এলেন। বললেন, এমার্জেন্সির রেকর্ড অনুযায়ী ওকে অজ্ঞান অবস্থায় সাইকেল রিকশা করে পৌঁছে দিয়ে যায় পাড়ার লোক। একজন নাম-ঠিকানা, বয়স ইত্যাদি জানায়। কেবিন ভাড়াও সে অগ্রিম দিয়ে গেছে সাত দিনের।

—কী নাম লোকটার?

—রসিদ আহ্‌মেদ।

—আই সী! কে হয় সে জুলেখার?

—না, সম্পর্ক কিছু নেই। প্রতিবেশী বোধহয়।

—তাহলে খুব উদার প্রতিবেশী বলতে হবে! অতগুলো টাকা! লোকটা আর আসেনি খোঁজ নিতে? তার প্রতিবেশিনী বাঁচল কি মরল জানতে?

ডক্টর কুমার মেদিনীনিবদ্ধ দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ কী যেন ভেবে নিয়ে বললেন, লোকটার উপাধি আহ্‌মেদ! তার মানে কি রোগিণীর প্রাক্তন স্বামী?

চৌধুরী সাহেব উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, আমার তাই মনে হয়। যাকে ভালবেসে বিয়ে করা জুলেখার জীবনের সবচেয়ে বড় ভ্রান্তি বলে মনে কর তুমি ' মনে হয় সেই ছেলেটিই।

ডক্টর কুমার কোনো জবাব দিলেন না। চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন।

চৌধুরী জানতে চাইলেন, 'নো ভিজিটার্স' বোর্ডটা কি এখনো টাঙানো আছে ওর ঘরে? না হলে একটু দেখা করে যেতাম।

—না, স্যার। আজ পেশেন্ট ভালই আছে। যান, দেখা করে আসুন। তবে ওকে বেশি কথাবার্তা বলতে দেবেন না। ওর শরীর এখনো দুর্বল! আপনি নিজেই বেশি কথাবার্তা বলবেন।

—থ্যাঙ্কস, ডক্টর।

সিঁড়ি বেয়ে উঠে এলেন দ্বিতলে। চিহ্নিত কেবিনের সামনে থমকে দাঁড়ালেন। মনে হলো ঘরের ভিতর একজন দর্শনার্থী ইতিপূর্বেই প্রবেশ করেছে। নিশ্চয় বিশ্বনাথ। উনি ইতস্তত করছিলেন। হঠাৎ কানে গেল রোরুদ্যমানা একটি স্ত্রীলোকের কণ্ঠস্বরঃ কেন? কেন? কেন? কেন এভাবে বাঁচিয়ে তুললে আমাকে? কে বলেছিল দয়া দেখাতে? আমি তো সুযোগ পেলেই আবার বিষ খাব। অনর্থক এভাবে টাকা নষ্ট করতে কে বলেছিল তোমাকে?

চৌধুরী সাহেব নিজেকে সংশোধন করলেন। সম্ভবত বিশ্বনাথ নয়, ঘরের ভিতর যে আছে, তার নাম 'রসিদ আহ্‌মেদ'। তার কণ্ঠস্বর শোনা গেল না কিন্তু। বরং পরক্ষণেই চমকে উঠলেন জুলেখার তীব্র তিরস্কারে! ছিঃ! আমাকে ছুঁয়ো না তুমি! তুমি না মুসলমান? জান না, 'তালাক' দেবার পর তুমি আমার কাছে পরপুরুষ!

চৌধুরী সাহেব মনস্থির করলেন। হাফ-সুইং ডোর ঠেলে ভিতরে যেতে চাইলেন। এ জাতীয় উত্তেজনা রোগিণীর স্বাস্থ্যের পক্ষে মারাত্মক। কিন্তু তার পূর্বেই তাঁকে ঠেলে ঘরের ভিতর ঢুকে গেলেন একজন সিনিয়ার নার্স। সম্ভবত জুলেখার উচ্চকণ্ঠ শুনেই তিনি ছুটে এসেছেন। তিনিও পুরুষটিকে ভর্ৎসনা করলেন, আপনার কোনো কাণ্ডজ্ঞান নেই? বলে গেলাম যে না, ওকে উত্তেজিত করবেন না। যান বাইরে যান। আমি ওকে ঘুমের ইন্‌জেকশান দেব।

পরমুহূর্তেই নতমস্তকে কেবিন থেকে বার হয়ে এল বছর ত্রিশের একজন স্বাস্থ্যবান নওজোয়ান। বিশ্বনাথ বলেছিল ও ভাল ফুটবল খেলত। এখন নিশ্চয়ই খেলে না। কিন্তু শরীরে একবিন্দু মেদ জমেনি। ছয় ফুটের মতো লম্বা। পরনে প্যান্ট আর বুশশার্ট।

কেবিন থেকে বের হতেই চৌধুরী বললেন, প্লীজ, মিস্টার রসিদ আহ্‌মেদ! আপনার সঙ্গে দু'-একটা খুব জরুরী কথা ছিল।

. রসিদ ওঁকে আপাদমস্তক দেখে নিয়ে বললে, এক্সকিউজ মি, স্যার। আপনার সঙ্গে আমার পরিচয় আছে বলে তো মনে পড়ছে না?

—না নেই। আমার নাম ডক্টর জামালউদ্দীন চৌধুরী। আমি তেজনারায়ণ জুবিলি কলেজে ইংরেজির অধ্যাপক। স্মৃতিলেখা, আই মীন জুলেখা, আমার ছাত্রী ছিল। ওর দাদা বিশ্বনাথ দ্বিবেদীও আমার

প্রাক্তন ছাত্র।

—ও বুঝেছি! আদাব। আপনি কি জুলেখার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন?

—তাই এসেছিলাম। কিন্তু নার্স ওকে এখন ঘুমের ইন্‌জেকশান দিচ্ছেন—ওকে এখন ডিসটার্ব করব না। আপনি যদি কাইন্ডলি...

—আমার সঙ্গে আপনার কী প্রয়োজন?

—সেটা ব্যাখ্যা করার উপযুক্ত স্থান কি এই হাসপাতালের ফিমেল-ওয়ার্ড?

—অলরাইট। আসুন। আমরা নিচে যাই।

নেমে এলেন দু'জনে। হাসপাতালের সামনে লোকজনের ভিড়। ভিজিটিং-আওয়ার্স চলছে। মানুষজন আসছে, যাচ্ছে। মেওয়া-ওয়ালা, ডাব-ওয়ালা এমনকি ফুচকা-বাটারাপুরির অস্থায়ী দোকান। এখানে কথাবার্তা হতে পারে না। সামনের মিষ্টান্ন ভাণ্ডারেও যেতে চাইলেন না আজ। রাস্তাটা পার হয়ে একটা পার্কে ঢুকলেন। বৃষ্টিতে কিছু কিছু জল জমেছে। তবে বিদায়ী সূর্যের শেষ আশীর্বাদে পার্কের বেঞ্চিগুলো আর ভিজে নেই। ঘটনাচক্রে একটি খালি পাওয়া গেল। দু'জনে গিয়ে বসলেন। রসিদ আহ্‌মেদ বললে, এবার বলুন? কী জানতে চাইছিলেন?

—যে কোনো কারণেই হোক আপনি আপনার ভূতপূর্বা স্ত্রীকে 'তালাক' দিয়ে দিয়েছেন। শরিয়তি কানুনে জুলেখা এখন আপনার কাছে একজন নিঃসম্পর্কিতা 'মহিলা'। আপনি জানেন, মাত্র দু'বছর আগে যে মেয়েটি মুসলিম-ধর্ম গ্রহণ করেছে সেই মেয়েটির ঐ কথাটা কী পরিমাণে মর্মান্তিক সত্য! ওর চোখে আপনি পরপুরুষ। তবু মনে হচ্ছে, নির্জন কেবিনে আপনি ওর হাত ধরেছিলেন....

—আপনি কি সেজন্য আমার কাছে কৈফিয়ৎ তলব করছেন?

—করলেও সেটা অন্যায় হতো না। একজন মুসলমান হিসাবে, একজন ভারতীয় নাগরিক হিসাবে আমার কর্তব্য দেখা যে, কোনো ভারতীয় নারীর দেহ তার অনিচ্ছায় কোনো পরপুরুষ যাতে স্পর্শ না করে! কিন্তু সে প্রশ্ন আমি তুলছি না। আমি একথাও জানতে চাইছি না—জুলেখার কোন অপরাধে আপনি তাকে এতবড় মর্মান্তিক শাস্তি দিলেন—একথা জেনেও যে, সেই কট্টর

হেঁদুর হতভাগিনী মেয়েটার এ দুনিয়ায় আর কোথাও দাঁড়াবার ঠাঁই নেই!

—তবে কী জানতে চাইছেন আপনি?

—ঠিক যে কথা পাঁচ মিনিট আগে জানতে চেয়েছিল জুলেখা! কেন ওকে হাসপাতালে নিয়ে এলেন? কেন কেবিন ভাড়া অগ্রিম জমা দিলেন? কেন ওকে শান্তিতে মরতে দিলেন না?

রসিদ রুখে ওঠে, ও মরলেই কি আপনি খুশি হতেন?

—আমি হতাম কিনা সেটা প্রশ্ন নয়, মিস্টার আহ্‌মেদ। জুলেখা হতো। তার সব জ্বালাযন্ত্রণা নিমেষে জুড়িয়ে যেত। একজন স্পোর্টসম্যানের জীবনসঙ্গিনী হবার সৌভাগ্য লাভ করেছিল যে মেয়েটি, তাকে বাকি জীবন ফুটপাতের ধারে বসে ভিক্ষা চাইতে হতো না। এটা কি কম বড় প্রাপ্তি?

রসিদ মাথা নিচু করে কী যেন ভাবল। তারপর বলল, আপনি আন্দাজ করতে পারেন, ও কত বড় অপরাধ করেছিল?

—না, পারি না। সে-কথা আমি শুনতেও চাই না। নিশ্চয় খুবই গুরুতর অপরাধ। শুনেছি সেজন্য পাঁচ-মেহ্‌মানের সম্মুখে আপনার আব্বাজান আপনার গায়ে হাত তুলেছিলেন। এবং আপনি হিতাহিত-জ্ঞানশূন্য হয়ে স্ত্রীকে 'তালাক' দিয়েছিলেন। তার অপরাধটা কি আমি জানতে চাই না, আমার কোনো কৌতূহল নেই। দ্যাটস্ এ ক্লোজড চ্যাপটার! সে অন্যায় করেছে, আপনি শাস্তি দিয়েছেন। ব্যস্!

—তাহলে কী আপনার জিজ্ঞাস্য?

—আগেই তা বলেছি। জুলেখার উত্থাপিত প্রশ্নটার জবাব আপনি তাকে দিয়ে আসেননি। সেটা আমাকে বলুন। ও একটু ভাল হলে ওকে আমি জানিয়ে দেব। এজন্যই আপনাকে এই একান্তে ডেকে এনেছি।

রসিদ উঠে দাঁড়ায়। বলে, তার দরকার হবে না, প্রফেসর সাহেব! সেটা সুযোগমতো আমিই জুলেখাকে জানিয়ে দেব।

চৌধুরীও উঠে দাঁড়ান। জোরের সঙ্গে বলেন, না! নো! অ্যান এম্‌ফ্যাটিকঃ নো! আমি আপনাকে সাবধান করে দিচ্ছি, মিস্টার রসিদ আহ্‌মেদ! আপনি আমার ছাত্রীর সঙ্গে ভবিষ্যতে কোনোদিন দেখা করতে আসবেন না। একান্তে কোনো কথা বলার চেষ্টা করবেন না। সেটা শরিয়তি-কানুন বিরুদ্ধ। আমি আপনাকে আবার সাবধান করে দিচ্ছি। আমি ভাগলপুর জামা-মস্‌জিদের বড়া-ইমাম মৌলানা নাসিরউদ্দীন আফান্দির কাছে আপনার নামে ফরিয়াদ আনব। শরিয়তি কানুনে আপনার কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করব!

—আপনি কি আমাকে ভয় দেখাচ্ছেন?

—নিশ্চয় নয়। আপনি মস্ত অ্যাথলেট। অসীম আপনার দৈহিক ক্ষমতা! ভয় দেখাব কেন? তবে টি. ভি. সিরিয়ালের ঐ টিসম্-টিসম্ মারপিট নয়—জামা-মস্‌জিদের বড়া-ইমামের শরিয়তি 'নসিহত'কে যদি ভয় করেন তাহলে—আবার আপনাকে সাবধান করে দিচ্ছি ঃ আপনার প্রাক্তন স্ত্রীর সঙ্গে যোগাযোগের কোনো চেষ্টা করবেন না। আপনি যদি চান, কলেজে আমার সঙ্গে দেখা করবেন। কেবিন ভাড়া আপনি যা দিয়েছেন তা আমি ইন্‌স্টলমেন্টে শোধ করে দেব। আমার আর্থিক সঙ্গতি অল্প। অনেক দান-খয়রাত করতে হয় আমাকে। তাই এক লপ্তে অতগুলো টাকা দিয়ে দিতে পারব না।

নতমস্তকে রসিদ অনেকক্ষণ কী ভাবল।

তারপর বলল, আগামী সপ্তাহে ওকে হাসপাতাল থেকে রিলিজ করে দেবে। ওকে কীভাবে 'রি-হ্যাবিলিটেট' করা যায় তা কি আপনি ভেবেছেন, প্রফেসর চৌধুরী?

—দ্যাটস্ নান্ অব য়োর বিজনেস্!

তিন

সাতদিন পরের কথা। এ সাতদিনে ভাগলপুরের গঙ্গা দিয়ে অনেক জল সমুদ্রের দিকে চলে গেছে। আবার গাঙ্গেয় উপত্যকার ছোটখাটো নদীপথে বর্ষার জলধারা এসে জমেছে গঙ্গায়। মা গঙ্গা ভাদ্রে প্রতিবছর কূল ছাপিয়ে শহরে ঢুকে পড়েন। দু-পাশের গ্রাম বন্যার জলে ভাসতে থাকে। আশ্বিনে সেই অভিশাপ অন্তর্হিত হয়ে গেলে দেখা যায় ধানের জমিতে মা গঙ্গার পলিমাটির আশীর্বাদ। এ খেলা চলেছে স্মরণাতীত কাল ধরে।

বিশ্বনাথের স্ত্রী রত্না ফিরে এসেছে বাপের বাড়ি থেকে। ফলে বিশ্বনাথ দ্বিবেদী আর অনিকেত নয়। ননদের ঝামেলা ওকে সইতে হবে না এ কথা জানতে পারার পর রত্না তার মরদকে মাফি করে দিয়েছে। এক রাত হাসপাতালে, ছ রাত জামাল স্যারের বাড়িতে বাস করে সে চলে গিয়েছিল শ্বশুরবাড়ি। শ্বশুরমশাই একটু ধমকের সুরেই বলেছিলেন, বাবাজীবন, তোমার নষ্টা ভগ্নী যে পাপ কাজ করেছে তার জন্য তুমি কেন নিজের জাত খোয়াতে বসেছিলে, বল তো? যে মেয়ে কুলত্যাগিনী তার তো ঐ রকম পরিণাম হবেই! রত্না তো বুদ্ধিমতীর মতো কাজ করেছে—ঘরে তালা দিয়ে সোজা আমার কাছে চলে এসেছে।

বিশ্বনাথ 'রামগঙ্গা' কিছুই বলেনি। মেয়ে-বউকে নিয়ে বাড়িতে ফিরে এসেছে। দরজার সামনে পড়ে আছে তিন দিনের খবরের কাগজ আর পলিথিন ব্যাগে টকে-যাওয়া দুধ। মেঝেতে ধুলোর আস্তরণ। সারাটা দিন গেল সাফ করতে। সুযোগ মতো রত্না জানতে চাইল—শেষ পর্যন্ত লেখা গেল কোথায়? নাকখৎ দিয়ে শ্বশুরবাড়িতেই তো?

বিশ্বনাথ বললে, না। মুসলমান মেয়েদের দুর্ভাগ্য তাদের হেঁদু বহিনদের চাইতে কিছু বেশি। আমাদের ঝগড়া হয়, মিটমাটও হয়—ওদের একবার তালাক হয়ে গেলে আর ফেরার পথ থাকে না। ওর 'শ্বশুরবাড়ি' বলে এখন কিছু নেইই। ও সেখানে যাবে কী করে?

—তাহলে? বাবুপুর থেকে তো ঝাঁটালাথি খেয়ে ফিরে এসেছে। তাহলে লেখা গেল কোথায়? হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাবার পর?

বিশ্বনাথ গম্ভীর হয়ে বললে, ঐ হাসপাতালের সামনেই ফুটপাতে বসে গেছে।

—ফুটপাতে বসে গেছে! সেখানে বসে কী করছে?

—নষ্টা, কুলত্যাগিনী মেয়েরা অন্তিমে যা করে—ভিক্ষে।

রত্না পুরো দশ সেকেন্ড তার স্বামীর দিকে নির্নিমেষ তাকিয়ে রইল। বুঝতে পারল না—ও সত্যি বলছে না বানিয়ে। একটু নরম সুরে বললে, অমন করে বলছ কেন? মোছলমানকে বিয়ে করেছে, জাত দিয়েছে—'নষ্টা' সে হতে যাবে কেন?

—কথাটা তোমার বাবাকে বুঝিয়ে বল। বিশেষণটা তিনিই প্রয়োগ করেছিলেন প্রথম। আমি গুরুজনের কথা 'রিপীট' করছি শুধু।

রত্না বুদ্ধিমতী। বুঝে নিল, বর্তমান পরিস্থিতিতে এ নিয়ে আর বেশি ঘাঁটাঘাঁটি করা ঠিক নয়। ননদিনী হতচ্ছাড়ির শেষ গতিটা কী হলো তা দু'দিন পরেই জানা যাবে। বিশ্বনাথ নিজে থেকেই বলবে। আপাতত ও প্রসঙ্গটা চাপা দেওয়াই সুবুদ্ধির পরিচায়ক। তিন দিন বিরহের পর ঐ মর্মান্তিক বিষয় নিয়ে আর আলোচনা করা ঠিক নয়। সে গা ধুতে গেল।

জুলেখা চিনতে পেরেছিল দর্শনমাত্র। আদাব জানিয়ে বলেছিল, ছোড়দা ও-বেলা বলে গেছিল ও বৌদিকে আনতে যাবে, বিকালে আসবে না। আরও বলেছিল, আপনি আসবেন আজ, আমার সঙ্গে দেখা করতে।

—জহুরা বা ফতিমা আসেনি?

—হ্যাঁ, ওরাও এসেছিল কাল। অনেক গল্প করল কলেজের।

জামাল সাহেব বলেন, তোমার ছোড়দা বুঝি আজ তোমার ভাবীকে আনতে গেছে? বেচারির খুব ভোগান্তি গেল ক'দিন, সদর দরজার চাবি না থাকায়। এক পোশাকে—না স্নান, না মুখ ধোওয়া—

জুলেখা আজ পিঠে বালিশ দিয়ে আধশোয়া হয়ে বসেছে। মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললে, হ্যাঁ, ছোড়দা বলছিল ওর পকেটে পয়সাও তেমন ছিল না। আপনার বাড়িতে আশ্রয় না পেলে ওকে খুবই আতান্তরিতে পড়তে হতো.....

—কেন? সোজা শ্বশুরবাড়িতে চলে গেলেই পারত। ওর স্ত্রী তো আর ওকে 'তালাক' দিয়ে যায়নি!

জুলেখা জবাব দিল না।

চৌধুরী সাহেব একটু অপেক্ষা করে বললেন, মিস্টার আহমেদের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে। কিছু কথাও হয়েছে।

জুলেখা চমকে ওঠে। অবাক হয়ে তাকায়। জানতে চায়, কবে? কোথায়?

—ও যেদিন তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। তুমি ওকে একটা প্রশ্ন করেছিলে—কেন সে তোমাকে বাঁচালো। ও জবাব দেবার সুযোগ পায়নি। মেট্রন এসে ওকে ঘর থেকে বার করে দেন....

—আপনি কেমন করে জানলেন?

—আমি দরজার বাইরেই অপেক্ষা করছিলাম। মিস্টার আহমেদ আমাকে প্রশ্ন করেছিলেন, তোমাকে হাসপাতাল থেকে রিলিজ করে দেবার পর তুমি কোথায় যাবে!

জুলেখা বালিশঢাকাটা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে বললে, আপনি কী বললেন, স্যার?

—আমি বলেছিলাম, 'দ্যাটস্ নান্ অব য়োর বিজনেস্।' ঠিক বলিনি?

জুলেখা সে প্রশ্নের জবাব দিল না।

একটু অপেক্ষা করে বললেন, তুমি কিছু বলছ না যে, জুলেখা? আমি ঠিক বলিনি?

—হ্যাঁ, তা তো বলেছেন। কিন্তু প্রশ্নটার পুরোপুরি জবাব তো ওটা হলো না। তার কোনো অধিকার নেই ও বিষয়ে প্রশ্ন করার। কিন্তু আমার কাছে যে সেই চিন্তাটাই...

বাধা দিয়ে জামাল সাহেব বললেন, শোন লেখা! আমি নিজে বিয়ে-সাদি করিনি। তাই যখনই দেখি কোথাও দাম্পত্য কলহ চরমে উঠছে তখন একটাকে ধরে নিয়ে আমার বাড়ি আটক করি। রত্না-বিশ্বনাথের দাম্পত্য কলহ মিটেছে। এখন আমি এসেছি তোমাকে নিয়ে যেতে।...না, না, তুমি অমন করে আমার দিকে তাকিও না, জুলেখা। আমি তোমাকে কিছু অযাচিত দান-খয়রাত করছি

না। আমি দুনিয়ায় একা—একেবারে একা। বাবা-মা-ভাই-বোন—কেউ নেই আমার। এক কাপ চা খাওয়ার ইচ্ছে হলে আমাকে উঠে গিয়ে বানাতে হয়। তুমি আমার সংসারে গিয়ে থাকবে? ছোটবোনের অধিকারে? আমাকে রেঁধে খাওয়াবে, আমার ঘরদোর সাফা রাখবে, আমার ইলেক্‌ট্রিক বিল জমা দিয়ে আসবে। সব, স—ব কাজ তোমাকে দিয়ে করাব আমি। তোমাকে আমি দয়া দেখাচ্ছি না। তুমিই আমাকে দয়া করছ—কারণ মা-মাসি-বৌদি-ছোট বোন— জীবনে আমি কখনো কোনো স্ত্রীলোকের ভালবাসা পাইনি। তুমি আমার সেই অপূর্ণতা পূর্ণ করে দেবে? আসবে লেখা? আমার বাড়িতে? আমার নুন্নিমুন্নি বোন হয়ে।

জুলেখা স্তব্ধ বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকল। ওর চোখ দুটো জলে ভরে এল। ওর মনে হলো, কী আন্তরিক ওঁর কণ্ঠস্বর! অস্ফুটে বললে, সারাটা জীবন?

—নিশ্চয় নয়। তোর কী বয়েস? আমার কাছে পড়তে আসে অনেক ছেলে, তাদের কেউ তোকে পছন্দ করলে, তাদের কাউকে তুই পছন্দ করলে, আমি চেষ্টা করে দেখব। একজন অন্যায়ভাবে তোকে তালাক দিয়েছে বলেই তোর জীবনটা কিছু বরবাদ হয়ে যায়নি।

নতনেত্রে জুলেখা বললে, না, স্যার! ও আমাকে অন্যায়ভাবে তালাক দেয়নি। আমার অপরাধটাও ছিল ক্ষমার অযোগ্য। আপনার কাছে স্বীকার করব। আপনি আলিম, আপনি নূর মহম্মদের খাদিমঃ মনে করুন এ আমার তওবা। খ্রীস্টানদের কনফেশনের মতো।

জামালউদ্দীন বলেন, কী প্রয়োজন? আমি সেই বেদনাদায়ক কাহিনীটা শুনতে চাইনে। আমি না শুনেই মেনে নিচ্ছি অপরাধটা ছিল অত্যন্ত গুরুতর। নইলে তোর শ্বশুর, আলিজান সাহেব, পাঁচ-মেহেমানের সামনে উপযুক্ত পুত্রকে চপেটাঘাত করতেন না; আর রসিদও আত্মজ্ঞান হারিয়ে তোকে তালাক দিত না।

জুলেখা নতনেত্রে বললে, প্রয়োজনটা আপনার নয়, স্যার। প্রয়োজনটা আমার। আপনি নিষ্ঠাবান মুসলমান—রোজানামাজ করেন—আল্লাতালার মুবারকীতে সামান্য ট্রাক-ড্রাইভার থেকে কলেজের অধ্যাপক হয়েছেন। আপনিই তো দেবেন আমাকে পথের নির্দেশ। বুঝিয়ে বলবেন—কী আমার অপরাধ, কেন এটা অপরাধ। শাস্তি আমাকে দেওয়া হয়েছে—নির্বাসন দণ্ড; তার পরিবর্তে আমি মৃত্যুদণ্ড বেছে নিয়েছিলাম; কিন্তু এই বিচারে আত্মপক্ষ সমর্থনে আমার কিছু বলার আছে কি না কেউ তা কোনোদিন জানতে চাইবে না? আপনিও না?

জামাল বলেন, বেশ বল্। কী বলতে চাইছিলি।

আলিজানের মোটর রিপেয়ারিং গ্যারেজটা মশল্লচকের শেষ প্রান্তে বড় রাস্তার ধারে। নানান জাতের গাড়ির মেরামতির কাজ হয়, রঙ হয়, আপ্‌হোলস্ট্রির কাজ হয়। এমনকি ইঞ্জিন রিবোরিঙের কাজও হয়। সে কাজটায় রসিদ আহ্‌মেদ আলিম। নিখুঁতভাবে সিলিন্ডারের মাপ রিঙের মাপের সঙ্গে মিলে যায়। স্টার্ট দিলে মনে হয় নতুন গাড়ি। একটু শব্দ নেই, একটু ঝাঁকি নেই। আলিজানের গ্যারেজের সুনাম এতদূর ছড়িয়ে পড়েছিল যে, সুলতানগঞ্জ, মুঙ্গের অথবা পাটনা থেকেও লোকে এঞ্জিন খুলে এখানে রিবোরিঙ করতে পাঠাতো! বাপ-বেটা ভাগলপুরেই থাকত। জুলেখা থাকত গ্রামের বাড়িতে। রসিদের দাদা রহমৎ সেখানে সংসারের কর্তা। ওদের কিছু জমি ছিল। ভাগে চাষ করাতো। রসিদ প্রতি শনিবার রাত্রে গ্রামে আসত, সোমবার ভোরে ভাগলপুরে ফিরে যেত। রহমতের দুই বিবি, তিন-চারটি সন্তান। জুলেখাই তাদের দেখভাল করত। পাকঘরের দায়িত্বটা তার ছিল না। তবে রহমতের একজোড়া মোষ আর একজোড়া বলদের দেখভাল করতে হতো জুলেখাকে। রহমতের দ্বিতীয়া বিবি সাইদার ছোট বাচ্চাটা মায়ের বুকের দুধ খাওয়া ছেড়ে দেবার পর রহমৎ একটি এঁড়ে-বাছুরসহ দুধেলা গাই কিনে এনেছিল পাঁচশ টাকায়। বুধবারে গাইটার জন্ম হয়েছিল বলে তার নাম 'বুধি'। বাছুরটাও নাকি জন্মেছে বুধবারে। তাই জুলেখা তার নাম দিয়েছিল 'বুদ্‌বুদ'। বুধির বাচ্চা বুধে জন্মেছে বলে। কুমারী জীবনেও দ্বিবেদী বাড়িতে তাকে গো-মাতার সেবাযত্ন করতে হয়েছে। গরু-মোষকে সে ভয় পায় না। কিশোরী বয়সে—মায় কলেজে ভর্তি হয়েও ও ঘুম ভেঙে উঠে পড়ত ভুক্কো তারা ডোবার আগে। গো-মাতার সেবা সমাপ্ত করে, গো-দোহন করে, সবাইকে জাবনা মেখে দিয়ে তবে যেত স্নান করতে। দুটো নাকে-মুখে গুঁজে ছুটতো নয়টা আটান্নোর ভাগলপুরমুখো বাস ধরতে।

ফলে শ্বশুরবাড়িতে এসে গো-সেবায় অসুবিধা হয়নি তার। প্রথম প্রথম মহিষ জোড়াকে একটু ভয় পেত। ক্রমে তাও সয়ে গেল। গোয়ালের সব জন্তুই নতুন মানুষটার পোষ মানল। সবচেয়ে বেশি বুদ্‌বুদ। ওর বোধহয় নতুন শিং-ওঠার জন্য মাথা চুলকাতো। জুলেখার নিতম্বদেশটি ঢুঁ-মারার প্রশস্ত স্থান মনে করতো সে। থাপ্পড়ও খেত সেজন্য।

তারপর বিনা-মেঘে বজ্রাঘাত। জুলেখা জানতে পারল, রহমৎ সবৎস গাভিটিকে ক্রয় করেছিল আগামী উৎসব দিনের কথা স্মরণে রেখে। বুধির দুধও ক্রমে ফুরিয়ে আসছে। আগে যেখানে দিনে সাত-আট সের দুধ দিত, এখন সেখানে দু-বেলায় দেড় সের হয়-কি-না-হয়। আশ্বিনের প্রথম সপ্তাহে চান্দ্র মাসের হিসাবে পড়ছে জউল-হিজ্জহ্ মাসের দশম দিন—যে দিনটিকে বলা হয় ইসলাম-ধর্মাবলম্বীদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উৎসব: ঈদ্-উল্-অজহা। এই দিনে আমন্ত্রিত হয় নিকট আত্মীয়েরা, রিস্তেদারেরা ধনাঢ্য ব্যক্তির মোকামে। সংলগ্ন কোনো চিহ্নিত উন্মুক্ত প্রান্তরে—তার একটি বিশেষ অভিধা আছে—'ঈদ্‌গাহ্'—সেখানে ধার্মিক মুসলমানেরা সমবেত হন। প্রার্থনার সূত্রপাত হিসাবে ইমাম দুটি রাকাহ্ বা শ্লোক আবৃত্তি করেন এবং প্রার্থনান্তে খুৎবা বা ভাষণ দান করেন। এই ভাষণে ইমাম ঈশ্বরের মাহাত্ম্যের সঙ্গে কুরবানির তাৎপর্যটা বুঝিয়ে দেন। খুৎবা সমাপ্ত হলে সমবেত সবাই ঈদ্‌গাহ্ থেকে আমন্ত্রণকর্তা ধনবান ব্যক্তির গৃহে সমবেত হন। পরিবারের কর্তা তারপর একটি ভেড়া অথবা গোরু, কিংবা ছাগল, উট বলি দেন। পশুটিকে মক্কার দিকে মুখ করে বলিদান করা হয়। শরিয়তি রীতিতে নিহত পশুটির মাংস তিন ভাগে বিভক্ত করা হয়। এক ভাগ প্রদান করা হয় আমন্ত্রিত মেহ্‌মানদের, এক-তৃতীয়াংশ রবাহূত দরিদ্রদের, বাকি এক তৃতীয়াংশ গৃহস্বামীর।

উৎসবের আগের সপ্তাহে জুলেখা নিতান্ত ঘটনাচক্রে জানতে পারল আগামী সপ্তাহে উদযাপিত হবে 'বকরহ্ ঈদ্' বা 'কুরবান ঈদ্'। আর কুরবানি করা হবে ঐ বুদ্‌বুদকে!

এটা সহ্য করতে পারল না প্রাক্তন স্মৃতিলেখা দ্বিবেদী। সে গোপনে তার স্বামীকে সনির্বন্ধ অনুরোধ করল বুদ্‌বুদের পরিবর্তে একটি বড় পাঁঠা কিনে আনতে। তার হাতে ধরল, পায়ে ধরল। রসিদ রাজী হলো না। রসিদের যুক্তি অকাট্যঃ পাঁঠার মৃত্যুযন্ত্রণা কি বাছুরের চাইতে কম?

জুলেখা বোঝাতে চেয়েছিল, নয়! কিন্তু আমার যদি কোনো সন্তান থাকত তবে তার মৃত্যুযন্ত্রণা অন্তত আমার চোখে বিশ্বের আর যে কোনো মৃত্যুর চেয়ে বেশি শোকাবহ! বুদ্‌বুদকে আমি যে এ্যাতটুকু বয়স থেকে...

রসিদ বলেছিল, মুসলমান ধর্মে যখন দীক্ষা নিয়েছ, মুসলিমের জরু হয়েছ, তখন ওসব হেঁদু সেন্টিমেন্ট তোমাকে ত্যাগ করতে হবে! একথা আমার সামনে দ্বিতীয়বার উচ্চারণ কর না। তাতে গুণাহ্ হয়।

সোমবার সকালে আলিজান আর রসিদ ভাগলপুরমুখো রওনা হবার সঙ্গে সঙ্গে জুলেখা বুধি আর বুদ্‌বুদকে দড়ি খুলে ঈদ্‌গাহ্ মাঠের ও-প্রান্তে চলে যায়। ঈদ্‌গাহ্ মাঠটাই দুই ধর্মীয় সম্প্রদায়ের সীমানা। ওদিকে হিন্দু পল্লী। মহেশ্বরপ্রসাদ তেওয়ারি গ্রামের একজন ধনবান মাতব্বর। তাঁর কন্যাটি জুলেখার সঙ্গে একসঙ্গে ভাগলপুর কলেজে এককালে পড়তে যেত—এক বাসেই যেত—তাই ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব। বকরহ্ ঈদের ছুটিতে সে বাড়িতেই ছিল। জুলেখা সব কথা খুলে বলে। গোহত্যা বন্ধ করতে মহেশ্বরপ্রসাদ এককথায় নগদ হাজার টাকা দিয়ে জুলেখার কাছ থেকে বুধি আর বুদ্‌বুদকে কিনে নেন। পাকা রসিদও সংগ্রহ করে রাখেন।

উৎসবের আগের দিন রসিদ আর আলিজান পাঁচ রিস্তেদারসহ এসে উপস্থিত হলো গ্রামে। পরদিন বকরহ্-ঈদ্। এতক্ষণ সব জেনে বুঝেও রহমৎ কিছু বলেনি। যার গরু সে অপেক্ষা করছিল যার জরু তার আগমনের।

বাকি ঘটনা জামাল সাহেবের জানা।

জুলেখা বলল, বলুন স্যার, আমি কি কিছু অন্যায় করেছি?

জামাল বললেন, এই হাসপাতালে বসে আলোচনার শেষ হবে না। আমি বরং তোমার রিলিজ-এর এন্তাজাম করতে যাই। আজই তোমাকে নিয়ে যাব আমার বাড়িতে। সেখানে যথেষ্ট সময় পাওয়া যাবে এ নিয়ে আলোচনা করার।

চার

আজ দু'দিন হলো জুলেখা এসেছে বড়ি-বেগমমহল্লায়। হেকিম সাহেবকে জামালউদ্দীন সব কথাই খুলে বলেছেন। হেকিম সাহেব একটু গোঁড়া—ধর্মবিষয়ে। তিনি শিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত। অর্থাৎ ইমামদের দৈবী চরিত্রে বিশ্বাসী এবং পয়গম্বরের শিক্ষার ব্যাখ্যাতা হিসাবে ইমামদের অভিমতকে প্রামাণ্য মনে করেন। এসব ব্যাপারে 'ইজ্‌তিহাদ' বা ব্যক্তিগত বিচারবুদ্ধির কার্যকারিতায় অবিশ্বাসী।

'তালাক' প্রথার যৌক্তিকতা তিনি মেনে থাকেন। 'শাহবানু' মামলায় সুপ্রীম কোর্টের রায়টাকে তিনি অন্তর থেকে মানতে পারেননি। লোকসভা সেটা খারিজ করে দেওয়ায় তিনি খুশি।

হেকিম সাহেবের মতে তালাক হচ্ছে স্বামী-স্ত্রীর নিজেদের ব্যাপার। বাইরের লোকের এ বিষয়ে কোনো বক্তব্য থাকতে পারে না। মুসলমান পুরুষের এ শরিয়তি অধিকার চিরকাল ছিল, আছে, থাকবে!

জামাল সাহেব এ নিয়ে তর্ক করেননি। বলেছেন, সে যাই হোক! মেয়েটির কোনো মাথা গোঁজার আশ্রয় নেই দেখে ওকে আপনার বাড়িতে নিয়ে এসেছি। আপনি যদি দয়া করে আবদুলকে আমার নিচের ঘরে শোবার অনুমতি দেন তাহলে আমি বাইরের ঘরে খাটিয়া পেতে শুতে পারি। আর জুলেখা যখন এখানেই থাকছে তখন একটা স্টোভ আর কিছু বাসনপত্র কিনে নিয়ে আসতে পারি। ঐ বারান্দার কোণটায়—আপনার যদি আপত্তি না থাকে—একটা পোর্টেবল্ গ্যাসের উনানে আমাদের দুজনের রান্নাবান্না...

হেকিম সাহেব বলেছিলেন, তাতে আমার ঘোরতর আপত্তি আছে। বাড়িতে আমরা এতগুলি প্রাণী। একটি মানুষ বেড়েছে বলে আমাদের পৃথগন্ন হতে হবে কেন? জুলেখা আমার বড় কন্যার চেয়ে বয়সে ছোট। সে আমার কন্যাপ্রতিম—কন্যাই। সে আমার সংসারে দোতলায় থাকবে। এজন্য আপনাকে খাটিয়া পেতে বাইরের ঘরে শুতে হবে কেন?

জামাল নিম্নস্বরে বলেছিলেন, তাহলে ওর খাওয়া-থাকা বাবদ..

—কেন? ও কি পটের বিবি? সংসারের পাঁচটা কাজ ও করবে না? আমার আর একটি বেটি থাকলে তাকে যা কাজকর্ম করতে হতো তাই ও করবে। আপনি বরং একটা কাজ করুন জামাল সাহেব, ইন্‌স্টলমেন্টে একটা সিঙ্গার মেশিনের পা-কল কিনে ফেলুন। আমার মেয়ে সারিনা খুব ভাল সেলাই-ফোঁড়াই জানে। আমার একজন বন্ধু কলিমুদ্দীন মোস্তাফার একটা দর্জির দোকান আছে; উনি নিজেও খুব ভাল দর্জি। ওঁর স্ত্রী আমার মরিচ—বাতের ক্রনিক পেশেন্ট। জুলেখাকে সারিনা সেলাইয়ের কাজ শিখিয়ে দেবে। অবসর মতো দুজনে মেশিন চালাবে। আপনি তো জানেনই সারিনার খসম ওকে নেয় না—তালাকও দেয়নি অবশ্য। যাহোক দুজনেই তাহলে স্বনির্ভর হয়ে উঠবে। কলিমুদ্দীন কাজ যোগাবে, মজুরি মেটাবে!

জামাল সাহেব বলেছিলেন, এ তো অতি উত্তম প্রস্তাব।

'বকরহ্ ঈদ্' বা কুরবান ঈদের তাৎপর্যটুকু জামাল সাহেব একদিন বুঝিয়ে দিয়েছিলেন জুলেখাকে, কোনো এক বর্ষণক্লান্ত রবিবারের অপরাহ্নে। সারিনা, তার আব্বা ও মাও উপস্থিত ছিলেন সেই অপরাহ্নের আসরে। জামাল এতদিনে হেকিম সাহেবের ঘরের লোক হয়ে গেছেন। তার সম্মুখে বে-পর্দা উপস্থিতিতে কারও সঙ্কোচ হয় না। জামালউদ্দীন গোটা বড়িবিবিমহল্লায় একজন বহু সম্মানিত ব্যক্তি। সব্বাই জানে তিনি জিতেন্দ্রিয় এবং সাচ্চা মুসলমান। অধ্যাপক-মশাই বলেছিলেনঃ

ঈদ্-ই-জুহা বাস্তবে ইসলামের বৃহত্তম উৎসবঃ ঈদ্-উল-কবীর। এই উৎসব জুউল-হিজ্জহ্ চান্দ্রমাসের দশম দিনে অনুষ্ঠেয়। একসময় এই অনুষ্ঠানের সঙ্গে মক্কায় তীর্থযাত্রার সম্পর্ক ছিল। এই উৎসব পালনান্তে আরব ধার্মিকেরা মক্কাভিমুখে যাত্রা করতেন। বর্তমানে অবশ্য এটি মুসলিম-ভ্রাতৃত্ববন্ধন দৃঢ় করার এবং বলিদান উৎসবের দিন হিসাবে গণনা করা হয়। এই অনুষ্ঠানের

বিধি কোরানের সূরহ্ দ্বাবিংশতি থেকে অষ্টত্রিংশতিতে বিস্তৃত। কথিত আছে হিজরার কয়েক মাস পরে মদিনায় অবস্থানকালে শেষ নবী হজরৎ মহম্মদ লক্ষ্য করেছিলেন যে, ইহুদিরা তাদের সপ্তম মাসের দশম দিনটি প্রায়শ্চিত্তের জন্য উপবাসের দিবস হিসাবে পালন করে। এই দিনটি মোশি কর্তৃক অর্থাৎ 'মোজেস্' কর্তৃক ইহুদিদের উদ্ধারের স্মারক হিসাবে স্মরণ করা হয়। এই সময় ইহুদিদের সঙ্গে মহম্মদের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। তাদের সিনাগগেও তিনি মাঝে মাঝে যেতেন। তিনি তাঁর অনুচরদের নির্দেশ দিলেন ইহুদিদের ঐ ধর্মীয় অনুষ্ঠানটি গ্রহণ করতে। কিন্তু পরবর্তীকালে ইহুদিরা তাঁর প্রবর্তিত সত্যধর্ম গ্রহণে অস্বীকার করলে তিনি পৃথকভাবে ঈদ্-উল্-অজহার প্রবর্তন করেন। এই অনুষ্ঠানে বলিদান উৎসবটি প্রতীকী—ঈশ্বরের প্রতি একনিষ্ঠ বিশ্বাসের ব্যঞ্জনা এই কুরবানি উৎসবে বিধৃত।

বাইবেলের পুরাতনবিধির সৃষ্টিখণ্ডে কথিত আছে—মহাধার্মিক আব্রাহাম ঈশ্বরের প্রতি তাঁর একান্ত নিষ্ঠা প্রমাণ করতে, তাঁর প্রীতি উৎপাদন মানসে নিজের পুত্র আইজাক্‌কে বলি দিতে উদ্যত হন। এ ঘটনাস্থল বাইবেল মতে মোরিহ্-জনপদ। ঈশ্বর তাঁর ঐকান্তিকতায় সন্তুষ্ট হয়ে পুত্রের পরিবর্তে একটি পশুকে প্রেরণ করেন। ইসলামী ঐতিহ্য অনুযায়ী আব্রাহাম হচ্ছেন ইব্রাহিম। তাঁর ইসহাক নামে এক পুত্র ছিল বটে, তবে যাকে তিনি বলি দিতে উদ্যত হন সেই পুত্রটির নাম ইসমাইল। বলিদান স্থানটিও মোরিহ্ নয়, মক্কার নিকটবর্তী মীনা পর্বত।

ঐতিহ্য-উপকথায় আরও বলা হয়েছে, ইব্রাহিম বলিদানের জন্য কয়েকবার ছুরিকাঘাত করেন বটে কিন্তু লক্ষ্যভ্রষ্ট হন। তখন তাঁর ক্রোড়স্থিত ইসমাইল তাঁর আব্বাকে বলেন, 'আপনি আমার দিকে দৃক্‌পাত করে আমাকে হত্যা করতে চাইছেন বলে স্নেহবশত বারে বারে লক্ষ্যভ্রষ্ট হচ্ছেন, বাপজান। আপনি দুই চক্ষু আবরিত করে আমাকে ছুরিকাবিদ্ধ করার উদ্যোগ করুন। তাহলেই আপনার ছুরিকা আমার পঞ্জর বিদ্ধ করবে।' এই কথায়, পুত্রের ঈশ্বরপ্রেমে মুগ্ধ হয়ে ইব্রাহিম দুই চক্ষু রুদ্ধ করে পুনরায় পুত্রকে বলিদানের উদ্যোগ করলেন। ঠিক সেই মুহূর্তেই গ্যাব্রিয়েল ইসমাইলের পরিবর্তে একটি পশুকে ইব্রাহিমের ক্রোড়ে স্থাপন করলেন। ইব্রাহিম সে-কথা না জেনে 'বিস্‌মিল্লাহি-আল্লাহ্ আকবর' পুকার দিয়ে ক্রোড়স্থিত জীবটিকে ছুরিকাবিদ্ধ করলেন। পরমুহূর্তেই চোখ খুলে দেখলেন তাঁর পুত্র অক্ষত—কুরবানি হয়েছে পশুটি!

হেকিম সাহেব উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে ওঠেন, অ্যাল্‌হামদুলিল্লাহ্!

জুলেখা জানতে চায়, একটা কথা! ইব্রাহিম পুত্রভ্রমে যে পশুটিকে কুরবানি করেছিলেন সেটি কী জন্তু ছিল? ছাগল, গরু না ?

হেকিম সাহেব বিরক্ত হয়ে বললেন, তুই কাফেরের মতো প্রশ্নটা করেছিস্, জুলেখা! জীবটা কী ছিল সেটা এখানে প্রশ্ন নয়, মূল বক্তব্য ইব্রাহিমের ঐকান্তিকতা! ইসমাইলের আত্মোৎসর্গের সদিচ্ছা। ঈশ্বরপ্রেম!

জুলেখা বলে, সেটাতে তো আমি কোনো সন্দেহ প্রকাশ করছি না, আমি বড়ভাইয়ের কাছে জানতে চাইছি কোরানে জীবটার কী নাম লেখা আছে।

জামালউদ্দীন বললেন, কোরান ধ্রুপদী আরবীতে রচিত। সে ভাষা আমি জানি না। ফলে, মূল কোরান আমি পড়িনি, জুলেখা। হজরত মহম্মদের প্রত্যক্ষ সাহচর্য যাঁরা পেয়েছিলেন তাঁদের মতে, কোরানের বাণীকে যুক্তির সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়োজন নেই, কারণ সেগুলি স্বয়ংসিদ্ধ।

জুলেখা বাধা দিয়ে বলে, আপনি আমার প্রশ্নটার সরাসরি জবাব দিন, স্যার, জন্তুটা কী ছিল? কোরানে কী লেখা আছে?

—সেই কথাই তো বলছি জুলেখা। যুক্তির সাহায্যে উটকে বাদ দিতে হয় কারণ কোনো একজন মানুষ তার কোলের উপর একটা জ্যান্ত উটকে তুলতে পারে না। যুক্তির নিরিখে ওটা ছিল হয় দুম্বা অথবা ভেড়া, ছাগল বা বাছুর। ঠিক কী ছিল তা জানি না। অনুবাদে আমি যা পড়েছি তা 'পশু'।

হেকিম সাহেব বললেন, পশুটা ছিল বাছুর। ভেড়া, ছাগল বা দুম্বা নয়।

জুলেখা বললে, আপনি কী করে জানলেন?

—আমাকে মৌলানা সৈয়দ আবুল কাশেম আল-জবরীয়াসাব বলেছিলেন। তিনি আরবী-ফারসি দুটি ভাষাতেই ছিলেন আলিম। এবাদতিতে তিনি ছিলেন সর্বজনমান্য!

জুলেখা জানতে চায়, সেই মৌলানা সাহেব আপনাকে কি বলেছিলেন, মূল ধ্রুপদী আরবী ভাষাতে যে কোরানের সংস্করণ পাওয়া যায় তাতে লেখা আছে যে, পশুটা বাছুর?

—না, তা অবশ্য বলেননি।

জুলেখা এদিকে ফিরে জামালকে প্রশ্ন করে, আপনার কী বিশ্বাস, স্যার?

জামাল সাহেব বললেন, কোরানের ঐ বাইশ থেকে আটত্রিশ নম্বর সূরাহ্—যেখানে বকরহ্ ঈদের ঐ ঘটনার উল্লেখ আছে সেখানে পশুটার নাম লেখা আছে কিনা আমি জানি না। আমার ধারণা সেটা ছিল: ভেড়া। মক্কা-অঞ্চলে মেষপালক ছিল প্রচুর—গবাদিপশু অল্প। তাছাড়া আমার ধারণা—ভারতবর্ষ অধিকার করার পর থেকে বেশ কিছু অত্যাচারী বাদশাহ্ বা আমীর-ওমরাহ্ বিজিত প্রজাদের উৎপীড়ন করার মধ্যেই আমোদ পেতো। যারা ধর্মত্যাগ করে সদ্ধর্ম গ্রহণ করতে রাজী হলো না তাদের। তারাই 'জিজিয়া' কর প্রবর্তন করেছিল বা বিজাতীয়দের কাছ থেকে ঐভাবে অর্থ সংগ্রহ করতো। তারাই পশুটাকে ছাগল, ভেড়া, দুম্বা থেকে গরুতে রূপান্তরিত করেছিল—একজাতের ধর্ষকামী মনোভাব থেকে। যেহেতু কাফেরদের চোখে গরু হচ্ছে 'গোমাতা'।

হেকিম সাহেব প্রতিবাদ করেন, এটা সত্য নয়। কাফেরদের যুক্তি।

জুলেখা বলে ওঠে, যুক্তিটা যারই হোক, এ-কথা তো মানবেন যে, বকরহ্ ঈদ্-এ পশুটা গরুর পরিবর্তে পাঁঠা বা ভেড়া হলে কোরান অবমাননার গুণাহ্ হয় না। যেহেতু কোরানে বলা হয়েছে—'পশু'। 'গরু' এ-কথা লেখা নেই। আর সেটা মেনে নিলে হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্বটা মেটাবার একটা ধাপ অতিক্রম করা যায়?

ইংরেজি অনার্সের কোনো কোনো ছাত্র—হিন্দু এবং মুসলমান—চিরকালই ছুটির দিনে জামাল সাহেবের কাছে ইংরেজি সাহিত্য আলোচনার জন্য আসত। তাদের মধ্যে দু-একজন জুলেখার প্রতি উৎসাহ দেখালো। হেকিম সাহেব পর্দাপ্রথা মানলেও, জামালউদ্দীন সেটা আদৌ মানতেন না। উনি

ছিলেন 'সুফী' মতে বিশ্বাসী—অর্থাৎ মুতাকাল্লাসীন বা লুকামা-পন্থীদের মতো শাস্ত্রীয় নির্দেশকেই একমাত্র প্রামাণ্য বলে মনে করতেন না—বিশেষ যেসব নির্দেশ সরাসরি কোরান বা হাদিসের নয়—মৌলভিদের নিজ-নিজ ইন্টার-প্রিটেশান। তাঁর কাছে হজরত মহম্মদের আধ্যাত্মিক আবেগ এবং প্রত্যক্ষানুভূতির মূল্য ছিল অনেক বেশি। ফলে, তাঁর ছাত্রদের চা পরিবেশন করতে জুলেখা প্রায়ই বে-পর্দা হয়ে বৈঠকখানায় আসত। জামাল সাহেব ছাত্রদের সঙ্গে তার পরিচয় করিয়ে দিতেন। কখনো কখনো বলতেন, বস না জুলেখা, আমরা কীট্‌স্‌-এর 'এন্ডিমিয়ান' পড়ছি। শুনলে লাভ বই তোর ক্ষতি হবে না।

দু'-একজন ওর প্রতি যে না ঝুঁকেছিল এমন নয়। কিন্তু জুলেখা কিছুতেই এগিয়ে এল না। উৎসাহিত হলো না। সে সেলাই শিখে স্বনির্ভর হতে চায়।

তারপর একদিন। হেকিম সাহেব ওঁকে জনান্তিকে ডেকে বললেন, প্রফেসরসাব, কিছু মনে করবেন না, একটা কথা আপনাকে জানাতে বাধ্য হচ্ছি। আপনি যখন কলেজে থাকেন, আবদুল স্কুলে, আমি মধ্যাহ্ন-বিশ্রাম করি, তখন জুলেখার সঙ্গে একজন পুরুষ গোপনে সাক্ষাৎ করতে আসে। সে 'কল-বেল' বাজায় না, বা দরজার কড়া নাড়ে না। আমার বেটি বলেছে, লোকটা নির্দিষ্ট সময়ে ঐ গাছতলায় এসে দাঁড়ায়। জুলেখা সদর খুলে দেয়। ছেলেটি কখনো এক ঘন্টা, কখনো দুঘন্টা কাটিয়ে চলে যায়।

জামাল সাহেব বললেন, সম্ভবত বিশ্বনাথ। মানে জুলেখার দাদা।

—না প্রফেসরসাব, বিশ্বনাথ দ্বিবেদী আমি চিনি। সে দু'-একবার আমার ডাক্তারখানায় এসেছে। নিজের পরিচয় দিয়েছে। আমি ভিতরে খবর পাঠিয়েছি। জুলেখা এসে তার সঙ্গে কথা বলেছে। এ ছেলেটি আরও দীর্ঘকায়, বলিষ্ঠ! এ অন্য একজন।

অধ্যাপকমশাই গম্ভীর হয়ে গেলেন। বললেন, ঠিক আছে, আমি জুলেখাকে জিজ্ঞাসা করে জানব। যথাকর্তব্য করব। আপনাকেও জানাব। এটা তো ভাল কথা নয়। ওকে 'নসিহত' করতে হবে। ভর্ৎসনা।

প্রশ্নমাত্র জুলেখা স্বীকার করলঃ হ্যাঁ, রসিদই। তবে বিশ্বাস করুন, স্যার—ও কোনোদিন আর আমাকে ছোঁয়নি।

—তা তো বুঝলাম। কিন্তু তোমার সঙ্গে তার সব সম্পর্ক যখন চুকে গেছে তখন সে আমার বাড়িতে আসে কেন? আর লুকিয়েই বা আসে কেন?

—ও আপনাকে কিছু বলতে চায়। খুব জরুরী কথা। সাহস পাচ্ছিল না। আমি বলেছি, ভয়ের কিছু নেই। আপনার সঙ্গে কলেজে দেখা করতে বলেছি। কাল জুম্মাবার, আমি জানি, আপনার ছুটি বেলা তিনটেয়। ওকে বলেছি, কলেজের গেটে অপেক্ষা করতে।

পাঁচ

জুম্মাবারে কলেজ ছুটির পর উনি বেরিয়ে এসে দেখলেন, গেটের কাছে রসিদ দাঁড়িয়ে আছে। নত হয়ে সে আদাব জানালো। জামাল সাহেব বললেন, জুলেখা বলছিল তুমি আমাকে কিছু বলতে চাও?

'তুমি' সম্বোধনে কোনো সঙ্কোচ হলো না এবার। বয়সে রসিদ ওঁর চেয়ে দশ বছরের ছোট। রসিদ বলল, হ্যাঁ, স্যার, আপনি যদি অনুগ্রহ করে শোনেন। আর আমাকে সাহায্য করেন।

—কী বিষয়ে সাহায্য?

—স্যার, এভাবে প্রশ্নোত্তরের মধ্যে দিয়ে আমরা যদি অগ্রসর হতে থাকি তাহলে ভুল বোঝাবুঝির আশঙ্কা আছে। আসুন আমরা কোথাও গিয়ে বসি। আমার সমস্যাটা আপনাকে খুলে বলি। আপনি যদি আমাকে এই জটিলতা থেকে উদ্ধার পেতে সাহায্য করেন তাহলে আমি চিরকৃতজ্ঞ হয়ে থাকব...না না, স্যার বাধা দেবেন না...আমি জানি আপনার প্রশ্নটা কী। তাই দুটো কথা প্রথমেই বলে রাখি। প্রথম কথাঃ আমি অনুতপ্ত। রাগের মাথায় অত্যন্ত অসংযমী হয়ে আমি এ অভিশাপ নিজেই সৃষ্টি করেছি। সেজন্য আমি জুলেখার কাছে ক্ষমাও চেয়েছি—হাত ধরে ক্ষমা চাইতে পারিনি, যেহেতু আমার স্পর্শকে সে গুণাহ্‌ বলে মনে করে। দ্বিতীয় কথাঃ আমি আপনাকে যা বলব তা জুলেখা জানে। বস্তুত তার পরামর্শ মতোই আমি আপনার সাহায্য চাইতে এসেছি, স্যার।

—বেশ, চল, এসব আলোচনা কোনো রেস্তরাঁ বা হোটেলে ভালভাবে করা যাবে না। কলেজে কতকগুলি ছোট ঘর আছে—গ্রুপ-ডিস্‌কাশানের জন্য। তার একটিতে গিয়ে আমরা বসি।

—আপনার অশেষ মেহেরবানি স্যার!

রসিদ যে প্রস্তাব দিল তাতে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন জামালসাব।

কিন্তু প্রস্তাবটা পেশ করার আগে সে সমস্যাটা বিস্তারিত জানিয়েছে। জুলেখাকে 'তালাক' দিয়ে সে মর্মান্তিক অনুতপ্ত! কাণ্ডজ্ঞানহীন হয়ে এই কাজটা করে বসেছে। পাঁচ মেহ্‌মানের সম্মুখে আব্বাজানের থাপ্পড় খেয়ে সে হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিল।

পরে জেনেছে এজন্য জুলেখাকে চূড়ান্ত অবমাননা সইতে হয়েছে। গ্রামের কয়েকজন—সঙ্গে ছিলেন ওর দাদা রহমৎ—জুলেখাকে তার বাপের ভিটেতে পৌঁছে দিয়ে আসে। কিন্তু বাপের বাড়ির লোকেরা ওকে বাড়িতে ঢুকতে দেননি। তাঁদেরও দোষ দেওয়া যায় না। তাহলে হয়তো গ্রাম-পঞ্চায়েত ওঁদের একঘরে করতো অর্থাৎ জাতিচ্যুত। ততক্ষণে সন্ধ্যা হয়ে গেছে। শেষ বাসটাও চলে গেছে। ফলে একটা রাত জুলেখাকে বাধ্য হয়ে কাটাতে হয়েছে পিতৃগৃহে—গৃহে নয়, গোয়ালঘরে। ওর মা মাটির সরায়, মাটির গেলাসে ওর রাতের খাবারটা পৌঁছে দিয়েছিল চোখের জলে ভাসতে ভাসতে। একটা বাক্য-বিনিময়ও করতে পারেনি গৃহ-প্রত্যাগতা কন্যার সঙ্গে—কারণ সমাজের তরফে পাহারাদার খাড়া দাঁড়িয়েছিল, যাতে ব্রাহ্মণের জাত কোনোক্রমেই না খোয়া যায়।

জুলেখার ছোট বোন স্বাতীলেখা কিছু ভিজে খড় জ্বালিয়ে দিয়ে গেল গোয়ালের কাছে-পিঠে—যাতে ধোঁয়া হয়। মশার কামড় কম সইতে হয়।

জুলেখা একবস্ত্রে গৃহত্যাগ করেছিল। তার দ্বিতীয় পোশাক ছিল না যে বদল করবে। নাকছাবিটা বাদে সারা দেহে একরতি সোনা ছিল না।

পরদিন ভোররাতে স্বাতীলেখা গোয়ালঘরে দিদির তত্ত্বতালাশ নিতে এসে দেখেছিল—একরাশ দগ্ধ ভস্মের মাঝখানে খড়ের বিছানা শূন্য। অপরাধী মেয়েটা বাপের বাড়ি থেকে শেষ বিদায় নেবার আগে সেই গোয়ালঘরে যদি দু'-ফোঁটা চোখের জল

ফেলে থাকে তাহলে তাও শুকিয়ে গেছে। পড়ে আছে মাটির সরায় অভুক্ত খাদ্য।

আশ্চর্য! গোয়ালে যে গরুটি সারারাত ওকে সঙ্গ দিয়েছে—কৈশোরকাল থেকে যার সেবা করে এসেছে জুলেখা—তার জন্য জাব্‌না মেখে রেখে যেতে ভোলেনি কিন্তু।

পরদিন অভুক্ত, অস্নাত বিতাড়িতা মেয়েটি একবস্ত্রে এসে উঠেছিল তার ছোড়দার বাড়িতে। ভোরবেলাকার প্রথম বাসে। ভাগলপুরে। ভাগ্যক্রমে বাড়ি ছাড়ার আগে আঁচলের খুঁটে গোটা দুই দশ টাকার নোট বেঁধে রওনা হয়েছিল। বুধি আর বুদ্‌বুদকে বিক্রয় করে যে হাজার টাকা পেয়েছিল তা থেকেই। বাকি ন'শো আশি টাকা রেখে এসেছে ওর শোবার ঘরের আলমারিতে।

ছোড়দার বাড়ির চৌকাঠ অতিক্রম করতে পারেনি। দোরগোড়া থেকেই ফিরে আসে। হাঁটতে হাঁটতে চলে আসে মশল্লাচকে, যেখানে ওর শ্বশুরমশায়ের মোটর মেরামতের কারখানা। কয়েকজন মজদুর—হিন্দু এবং মুসলমান—ওকে 'ভাবিজী' ডাকে। তাদের সাহায্য নিতেই এসেছিল। দুর্ভাগ্যবশত গ্যারেজ তালাবন্ধ। ঈদ্‌-এর ছুটি।

জুলেখা পর পর চারটি ডাক্তারখানা থেকে অল্প পরিমাণে ঘুমের ওষুধ 'কাম্পোজ' কিনে নেয়। বিনা প্রেসক্রিপশনে কোনো ডিসপেনসারিই ওকে একপাতা বেচতে রাজী হয়নি। তারপর রাস্তার কলের জলের সঙ্গে বড়িগুলো গলাধঃকরণ করে পার্কের বেঞ্চিতে গিয়ে শুয়ে পড়ে।

অধ্যাপকমশাই প্রশ্ন করেন, এত বিস্তারিত খবর তুমি পেলে কী করে?

—জুলেখাই বলেছে।

—তুমি হাসপাতালে ওর সঙ্গে দেখা করতে কেন এসেছিলে?

রসিদ চটজলদি জবাব দেয়, নাকছাবিটা ফেরত দিতে।

—নাকছাবি! মানে?

রসিদ বুঝিয়ে বলে ব্যাপারটা। গরু-বাছুরের দাম বাবদ জুলেখার বিক্রয়লব্ধ প্রায় হাজার টাকা সে ধরিয়ে দেয় ওর দাদা রহমতের হাতে। বলে, এক জোড়া পাঁঠা কিনে নিয়ে এসে ধর্মীয় কৃত্যগুলো সেরে ফেল। আমি চল্লাম...

রহমৎ ওর হাত চেপে ধরে বলেছিল, নালায়েকের মতো বাতচিৎ করিস্ না রসু!

জুলেখা আর তোর জরু নয়। সে কোথায় গেল তা তোকে দেখতে হবে না।

দাদার হাত ছাড়িয়ে সে চলে এসেছিল বাবুপুর গ্রামে। ওর শ্বশুরবাড়িতে। সেখানে পাড়ার ছেলেদের হাতে বেশ দু'-চার ঘা খেতে হয়। তবে খবর পায় জুলেখা সেখানে নেই। চলে আসে ভাগলপুরে। প্রথমে বিশ্বনাথের বাড়ি, তারপর গ্যারেজে। রিপেয়ারিং গ্যারেজ সুনসান্। তবে দারোয়ান আছে। সে দরজা খুলে ছোট হুজুরকে ঢুকতে দেয়। রাতের জন্য একটা খাটিয়া পেতে দেয়। মশারি খাটিয়ে দেয়। পরদিন সকালেই সে খবর পায় সামনের পার্কে একটি মেয়ে আত্মহত্যা করে মরে পড়ে আছে। ও ছুটে যায়। জুলেখা বেঁচে আছে কিনা বুঝতে পারে না। যা হোক, প্রতিবেশীদের সাহায্যে সে ওকে হাসপাতালে পৌঁছে দেয়। এমার্জেন্সি জানায় মেয়েটি জীবিতা। তাকে ভর্তি করে নেওয়া হয়। রসিদই নামধাম লেখায়। নিজের পরিচয় দেয় না, বলে রিস্তাদার। তার নামধাম লিখে নিয়ে দু'-একজন সাক্ষী রেখে এমার্জেন্সির ছোকরা ডাক্তার জুলেখার নাকছাবিটা খুলে তার হাতে দেয়।

এবার অধ্যাপকমশাই জানতে চান, তুমি কি অনুতপ্ত? মানে, তুমি কি মনে কর, জুলেখাকে তালাক দেওয়া তোমার অন্যায় হয়েছে?

—হ্যাঁ, স্যার। তাই মনে করি আমি। প্রচণ্ড রাগের মাথায় দিগ্‌বিদিক্‌জ্ঞানশূন্য হয়ে আমি তালাক দিয়ে বসেছি।

—বুঝলাম। কিন্তু তুমি কি জান যে, জুলেখা তার কৃতকার্যের জন্য অনুতপ্ত নয়?

—হ্যাঁ স্যার, তাও জানি। এ ব্যাপারটা নিয়ে আমি একজন ধার্মিক মুসলমান মৌলানার সঙ্গে আলোচনা করেছি। তাঁর মতে 'বকরহ্-ঈদ্'-এ যে গো-শাবককেই কুরবানি করতে হবে এমন কোনো শাস্ত্রীয় নির্দেশ নেই। উনি একথাও বলেন যে, অনেক মৌলবাদী ধর্মীয় নেতার মতে কুরবানির পশুটি গরু না হলে চলবে না। তিনি সে মত মানেন না। তাছাড়া তিনি বললেন, 'তুই তো জানতিস্ তোর বউ হিঁদু ঘরের মেয়ে। তোর মহব্বতে দিওয়ানা হয়ে সে সব কিছু ছেড়ে তোর ঘর করতে এসেছে। আর পরিবর্তে তুই তোর জিদ্দিবাজিটা ছাড়তে পারলি না? ওর কয়েক হাজার বছরের জীন-বাহিত সংস্কারটাকে অস্বীকার করলি?' আমি, স্যার, ওঁর কথা সর্বান্তঃকরণে মেনে নিয়েছি। যতদিন বেঁচে থাকব আমি গো-হত্যা করব না, গো-মাংস ভক্ষণ করব না। জুলেখা মাংস খায়, কিন্তু গো-মাংস খেতে পারে না। ও যা খায়, আমিও এবার থেকে তাই খাব।

জামাল সাহেব বললেন, তোমার এই সিদ্ধান্তটা বড় দেরি করে নেওয়া হচ্ছে না, রসিদভাই?

—সেটা স্যার নির্ভর করছে, আপনার সিদ্ধান্তের উপর। অর্থাৎ আপনি আমাদের দু'জনকে এই বিপদ থেকে রক্ষা করতে স্বীকৃত কিনা—তার উপর।

—তার মানে? কী বলতে চাইছ তুমি?

রসিদ এইবার তার প্রস্তাবটা পেশ করেঃ

শরিয়তি কানুনে কোনো পুরুষ তার স্ত্রীকে 'তালাক' দেবার পর সম্পর্ক ছেদ হয়ে যায় বটে; কিন্তু একটি বিকল্প ব্যবস্থা আছে তাদের পুনর্বিবাহের। যদি ঐ তালাকপ্রাপ্তা রমণীকে কোনো দ্বিতীয় পুরুষ নিকা করে তিন মাস শয্যাসঙ্গিনী হিসাবে গ্রহণ করে তারপর 'তালাক' দেয়। অর্থাৎ এ-ক্ষেত্রে জুলেখাকে একজন দ্বিতীয় পুরুষ নিকা করবে—তার

যদি ইতিপূর্বেই বিবাহ-করা চার বিবি জীবিতা না থাকে। তারপর তারা দু'জন তিন মাস স্বামী-স্ত্রী হিসাবে বাস করবে। প্রতিরাত্রিই যে দু'জনকে একশয্যায় শয়ন করতে হবে সেরকম কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। তবে এই বিবাহকালের মধ্যে জুলেখাকে তিনবার ঋতুমতী হতে হবে। সে প্রয়োজনে তিন চান্দ্রমাসের সময়কাল বর্ধিতও হতে পারে। তারপর জুলেখার দ্বিতীয় স্বামী জুলেখাকে 'তালাক' দিলে জুলেখা মুক্তি পাবে। তখন সে আবার তার প্রথম স্বামীকে বিবাহ করতে পারে।

জামাল সাহেবকে এত কথা বুঝিয়ে বলার প্রয়োজনই হলো না। তিনি এসব আইন-কানুন সম্বন্ধে অবহিত। বললেন, এজন্য কিছু লুচ্চা-জাতের কারবারী পাওয়া যায়, যারা কিছু অর্থের বিনিময়ে তালাকপ্রাপ্তাকে তিন মাসের জন্য শয্যাসঙ্গিনী করতে রাজী হয়ে যায়। সাময়িক একটি শয্যাসঙ্গিনীও জুটল, কিছু উপার্জনও হলো। তুমি কি সেই ব্যবস্থা করছ রসিদ?

—না, স্যার! জুলেখা তাতে রাজী নয়। তার বক্তব্যঃ তার খসম্ হিতাহিতজ্ঞানশূন্য হয়ে তাকে 'তালাক' দিয়েছে—এতে তার কী অপরাধ? সে কেন তার স্বামীর হঠকারিতার জন্য তিন মাস বেশ্যাবৃত্তি করবে?

জামাল সাহেব প্রতিবাদ করেন, বেশ্যাবৃত্তি কেন বলছ রসিদ, সে তো রীতিমতো সর্বসমক্ষে ওকে 'নিকা' করবে।

রসিদ বললে, সে যুক্তিটা, স্যার, আপনি-আমি মানছি, কিন্তু জুলেখার কয়েক হাজার বছরের জীনবাহিত কাফের-খুন মানতে রাজী নয়। ওর দৃষ্টিভঙ্গিতে 'নিকা' করুক, বা না করুক অর্থের বিনিময়ে তিন চান্দ্রমাসের জন্য যে খদ্দের ওর নারীদেহটা উপভোগের ধর্মীয় অনুমতি পাচ্ছে, তার সঙ্গে রেড-লাইট এলাকার কোনো খদ্দেরের *বিন্দুমাত্র প্রভেদ নেই।*

—তাহলে?

—এছাড়া আরও একটা মুশকিল আছে, স্যার। অনেক ক্ষেত্রে চুক্তিবদ্ধ হয়েও তিন মাস পরে পুরুষটি 'তালাক' দিতে রাজী হয় না। ব্ল্যাকমেলিং শুরু করে। শরিয়তি কানুনের মাধ্যমেও তাকে বাধ্য করা যায় না, আদালতের মাধ্যমেও নয়। লোকটা যদি জুলেখাকে তিন মাস পরে তালাক দিতে রাজী না হয় তাহলে তাকে খুন করা ছাড়া জুলেখাকে বন্দীদশা থেকে মুক্ত করা যাবে না। তাই নয়?

—বুঝলাম। তাহলে তোমরা কী চাইছ?

—আপনি, স্যার, আমাদের দু'জনকে মুক্তি দিন। আপনি নিজেই জুলেখাকে নিকা করুন—তিন মাসের জন্য!

অধ্যাপকমশাই নিজের অজান্তেই চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ান। বলেন, এ-সব কী বলছ রসিদভাই? আমি যে জুলেখাকে নিজের বহিনের মতো দেখি—

—জানি। আমি ছাড়া এ-কথা জুলেখাও জানে। তাই সে রাজী হয়েছে—পুরো তিন-তিনটি মাস আপনার শয্যায় শয়ন করতে। আমরা দুজনেই বিশ্বাস করি, আপনি সরিফ, আপনি শীরীন! ইব্‌তিজাল আর খিয়ানৎ আপনার কাছে হারাম! আমরা দু'জনেই বিশ্বাস করি তিন মাস পরে আপনি জুলেখাকে খিলাৎ দেবেন আমার মতো বেঅকুফ, নাদান নফরকে! মাত্র তিন মাসের জন্য আপনি ওকে আপনার কলিজা ঘেঁষে শয়নের অনুমতি দিন, স্যার! জুলেখা সরমে একথা বলতে পারছিল না বলেই আমাকে আপনার দ্বারে ভিক্ষা চাইতে আসতে হলো। বেরোদানে ইসলাম! আপনার মুবারকী আমরা দু'জন জিন্দেগীভর বিস্মৃত হব না, স্যার!

ছয়

পরবর্তী পরিচ্ছেদগুলি লিপিবদ্ধ করার পূর্বে একটা ব্যক্তিগত 'কৈফিয়ত' দেবার প্রয়োজন বোধ করছি। সেটা হচ্ছে এই যে, এই কাহিনী লিপিবদ্ধ করার মূল অনুপ্রেরণা যে ভদ্রলোকের কাছ থেকে পেয়েছি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা। তিনি আমাকে ভাগলপুর দাঙ্গার কথা বিস্তারিত বলেন এবং অনুরোধ করেন, এ নিয়ে কিছু লিখুন মিস্টার *স্যান্যাল।* আপনার ঐ গোয়েন্দা কাহিনী অথবা দুশো বছর আগে যে মহিলা নারীমুক্তির প্রথম উদ্‌গাতা হিসাবে কীর্তি রেখে গেছেন তাঁর কথা পরে লিখলেও চলবে। একদল রাজনীতি-ব্যবসায়ী ধর্মান্ধতাকে মূলধন করে ভারতবর্ষের রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করতে চাইছে। এখন যদি আপনারা শিল্পী-সাহিত্যিকেরা, রুখে না দাঁড়ান তবে ভারতীয় সংস্কৃতি বলতে আর কিছু অবশিষ্ট থাকবে না। আপনি লিখুন ভাগলপুর-দাঙ্গার কথা—সেখানে সাম্প্রদায়িক বিভেদবুদ্ধিকে চূর্ণ করে কীভাবে দুই সম্প্রদায়ের মানুষ মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল—লিখুন, অযোধ্যার বাব্‌রি মসজিদ ধ্বংসের বর্বরতার কথা, অথবা গুজরাটের সেই অনবদ্য কাহিনীটি।

আমি ডক্টর খৈরনারের উপদেশ মেনে নিয়েছিলাম। এবার পূজাসংখ্যা নবকল্লোলে তাই লিখতে বসেছি সেইসব মানুষের কথা যাঁরা সাম্প্রদায়িক বিভেদবুদ্ধির উপরে উঠে ভারতবর্ষের প্রাণসত্তাকে পুনর্জীবিত করতে চেয়েছিলেন।

1989 সালে, মহরমের মাসে, বিহারের ভাগলপুর শহরে যে ভয়াবহ দাঙ্গা হয় তাতে গোটা জেলায় প্রায় আড়াই হাজার মানুষ প্রাণ দেন। এর প্রায় পঁচানব্বই শতাংশই মুসলমান। সরকার একটি তদন্ত কমিশন বসান। সম্প্রতি তার রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে। 11.3.95 তারিখের আনন্দবাজারে এই নিয়ে সম্পাদকীয় ছিলঃ

লজ্জাকর ভাগলপুর উপাখ্যান।

বলা হয়েছেঃ

"ভাগলপুরের জেলাশাসক, পুলিশসুপার, রাজ্যপুলিশের একজন ডি. আই. জি. এবং স্বয়ং আই. জি. এই দাঙ্গার জন্য দায়ী!! যখন এক সম্প্রদায়ের উন্মাদ দাঙ্গাবাজরা অন্য সম্প্রদায়ের নিরীহ নিরস্ত্র জনসাধারণের উপর চড়াও হইয়াছে, তখন তাহাদের নিরস্ত্র ও নিবৃত্ত করার পরিবর্তে এই অফিসারেরা তাহাদের উস্‌কানি দিয়াছেন এবং আক্রান্তরা সুরক্ষা চাহিলে অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া থাকিয়াছেন। দাঙ্গার সম্ভাবনা জানিয়াও পাটনার রাজ্যসরকারের কর্তাব্যক্তিরা সমগ্র পরিস্থিতির প্রতি অপরাধমূলক ঔদাসীন্য ও নিস্পৃহতা দেখাইয়াছেন বলিয়াও রিপোর্টে অভিযোগ করা হইয়াছে। স্বাধীনতার পর এ দেশে যখনই বড় কোনো সাম্প্রদায়িক হানাহানির ঘটনা ঘটিয়াছে, তখনই তাহার তদন্তে কমিশন নিযুক্ত হইয়াছে। কিন্তু তদন্ত রিপোর্টগুলি কদাচিৎ জনসমক্ষে প্রকাশ করা হইয়াছে।...দোষী ব্যক্তিরা শেষ পর্যন্ত শাস্তি পাইল কি না, এ সংশয়ও জনমনে জাগিয়াছে।...ভাগলপুর দাঙ্গার রিপোর্টেও দেখা যাইতেছে রক্ষক পুলিশ অফিসারেরাই ভক্ষকের ভূমিকা লইয়াছিলেন। তাঁহাদের

মধ্যে ভাগলপুর রেঞ্জের আই. জি.-র ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। দাঙ্গাবাজ হিন্দু মৌলবাদীদের হাতে আক্রান্ত, তাড়া-খাওয়া এক সংখ্যালঘু জনতার সামনে দাঁড়াইয়া তিনি প্রকাশ্যে হুমকি দিয়াছিলেন, এখানে তিনি আর একটি কারবালার প্রান্তর বানাইয়া ছাড়িবেন।...উল্লেখ্য, এই লোকটিই মাত্র কয়দিন আগে বিহার পুলিশের ডি.জি. নিযুক্ত হইয়াছেন এবং তাঁহাকে পুলিশ প্রশাসনের শীর্ষে রাখিয়া বিহার বর্তমানে বিধানসভার নির্বাচনে যাইতেছে।"

তসলিমা নাসরিনের লেখা 'লজ্জা' উপন্যাসটার কথা এই প্রসঙ্গে আপনাদের মনে পড়ে যাচ্ছে তো? খুবই স্বাভাবিক। আমার কিন্তু মনে পড়ে গেল বোম্বাই থেকে প্রকাশিত একটি পত্রিকায় (Communalist Combat, Aug-Sept, 1994) এক সাংবাদিকের কাছে দেওয়া ডক্টর সুরেশ খৈরনারের একটি সাক্ষাৎকারের কথা। বোম্বাইয়ের নিগৃহীত মিউনিসিপ্যাল কমিশনার জি. আর. খৈরনারের সঙ্গে এঁর কোনো সম্পর্ক নেই। ইনি কলকাতার বাসিন্দা, থাকেন ফোর্ট উইলিয়ামের ভিতর একটি কোয়ার্টার্সে এবং সমাজ-কল্যাণমূলক একাধিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তিনি যুক্ত। এঁরই উৎসাহে এই রচনাটি লিখেছি। বোম্বাইয়ের সাংবাদিককে দেওয়া তাঁর দীর্ঘ বিবৃতির বেশ কিছুটা অংশ এখানে অনুবাদ করে পরিবেশন করতে চাই—কারণ আমাদের মতে একমাত্র ডক্টর খৈরনার প্রদর্শিত পথেই সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি গড়ে ওঠা সম্ভব। ধীরে ধীরে, ধাপে ধাপে। জ্ঞানীগুণী মানুষদের ধরে নিয়ে এসে পদযাত্রার আয়োজন করলেই আমাদের কর্তব্য শেষ হয়ে যায় না।

রচনাটির শিরোনামঃ Burying the Hatchet.

সম্পাদক সাক্ষাৎকারের মুখবন্ধে লিখেছেন, 'অযোধ্যা-বিরোধ থেকে উদ্ভূত 1989-এর ভাগলপুর শহরের দাঙ্গায়—সরকারী হিসাব অনুসারেই মৃতের সংখ্যা ছিল এক হাজার; আর তার নব্বই শতাংশই মুসলমান। মৃতের সংখ্যাটির অপেক্ষা ভয়াবহ ছিল সাম্প্রদায়িক দানবদের নৃশংসতার ভয়ঙ্করতা। পশ্চিমবাঙলা থেকে সমাজসেবীর একটি দল ওখানে গিয়ে দীর্ঘদিন ধরে কাজ করেন, দাঙ্গাবিধ্বস্ত নিষ্পাদপ শ্মশানে নূতন বিশ্বাস ও সম্প্রীতির বীজ বপন করেন। এখন সেগুলি অঙ্কুরিত চারাগাছ হয়ে উঠছে। ডক্টর খৈরনারের এই সাক্ষাৎকারে সেই কাহিনীটি বিধৃত।'

ভাগলপুরে ভয়াবহ দাঙ্গাটা হয়েছিল 1989-এর অক্টোবরে। আমি ও আমার কয়েকজন সহকারী বন্ধু সেখানে প্রথম গিয়ে পৌঁছাই প্রায় ছয় মাস পরে। কলকাতা থেকে। ভাগলপুর জেলার অনেকগুলি গ্রাম আমরা ঘুরে ঘুরে দেখেছি। কেউ একশ', কেউ তিনশ' গ্রামে গেছে। গণহত্যার ছয় মাস পরেও আমরা স্বচক্ষে দেখেছি অর্ধদগ্ধ মনুষ্যদেহাবশেষের স্তূপ! কুঁড়েঘরে রক্তের শুকিয়ে যাওয়া দাগ, অথবা জনহীন শূন্য কুটিরের ভিতর তরোয়ালের কোপে ছিন্নভিন্ন তোশক-বালিশ—শূন্যগর্ভ বাক্স-পেঁটরা।

আক্রমণকারীরা বিধর্মীদের হত্যা করেই ক্ষান্ত হয়নি। শূন্যগৃহে অগ্নিসংযোগ করে গেছিল। কয়েক শত বছরের পুরাতন মসজিদ ধ্বংস করে সেখানে গড়ে তোলা হয়েছে হনুমানজী অথবা দুর্গা মাঈর মন্দির! আমাদের সবচেয়ে যেটা বিস্মিত করল তা এই যে, ঘটনার এতদিন পরেও মৌলবাদী হিন্দু দাঙ্গাবাজদের মনে এতটুকু অনুশোচনা জাগেনি। অনেকেই অনায়াসে বললে, 'মুসলমানেরা তো সব ব্লাডি বাস্টার্ড! যা করা হয়েছে তাই ছিল ওদের প্রাপ্য। সুযোগ পেলে যা করেছি, তা আবার করব!'

ওদিকে দাঙ্গার সেই ভয়াবহ হাহাকার থেকে যেসব মুসলমান রক্ষা পেয়েছে তারা তখন একটিমাত্র স্বপ্ন দেখেঃ প্রতিশোধ! কড়ায়-গণ্ডায়! অনেকে একই কথা আমাদের বলল, 'বাবুমশাইরা! আপনেরা কলকাতা থেকে এসেছেন? আমাদের উপকার করতে? একটিমাত্র পথ আছে! বড়কর্তাদের কাছে তদ্বির-তদারক করে আমাদের জন্য কিছু গান-লাইসেন্স বার করে দেন। ব্যস্! বাদবাকি কাজ আমাদের!'

গোটা এলাকায় ছোট ছোট 'ঘেট্টো' গড়ে উঠেছে। অস্থায়ী ছাপড়া। এখানে-ওখানে। উইঢিপির মতো। যেসব গ্রাম হিন্দুপ্রধান সেখান থেকে মুসলমানেরা সপরিবারে সরে এসেছে মুসলিম-অধ্যুষিত গ্রামে এবং ভাইসি-ভার্সা! এই জাতীয় সাম্প্রদায়িক মেরুকরণের শেষ পরিণতি যে কী, তা সুধীজন মাত্রেই অনুমান করবেন!

কলকাতায় ফিরে এসে আমরা নিজেদের মধ্যে গভীরভাবে আলোচনা করলাম। কীভাবে অগ্রসর হওয়া উচিত? অভিজ্ঞ সমাজসেবী দাদারা বললেন, 'সর্বপ্রথম শান্তি-পদযাত্রার আয়োজন কর। সাম্প্রদায়িক শান্তি সমাবেশ আর মিলাদ-সরিফ!' কিন্তু আমাদের মনে হলো তাতে কিছু লাভ হবে না। ভাগলপুর দাঙ্গার মাত্র ছয় মাস পূর্বে বাবা আম্‌তে ঐ ভাগলপুর শহরেই 'ভারত জোড়ো' পদযাত্রা তো করে গেছেন। ভারত তো দূরের কথা—ভাগলপুরই তো তাতে জোড়া লাগেনি! তাহলে?

আমরা জানতাম, ঐসব প্রতীকী শুভেচ্ছা, মৌখিক উপদেশ বা সহানুভূতি নিরর্থক। সমস্যাটা ওদের, সমাধান ওদেরই করতে হবে। আমরা বড়জোর অনুঘটকের ভূমিকা নিতে পারি। ক্যাটালিস্ট। প্রথম কাজ হচ্ছে জীবনে-জীবন যোগ করা। স্থির হলো, অন্তত ছয় মাসকাল ধরে প্রতি মাসে

এক-একটি ছোট দল

যাবে। গ্রামে গ্রামে ঘুরবে। ওখানে বাস করবে। ওদের জীবনের ভাগিদার হতে হবে। এভাবেই শুরু হলো কাজ।

প্রাথমিক পর্যায়ে তিনটি গ্রাম আমরা বেছে নিয়েছিলামঃ বাবুপুর, চান্দেরী আর রাজপুর। তিনটিই ভাগলপুরের কাছাকাছি গ্রাম। বাবুপুর হিন্দুপ্রধান গ্রাম। সেখানে কোনো প্রাণহানি হয়নি, কিন্তু বর্তমানে গ্রামে একটিও মুসলমান নেই। ওদের বাড়িগুলো হয় অগ্নিদগ্ধ অথবা তার সদর দরজা হাট করে খোলা। জনমানবশূন্য। চান্দেরী ঐ ত্রয়ীর সবচেয়ে দুর্ভাগা গ্রাম। সেখানে হিসাবমতো পঁয়ষট্টি জন মুসলমান নিহত হয়েছিল এক রাত্রে। যুবক-প্রৌঢ়-বৃদ্ধ নর ও নারী। মৃতদেহগুলি ফেলে দেওয়া

হয়েছিল সংলগ্ন ঝিলে। যারা প্রাণে বেঁচেছিল তারা আশ্রয় নিয়েছিল রাজপুরে। সেটি মুসলমানপ্রধান গ্রাম।

প্রথম প্রথম আমরা এই তিনটি গ্রামে বারে বারে যেতাম। আমাদের মনে হলো, যদি বাবুপুরের বাস্তুচ্যুত দশ-পনের ঘর মুসলমান পরিবারকে তাদের ফেলে-আসা ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারি তাহলেই মস্ত বড় একটা কাজ হবে। কিন্তু প্রাথমিক বাধা হলো বাবুপুরেরই হিন্দু মোড়লেরা। তারা ক্রমাগত বলতে থাকে—মুসলমানেরা সর্বদাই মারমুখী! সরকার ওদের সুয়োরানীর ছেলে বলে মনে করে। ওদের উচিত শিক্ষা হয়েছে। ওদের গাঁয়ে ফিরিয়ে নেওয়া হবে না।

আমরা নিজেদের চিন্তাভাবনা,ওদের উপর আরোপ করতে চাইতাম না। তাহলে আমাদের কাজ ব্যাহত হবে। আমরা বরং সক্রেটিসের মতো নানান প্রশ্ন তুলে ওদের কাছে উত্তর শুনতে চাইতাম। আর উত্তর দিতে গিয়ে ওরা নিজেদের ভুলগুলো বুঝতে পারত। আমরা জানতে চাইতাম— 'তোমাদের এই বাবুপুর গাঁয়ের ঐ দশ-পনের ঘর মুসলমানকে সরকার কী কী বাড়তি সুবিধা দিয়েছে? যা তোমরা পাওনি? ঐ দশ পনের ঘর মুসলমানের মধ্যে কজন ছিল সরকারি চাকুরে? মানে গাঁয়ের চৌকিদার, সরকারি পিওন বা ডাক-হরকরা? অথবা গাঁয়ের স্কুলে, পোস্টাপিসে কিংবা সমবায় প্রতিষ্ঠানে চাকুরিরত?' ওরা আমতা আমতা করতো। স্বীকার করতো ঐ বিতাড়িতদের অবস্থা ছিল হিন্দুদের তুলনায় আরও খারাপ। অশিক্ষিত, অবজ্ঞাত, প্রায় সবাই মজুরচাষী! পড়িলিখি ইনসান নয়। এবং শেষ পর্যন্ত বলত ওরা নিজেদের গাঁয়ের মুসলমান বাসিন্দাকে কোনো বাড়তি সুবিধা পেতে দেখেনি বটে, তবে অমুক-দাদা বলেছেন, সরকার ওদের সুয়োরানীর ছেলেদের মতো নেকনজরে দেখেন।

ঐ অমুক-দাদা বহিরাগত কোনো রাজনৈতিক দলের নেতা! বলা বাহুল্য কোনো দলের। ক্রমে এ-কথা ওরাও নিজমুখে স্বীকার করলঃ 'মনিরুদ্দি, বসির, কামাল—ওরা মানুষ খারাপ ছিল না! ওদের অবস্থা ছিল আরও খারাপ। অধিকাংশ দিনই একবেলা খেত। অথবা উপবাস। তবে অমুকদা কিন্তু বললেন...' মুসলমানদের জমায়েতেও আমরা বৃথা সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করতাম না। প্রথম প্রথম আমরা নিশ্চুপ শুনে যেতাম ওদের নির্যাতনের কথা, আত্মীয়-বিয়োগের দুঃখের কথা। ক্রমে, ধীরে ধীরে আমাদের যুক্তিগুলো ওরা নিজেরাই শুনতে চাইল। আমরা ওদের মুখ দিয়েই বলাবার চেষ্টা করলাম যে, দু'-দশটা বন্দুকের লাইসেন্স যোগাড় করে দিলেই সমস্যাটা মিটবে না! হেঁদুরাও তা যোগাড় করবে। ফলে গতবার ছিল টাঙি, রাম-দা, তলোয়ার—আগামী বার হবে বন্দুকের লড়াই! ওরা স্বীকার করল, জী! হক কথা! এটা কোনো সমাধান নয়।

দু'পক্ষই জানত না—আমরা কাজে নামার আগেই আর একটা কাজ করেছিলামঃ রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার করে একটি সরকারি আদেশ জারী করিয়েছিলাম—কী হিন্দু, কী মুসলমান কেউ কোনো পরিত্যক্ত জমি, বাড়ি বা ভস্মীভূত ধ্বংসস্তূপ কিনে নিতে পারবে না! এটা ওরা জানত না। ফেলে-আসা জমি-বাড়ি বেচতে গিয়ে আদালতে জানতে পারে। এই প্রাথমিক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল বলেই আমরা শেষ পর্যন্ত হিন্দু ও মুসলমান গ্রামবাসীদের নিজ নিজ ভিটায় ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছিলাম।

ভাগলপুর শহরে আমরা বেশ কিছু মানুষের সন্ধান পেয়েছিলাম—হিন্দু এবং মুসলমান—যারা নিজেদের প্রাণের ঝুঁকি নিয়েও বিধর্মী নরনারীকে বাঁচিয়েছে, আশ্রয় দিয়েছে, নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দিয়েছে। অধিকাংশই হিন্দু এবং প্রায় অশিক্ষিত নিরন্ন মানুষ—রিক্শাওয়ালা, দোকানদার, বাসের কন্ডাক্টার, গঙ্গার পারানি নৌকার মাঝি।

আমরা তাদের মাঝেমাঝে ধরে নিয়ে আসতাম আমাদের মুসলিম-ভাইদের জমায়েতে।

ডক্টর খৈরনার সংবাদপত্রের প্রতিনিধির কাছে বলেননি, কিন্তু তাঁর দলের একজন আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছিল—এ ব্যবস্থায় দু'-জাতের উপকার হয়েছিল। প্রথম কথা, সেই দুর্যোগরাত্রিতে উন্মাদ নরপিশাচদের হাত থেকে যে-সব মুসলমান তাঁদের জান-মান বাঁচাতে পেরেছিলেন, তাঁরা তাঁদের রক্ষাকারীদের স্বচক্ষে দেখে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতেন। কলকাতা থেকে আসা সমাজসেবী দলের প্রতি বিশ্বাসযোগ্যতা বৃদ্ধি পেত। জানের পরোয়া না করে যারা বিধর্মীকে বাঁচাতে চেয়েছিল তাদের নিয়ে জমায়েতে ওঁরা খুব নাচানাচি করতেন—তাদের মিঠাই খাওয়াতে চাইতেন। অন্যদিকে যে-সব 'অমুক-দাদা' সাম্প্রদায়িকতাকে মূলধন করে রাজনীতি-ব্যবসায়ে অবতীর্ণ হয়েছিলেন তাঁদের যাতায়াতটা কমে গেল। তাঁরা ক্রমেই অবাঞ্ছনীয় বাহিরের লোক বলে গ্রামে চিহ্নিত হয়ে যেতে থাকেন। আবার ফিরে আসা যাক সাক্ষাৎকারের প্রসঙ্গেঃ

ভাগলপুর শহরের অবস্থাটা বুঝতে পারবেন এই কথা থেকেঃ ট্রেনে বা বাসে কেউ যদি রাত আটটার পর শহরে এসে পৌঁছাতো তাহলে স্টেশান-প্ল্যাটফর্মে বা বাসস্ট্যান্ডে রাতটা কাটিয়ে পরদিন সকালে বাড়ি ফিরত। সন্ধ্যার পর গোটা শহরটা হয়ে যেত জঙ্গলের রাজত্ব—গণহত্যার ছয়মাস পরেও। কিছু রাজনীতি-ব্যবসায়ী আর তাঁদের তাঁবে কর্মরত পুলিশ ও প্রশাসন নির্বিকার। বস্তুত তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতাতেই ছিল অপরাধজীবী মস্তানেরা রাতের ভাগলপুরের হর্তাকর্তাবিধাতা। আমরা দু-দলের মানুষকেই বোঝাতে চাইতামঃ এভাবে কতদিন চলবে? ভাগলপুর শহরের লক্ষ লক্ষ মানুষ এককাট্টা হয়ে ঐ দু'-দশজন গুণ্ডাকে কব্জা করতে পারবে না? এ কি হয়? শেষ পর্যন্ত ওরা রাজী হয়ে গেল। প্রতিটি মহল্লায় গড়ে উঠল এক-একটি শান্তিরক্ষা বাহিনী। তাতে সব জাতের মানুষকেই ওরা গ্রহণ করেছেঃ হিন্দু—ব্রাহ্মণ, যাদব, ভূঁইহার, রাজপুত; মুসলমান—শিয়া ও সুন্নি। অপরাধজীবী মস্তানদের পৃষ্ঠপোষকেরা ধীরে ধীরে সংযত হলেন। কারণ ক্রমে ক্রমে গোটা শহরে এই রকম দেড়শটি প্রতিরক্ষা বা

শান্তিবাহিনী গড়ে উঠল প্রতিটি মহল্লায়। মস্তানেরা সরে পড়ল—কেউ রাঁচি, কেউ ধানবাদ—নূতন এমপ্লয়ারের সন্ধানে।

এখন ভাগলপুর শহরে মাঝরাতে কোনো যাত্রী ট্রেনে বা বাসে এসে পৌঁছালে রিকশা নিয়ে বাড়ি চলে যায়।

আমাদের 'অপারেশন ভাগলপুর' চরম সাফল্যলাভ করল অযোধ্যায় বাবরি মসজিদ ধ্বংসের পর। আশ্চর্যের কথা নয়? সাম্প্রদায়িক স্পর্শকাতর ভাগলপুর শহরে বা সংলগ্ন গ্রামে তার কোনো প্রতিক্রিয়াই হলো না—অর্থাৎ বিরূপ প্রতিক্রিয়া। প্রতিবাদসভা হয়েছিল—হ্যাঁ দু'বারই। বাবরি মসজিদ ধ্বংসের পর এবং বোম্বাই বিস্ফোরণের পর। সভায় হিন্দু বক্তারা নিন্দা করলেন অযোধ্যায় বাবরি মসজিদ যারা রাজনৈতিক কারণে ধ্বংস করেছিল সেই মৌলবাদী হিন্দুদের এবং সেই সওয়ালের জবাব দিলেন মুসলমান বক্তার দল রাজনৈতিক কারণে যেসব মৌলবাদী মুসলমান বোম্বাই বিস্ফোরণ ঘটিয়েছিল তাদের। এটা 1993 -এর ঘটনা। সব শেষে জানাই, অধিকাংশ গ্রামেই বাস্তুচ্যুত মুসলমান পরিবার—ঐ মনিরুদ্দি, বসির, কামালের দল জরু-গরু নিয়ে ফিরে এসেছে যে-যার বাপ-পিতেমোর ভিটেতে। আল্লাতালার কাছে তারা তাদের হেঁদুভাইদের জন্য আজ মোনাজাত করে।

জানি, অন্তত আন্দাজ করতে পারিঃ আপনারা এবার আমাকে কী জাতের প্রশ্ন করবেন। আপনারা জানতে চাইবেনঃ ভাগলপুরে ওঁরা যে অসম্ভবকে সম্ভব করলেন তা কি আমরাও পারি না বাস্তবায়িত করতে এই হবু-কল্লোলিনী কলকাতা শহরে? প্রতিটি মহল্লায় মিলিত হিন্দু-মুসলমানের 'প্রতিরোধ বাহিনী' বা 'শান্তিরক্ষা বাহিনী' গঠন করে? কসবায়, বানতলায়, বিরাটিতে, রাজাবাজার আর এইচ. এম. কলিমুদ্দীন ছায়েবের এলাকায় সেই কী-যেন-নাম কানা গলিটার, যেখানে অনধিকার প্রবেশ করার দুর্মতি হয়েছিল ডি.সি. পোর্ট বিনোদ মেহ্‌তার?

আজে না, জবাব আমি দেব না! ডক্টর খৈরনারের নিষেধ আছে। যার সমস্যা সে নিজেই সমাধান করবে। আমি কথা সাহিত্যিকঃ ক্যাটালেটিক এজেন্টমাত্র। পজেটিভ ক্যাটালিস্ট!

আমি বরং আমার সেই খেই-হারানো গল্পটায় ফিরে যাই। সেই জামালউদ্দীন-জুলেখা-রসিদের ত্রিকোণাকৃতি কাহিনীতে।

সাত

তার আগে আপনাদের আর একটি দাঙ্গাবিধ্বস্ত জনপদের সত্য কাহিনী শোনাই। দুঃখের কথা, এসব খবর বাঙলা পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয় না। দাঙ্গার বীভৎসতা নেই, উদ্দীপনা নেই—এ কাহিনী পাঠক 'খাবে' না। আমি এ সত্য ঘটনাটি প্রথম জেনেছিলাম আমেদাবাদে, আমার পুত্রের বাড়িতে—একটি স্থানীয় ইংরেজি সংবাদপত্রের রবিবাসরীয়তে। পরে উদয় মহুরকার 'A Symbol of Hope' নামে একটি স্পেশাল রিপোর্ট প্রকাশ করেন 'ইন্ডিয়া টুডে'তে (15.2.1994, পৃঃ 85-88)। ঘটনাটা শুনুনঃ

আমেদাবাদ শহরের মাইল পঞ্চাশ উত্তরে সিদুপুর একটি প্রাচীন জনপদ। কোন বিস্মৃত অতীতে একজন জৈন সন্ন্যাসী নাকি এখানে সিদ্ধ হয়েছিলেন। এখন ওর চলতি নাম সিধ্‌পুর। লোকসংখ্যা বর্তমানে প্রায় পঞ্চাশ হাজার। একাশির আদমসুমারীতে হিন্দু গ্রামবাসী ছিল অর্ধেকের কিছু বেশি, একানব্বইতে তারা সংখ্যায় আধাআধির কিছু কম। হিন্দু ও মুসলমান মহল্লা সুচিহ্নিত। তবে ঐ! কোথাও-কোথাও এ-সম্প্রদায়ের মানুষ ওদের গাড়ুর ভিতর নাক গলিয়েছে, কোথাও ও-সম্প্রদায় সেঁদিয়েছে এদের বদনায়! গ্রামে একটি প্রাচীন মন্দির আছে, আছে একটি মসজিদও। শতাব্দীর পর শতাব্দী ওরা মিলেমিশে স্বচ্ছন্দে ছিল—তারপর কী যে হয়! হঠাৎ একদিন জ্বলে ওঠে সাম্প্রদায়িক আগুন! স্বাধীনতার পর তিন-তিন বার সিধ্‌পুরে বড় জাতের দাঙ্গা হয়েছে। তার ভিতর একবার তো টানা বাইশ দিন ওখানে কার্ফু জারী রাখতে হয়েছিল, মিলিটারীর টহলদারীতে। দৈনিক দু' ঘণ্টা বাজার খুলত।

এই সিধ্‌পুরে স্বাধীনতা-উত্তরকালে চতুর্থ বার বেধে গেল আবার একটি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। বাবরি মস্‌জিদ ধূলিসাৎ হবার ঠিক পরের দিনঃ 7.12.1992 তারিখে।

মুসলমান মহল্লা থেকে একটি উন্মত্ত জনতা আক্রমণ করল হিন্দুদের এলাকা। এরাও তৈরি ছিল। ফলে মারাত্মক কিছু ঘটল না। কিন্তু আক্রমণকারী দলের একটা দলছুট অংশ বেমক্কা পাঁচিল টপকে ঢুকে পড়ল মানুভাই দাভের ভদ্রাসনে।

দাভেরা সিধ্‌পুরের সম্ভ্রান্ত এবং সম্পন্ন বাসিন্দা। যৌথ পরিবার। ওঁরা তিন ভাই। বুড়োকর্তা মানুভাই দাভে, বাহাত্তর, রাশভারী মানুষ। স্ত্রী-বিয়োগের পর ধর্মকর্ম নিয়েই থাকেন। মেজভাই ভোগীলাল, ছাপ্পান্ন; অকৃতদার। ব্যবসাপত্র নিয়ে ব্যস্ত। সংসারের সব দায়ঝক্কি তাঁর কাঁধে। বিশেষ প্রয়োজন না হলে সংসারের কাজে তিনি দাদাকে বিব্রত করেন না। আর ছোট মহেন্দ্রভাই না-না করতে করতে এই সম্প্রতি চল্লিশ বছর বয়সে সাদি করেছে। স্বজাতির এক স্কুল মিস্ট্রেসকে। তার স্ত্রী মীরাবাঈ সন্তানসম্ভবা।

সেই দুর্যোগরাত্রে দাঙ্গা যখন থামল তখন দেখা গেল দাঙ্গাবাজেরা তরোয়ালের কোপে মহেন্দ্রভাইয়ের মুণ্ডুটা ঘাড় থেকে নামিয়ে দিয়ে গেছে। তার দেহটা সিঁড়ির চাতালে, মুণ্ডুটা সিঁড়ির নিচে গড়াগড়ি খাচ্ছে। একমাত্র তার গর্ভিণী স্ত্রী ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শিনী।

সিধ্‌পুরের বড় দারোগা করিৎকর্মা অফিসার। তেত্রিশ জনকে গ্রেপ্তার করে আনলেন। শুরু হলো মামলা। নিম্ন আদালত তেত্রিশ জনকেই দায়রায় সোপর্দ করল—অনধিকার প্রবেশ, বে-আইনী জনসমাবেশ এবং দাঙ্গা! 'রায়টিং চার্জ'! আর শুধু প্রফেসর জামালউদ্দীন চৌধুরীর বিরুদ্ধে 'ডেলিবারেট ফার্স্ট ডিগ্রি মার্ডার চার্জ'।

মামলা চলছে। মাসের পর মাস। ইতিমধ্যে মীরার একটি কন্যাসন্তানও হয়েছে। মগনভাই বারোত ঐ তেত্রিশজনের অ্যাডভোকেট। মগনভাই আমেদাবাদের নামকরা উকিল। মানুভাইয়ের সমবয়সী এবং বন্ধুস্থানীয়। কিন্তু এ মামলায় তেত্রিশজন অপরাধীর পক্ষ গ্রহণ করায় ইদানীং দাভে পরিবারের সঙ্গে আর বিশেষ সদ্ভাব নেই। মগনভাই ইন্দিরা কংগ্রেসের একজন স্বনামধন্য রাজনীতিক—পূর্ববর্তী ইন্দিরা-জমানায় গুজরাটের সমবায়মন্ত্রী পর্যন্ত হয়েছিলেন। এই রাজনৈতিক প্রভাব আছে বলেই মুসলিম মোড়লেরা এই বিধর্মীকে মামলা পরিচালনার গুরুদায়িত্বটা দিয়েছে। অবশ্য মগনভাইয়ের জুনিয়ার হিসাবে কাজ করছে তরুণ অ্যাডভোকেট উজির খান পাঠান। ঘটনাচক্রে উজির খানের তুলো-ব্যবসায়ী বাপজানের সঙ্গে মানুভাইয়ের ব্যবসায়সূত্রে জানপহ্চান আছে; আর সেজন্য উজির খান এই দাভে পরিবারের পরিচিত। বৃদ্ধ মানুভাইকে ছেলেবেলা থেকেই সে 'আঙ্কল' ডাকে।

মামলা এখন প্রায় অন্তিম পর্যায়ে। বাদী-প্রতিবাদী দু'পক্ষেরই যাবতীয় সাক্ষীর তালিকা শেষ হয়েছে। বাকি আছে পি. পি. আর ডিফেন্স কাউন্সেলের শেষ সওয়াল। এই সময় একদিন মগনভাই বারোত সিধ্পুরে এলেন তাঁর মক্কেলদের সঙ্গে শেষ পরামর্শ করতে। রুদ্ধদ্বার কক্ষে বিশ্বস্ত আট-দশজন প্রথমশ্রেণীর নেতাকে ডেকে বললেন, আমি যা বুঝছি। দু'-চারজন বেকসুর খালাস হলেও হতে পারে। কিন্তু বিশ-পঁচিশ জনেরই মেয়াদ হয়ে যাবে—দু'-চার মাসের জন্য। কারণ 'রায়টিং চার্জ' আর অনধিকার প্রবেশের অপরাধটা প্রতিষ্ঠিত। আর আমার আশঙ্কা প্রফেসর চৌধুরীকে বিচারক গিল্টি হিসাবেই রায় দেবেন। ফাঁসি হয়তো হবে না, তবে মনে হয় যাবজ্জীবনটা ঠেকানো যাবে না।

সবাই নতমস্তকে সংবাদটা হজম করে। শেষমেষ উজির খান বলে, কিন্তু প্রফেসর চৌধুরী তো বিকৃতমস্তিষ্ক—উনি তো স্বাভাবিক নন।

—সব সময় নয়। কখনো উনি সম্পূর্ণ নর্মাল। কখনো কখনো অবশ্য একেবারে উন্মাদের মতো আচরণ করেন। মহেন্দ্র-ভাইয়ের মৃত্যুমুহূর্তে তিনি কী ছিলেন তা

কে বলবে? তাছাড়া উনি নিজেই বিচারককে কটুকথা বলে চটিয়ে দিয়ে বসে আছেন। হয়তো হায়ার-কোর্ট-এ শাস্তির বহরটা কমানো যাবে, যদি অবশ্য সেখানেও উনি কাঠগড়ায় উঠে পাগলামি না করেন।

উজির খান আবার বলে, কিন্তু স্যার, আপনি তো জানেন, তরোয়ালের কোপটা প্রফেসর জামালউদ্দীন চৌধুরী আদপেই মারেননি। তাঁর হাতে কোনো অস্ত্রই ছিল না। বাড়ি থেকে খালি হাতে গেছিলেন তিনি।

মগনভাই দৃঢ়ভাবে মাথা নেড়ে বলেন, না! আমি তা জানি না। তোমরা বারে বারে সে কথা বলেছ—তুমি সেটা আর্গুও করেছ কিন্তু প্রতিষ্ঠা করতে পারনি। কারণ মৃতের স্ত্রী দু'-দু'বার আইডেন্টিফিকেশন প্যারেডে প্রফেসর চৌধুরীকে সনাক্ত করেছে।

উজিরভাই বিরক্ত হয়ে বলে, বড়াভাই! কী বলব? মীরা বহিন দু'-বার ছেড়ে দু'হাজারবার সনাক্ত করলেও যেটা মিথ্যা সেটা তো আর সত্যি হয়ে যাবে না। আমি যে জানি, জামালউদ্দীন সাহেবের হাতে তরোয়ালটা ছিল না। কোপটা তিনি মারেননি।

—কোন যুক্তিতে ও-কথা বলছ উজির?

—যুক্তি-ফুক্তি বাদ দিন স্যার! আমি যে জানি! আই নো ইট! মানে, আমি জানি—কে কোপটা মেরেছিল!

—জান? তুমি জান? কীভাবে জেনেছ? কে সে?

—সে আমার কাছে কবুল খেয়েছে। বলেছে, আমাদের দলের আর কেউ তখন ছিল না—শুধু ওরা দু'জন! সে আমার হাতেপায়ে ধরে বলেছে, যেমন করে পারেন ওঁকে বাঁচান! বলেছে, মীরা দাভে ভুল বলছে। কোপটা প্রফেসর সাহেব মারেননি। ওঁর হাতে তরোয়াল ছিলই না। শেষ কথা, ও বলেছে, কোপটা আমিই মেরেছিলাম।

মগনভাই গম্ভীর হয়ে বললেন, কে সে? আমাকে তার নাম বল?

উজির খান মসজিদের বড়-ইমাম হাজী ইমামবক্সের দিকে তাকায়। হাজীসাহেব বললেন, সচ্ বাত মগনভাইসাব! কমবক্তটা আমার কাছেও কবুল খেয়েছে। 'তওবা' করেছে।

'তওবা' অনেকটা খ্রীস্টানদের 'কনফেশনের' মতো। পাদরী যেমন কনফেশনের কথা পাঁচ জনকে বলতে পারেন না, মসজিদের ইমামও তেমনি কারও 'তওবা'-র কথা প্রকাশ্যে জানাতে পারেন না।

মগনভাই জানতে চাইলেন, সে এখন এ ঘরে আছে?

হাজীসাহেব তাঁর সাদা দাড়িতে হাত বুলাতে বুলাতে বললেন, মাফ্ কিজিয়ে ভকিলসাব। য়ে বাৎ ম্যয়নে কহনে নেহী সেকুঙ্গা!

মগনভাই উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, তাহলে উজির খানকেই শেষ সওয়ালটা করতে বলুন। আমাকে যখন আপনারা বিশ্বাস করতেই পারছেন না তখন আমাকে বিদায় দিন!

প্রফেসর জামালউদ্দীন চৌধুরী অহেতুক বিচারককে চটিয়ে দিয়েছিলেন। আদালত তাঁকে প্রশ্ন করেছিল, তিনি ঐ চার্জ শুনে নিজেকে কী মনে করছেন। দোষী না নির্দোষ?

প্রফেসর সাহেব জবাবে বলেছিলেন, আমি জানি না!

—'জানি না' মানে?

—'জানি না' মানে জানেন না? I don't know! নাহং বেদ! ম্যয়নে নেহী জান্‌তা!...

বিচারক ধমকে উঠেছিলেন, ডোন্ট বি ফ্রিভলাস, প্রফেসর চৌধুরী! আদালত কীভাবে বিশ্বাস করবে যে আপনি নিজেই জানেন না; আপনি তরোয়ালের কোপটা মেরেছিলেন অথবা মারেননি!

—এ প্রশ্নের জবাব তো আমার দরখাস্তের সঙ্গে সংলগ্ন সাইকিয়াট্রিস্টের সার্টিফিকেটেই আছে, য়োর অনার। আমি মাঝেমাঝে স্মৃতিশক্তি হারিয়ে ফেলি—খুব বেশি উত্তেজিত হয়ে পড়লে। সেই ভাগলপুর দাঙ্গার পর থেকে। তখন আমার বাহ্যজ্ঞান লোপ পায়। এক্ষেত্রেও তাই হয়েছিল দাভে সাহেবের মোকামে।

মগনভাই বাধা দিয়ে বলেছিলেন, প্রফেসর চৌধুরী, আপনি কোনো ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করবেন না। আপনাকে যে প্রশ্ন করা হয়েছে শুধু তার জবাব দিন। ডু য়ু প্লীড গিল্‌টি অর নট-গিল্‌টি?

প্রফেসর মগনভাইয়ের দিকে ফিরে বলেছিলেন, প্লীজ কীপ কোয়ায়েট! আমার সঙ্গে বিচারকের যখন কথা হচ্ছে...

—আপনি কি ভুলে গেছেন যে, আমি আপনারই ডিফেন্স কাউন্সেল!

—না ভুলিনি, অ্যাডভোকেট মগনভাই বারোত, কিন্তু বিচারককে জিনিসটা বোঝানো দরকার!

বিচারক অবশ্য বুঝতে রাজী হননি। ওঁকে বসিয়ে দেন।

জামালউদ্দীন সাহেবের এই মারাত্মক মানসিক অসুখটার সূত্রপাত ভাগলপুর রায়টের সময়।

ভাগলপুর রায়টের মাস চারেক আগে উনি পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সে প্রথম সাদী করেন—তালাক পাওয়া একটি মেয়েকে: জুলেখা। মানুষ ভাবে এক, আর বাস্তবে ঘটনা ঘটে অন্যরকম। চৌধুরী সাহেব ভেবেছিলেন জিনিসটা খুবই সহজ। রসিদ আহ্‌মেদের একটা গচ্ছিত ধনের জিম্মাদারী। মাস তিনেক তাকে 'সেফ কাস্টডি'-তে রেখে যার ধন তাকে ফেরত দেওয়া। একটা হীরে-বসানো সোনার মুকুট হলে যেটা সম্ভবপর হতো। এক্ষেত্রে তা হলো না। কারণ গচ্ছিত সম্পত্তি একটি সজীব পদার্থ। তার চেয়েও বড় কথা, একটি উদ্ভিন্নযৌবনা স্বামীসঙ্গ-বঞ্চিতা রমণীর মন!

প্রথম দিন সাতেক কোনো অসুবিধা হয়নি। তারপর একদিন বাইরের ঘরের ক্যাম্প খাটটা তুলতে তুলতে জুলেখা হঠাৎ বলে বসল, আজ থেকে স্যার, আপনি ও ঘরেই শোবেন। বাইরের ঘরে আপনার একা শোওয়া চলবে না।

জামাল সাহেব অবাক হয়ে বলেছিলেন, কেন?

—ওপরের ওঁরা ব্যাপারটা জেনে গেছেন। কাল হেকিম সাহেবের বিবি আমাকে আড়ালে ডেকে খুব ধমক দিয়েছেন। বলেছেন এতে নাকি গুণাহ্ হয়!

জামাল সাহেব বিব্রত হয়ে বলেছিলেন, কিন্তু ঐটুকু খাটে আমরা দু'জন শোব কী করে। তাহলে ঐ ঘরেই বরং ক্যাম্পকটটা পাত!

জুলেখা মুখ লুকিয়ে হেসেছিল। বলেছিল, ঘরে ক্যাম্পখাট পাতবার জায়গা কোথায়? তা, আপনার কিছু অসুবিধা হবে না, স্যার। আমার শোয়ার ভঙ্গি খুব ভাল। আপনার গায়ে ছোঁয়া লাগবে না। এক কাতে সারারাত কেটে যায়।

বাস্তবে তা যেত না কিন্তু। দু'-একদিনের ভিতরেই সেটা জামালউদ্দীন অনুভব করলেন। শুধু মন দিয়ে নয়, দেহ দিয়ে। হয়তো ঘুমের ঘোরে—কে জানে—জুলেখার একটি অনাবৃত সুডৌল বাহু এসে পড়ত চৌধুরী সাহেবের কণ্ঠ বেষ্টন করে। ভাদ্রের গরম—জুলেখা জ্যাকেট এবং বক্ষবন্ধনী খুলে রেখে শুতে আসত।

তারপর এক প্রচণ্ড বর্ষণমুখর রাত্রে—যখন দুরন্ত ঝটিকায় গাছের ডালপালা আছাড়ি-পিছাড়ি করছে, সিদ্ধাঙ্গনাদের আশঙ্কা হচ্ছে পবন পর্বতশৃঙ্গকে অপহরণ করতে উদ্যত, মুহুর্মুহু বিদ্যুৎচমকে বিশ্রস্তবাসা জুলেখার যৌবনপুষ্ট তনুদেহ একবার নয়নগোচর হচ্ছে একবার তমিস্রায় হারিয়ে যাচ্ছে, তখন জামাল সাহেব সংযম হারালেন। 'জ্ঞাতাস্বাদো'রাই পারে না স্থির থাকতে, অজ্ঞাতাস্বাদো 'বিবৃতজঘনাং কো বিহাতুম্ সমর্থঃ'?

ঠিক তিন মাস অতিক্রান্ত হলে এসে উপস্থিত হলো রসিদ আহ্‌মেদ। তার গচ্ছিত সম্পত্তি উদ্ধার-মানসে। ততদিনে অধ্যাপক

মশাই বিবাহিত জীবনে রীতিমতো অভ্যস্ত। তাঁর দৃঢ়বিশ্বাস জুলেখার আত্মসমর্পণের তৃণমূলে ছিল একটি নিষ্কাম কৃতজ্ঞতাবোধ। কিন্তু সব কিছুরই তো বিবর্তন হয়। কখন সেই উদ্ভিন্নযৌবনার কৃতজ্ঞতাবোধ প্রেমে রূপান্তরিত হলো—একান্তচারী দুটি নরনারীর স্বাভাবিক পরিণতিতে যে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল তা জুলেখা নিজেই জানে না। রসিদের আবির্ভাবে সে যে নিরঙ্কুশভাবে উৎফুল্ল হয়েছিল তা মনে হয়নি জামালউদ্দীন চৌধুরী সাহেবের।

তবে কথার খেলাপ তিনি হতে দেননি। জুলেখার মতামত নেবার প্রশ্নই ওঠেনি। অনতিবিলম্বে জামাল সাহেব জুলেখাকে মুক্তি—না, 'মুক্তি' নয়, 'তালাক' দিলেন এবং রসিদ তাকে নিকা করে নিয়ে গেল প্রফেসর চৌধুরীকে অসীম কৃতজ্ঞতা জানিয়ে।

হেকিম সাহেব ব্যাপারটা জানতেন। তিনি বিস্মিত হলেন না আদৌ। রসিদের কথা থেকে চৌধুরী সাহেব জানতে পারলেন রসিদ তার আব্বাজানের সঙ্গে তক্‌রার করে গৃহত্যাগ করেছে। রসিদ যে জুলেখাকে পুনর্বিবাহ করতে চায় এটা তার আব্বার পছন্দ হয়নি। রসিদ মাস তিনেক আগে চলে গিয়েছিল ভারতের পশ্চিমপ্রান্তে—গুজরাটের একটি আধা শহর আধা গণ্ডগ্রামে। ওর এক দোস্ত সেখানে মোটর গাড়ি মেরামতির দোকান খুলে বসেছে। বেশ জাঁকিয়ে ব্যবসা করছে; কিন্তু এঞ্জিন রিবোরিঙের কাজ জানা দক্ষ মিস্ত্রি সে যোগাড় করতে পারছিল না। রসিদ বিনা ক্যাপিটালে ঐ দোকানের এক-তৃতীয়াংশ লাভের শর্তে ওর কারখানায় যোগ দিয়েছে।

জুলেখাকে নিকা করে সে আমেদাবাদে ফিরে গেল। যাবার আগে জুলেখা জনান্তিকে জামাল সাহেবকে ডেকে বলল, আপনাকে একটা কথা বলার ছিল। মানে, একটা অনুরোধ। বলুন, রাখবেন?

—বল? তোমাকে অদেয় আমার কিছুই নেই—সে-কথা তো তুমি জান, জুলেখা।

—মানে,...ইয়ে...ওকে সব কথা বলবেন না।

—সব কথা? মানে?

—আহা! বোঝেন না যেন! ওর বিশ্বাস—আমরা দু'জন—কীভাবে বলব?

—বুঝেছি, জুলেখা! না, আমি কোনোদিন রসিদকে সে-কথা বলব না! সে তোমার খসম্, কিন্তু পুরো তিনটে মাস তো তুমি আমার বৈধ স্ত্রী ছিলে। স্বামী-স্ত্রীর গোপনকথা কি তৃতীয় ব্যক্তিকে বলতে হয়? তুমিও বল না!

ওরা দু'জনে যেদিন আমেদাবাদে ফিরে গেল সেদিন কী জানি কেন জুলেখা বুকফাটা কান্না কেঁদেছিল। সেকি শুধু কৃতজ্ঞতায়? না প্রিয়-বিয়োগের হিজরে (বিরহে)?

তার এক মাসের মধ্যেই হলো ভাগলপুরের বীভৎস দাঙ্গা! শুধু ভাগলপুর শহরেই হাজারের উপর মানুষ নিহত হলো। আশপাশের গ্রাম নিয়ে গোটা জেলায় মৃতের সংখ্যা প্রায় আড়াই হাজার।

বড়িবেগমমহল্লায় হেকিম সাহেবের মোকাম আক্রান্ত হয়েছিল। নিরস্ত্র প্রৌঢ় অধ্যাপকটি কাঠের একটা মশারির ছত্রি টেনে নিয়ে বাধা দিতে গিয়েছিলেন। তরোয়ালের এক কোপে সেটা দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেল! পাশ থেকে কে যেন প্রচণ্ড আঘাত করল ওঁর মাথায়—লাঠির বাড়ি। পড়ে গেলেন মেঝের ওপর। উন্মত্ত নরপশুগুলো একে একে দ্বিখণ্ডিত করল ওঁর চোখের সামনে হেকিম সাহেবকে, তার স্ত্রী, পুত্র, পুত্রবধূ ও কন্যাকে। 'হর-হর ব্যোম-ব্যোম' ধ্বনি দিতে দিতে। দুই কনুইয়ে ভর দিয়ে উনি উঠে বসতে চেয়েছিলেন। ওদের দলপতি ওঁর মাথায় দ্বিতীয়বার আঘাত করে পেড়ে ফেলল।

দাঙ্গাবাজদের ধারণা হয়েছিল জামাল সাহেব মৃত। মরলে মুক্তি পেতেন। পেলেন না। ছত্রিশ ঘণ্টা পরে পুলিশ এসে অচৈতন্য মানুষটাকে উঠিয়ে নিয়ে হাসপাতালে পাঠাল। প্রাণে বেঁচে গেলেন বটে, কিন্তু মস্তিষ্কের কোন অজ্ঞাত রাজ্যে কী একটা ওলটপালট হয়ে গেছে। মাঝে মাঝে উনি উন্মাদ হয়ে যান। তখন তাঁর বাহ্যজ্ঞান থাকে না। আবার আপনিই অভিজ্ঞান ফিরে আসে।

রসিদ খবর পেয়ে এসেছিল। ততদিনে উনি হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়েছেন। বড়িবেগমমহল্লার সেই শূন্য মোকামে ওঁকে ফিরে যেতে দেওয়া হয়নি। উনি ওঁর এক ছাত্রের বাড়িতে বৈঠকখানায় শয্যাশায়ী ছিলেন। ছাত্রটি কিন্তু হিন্দু! অর্থাৎ যে ধর্মের মানুষ ওঁর মাথায় লাঠির বাড়ি মেরেছিল, সেই ধর্মেরই মানুষ!

রসিদ ওঁকে সিধ্‌পুরে নিয়ে গেল।

উনি তার বাড়িতে থাকতে রাজী হলেন না। কি জানি, মনের উপর যখন লাগাম থাকে না, তখন যদি বিসদৃশ কিছু করে বসেন! কিন্তু জুলেখাও কিছুতেই রাজী হলো না ওঁকে অন্য বাসা ভাড়া করে থাকতে।

সে আজ প্রায় তিন বছর আগেকার কথা। এখন উনি অনেকটা সুস্থ। বাড়িতে প্রাইভেট টুইশানির ব্যবস্থা করেছেন। অনেকগুলি ছেলে আর মেয়ে, হিন্দু এবং মুসলমান প্রতিদিন ওঁর কাছে পালা করে ইংরেজি শিখতে আসে।

জুলেখার বিষয়ে যে ভয়টা পেয়েছিলেন, দেখা গেল সেটা অমূলক। জুলেখা ঐ তিন মাসের প্রসঙ্গ আদৌ ওঠালো না। উনিও সতর্কভাবে সেটা এড়িয়ে এসেছিলেন এই তিন বছর।

তারপর ধীরে ধীরে পরিবর্তন শুরু হলো সিধ্‌পুরের মুসলমান সমাজের মধ্যে। কট্টর মৌলবাদী সম্প্রদায়ের একটি শাখা-অফিস এখানে খোলা হলো। তাদের অফিসে যিনি এসে বসলেন নেতৃত্ব দিতে, সেই মৌলভিসাবের বক্তব্য, তোমরা গোপনে অস্ত্রশস্ত্র বানিয়ে তৈরি হও! হেঁদুরা যদি বাবরি মসজিদের একটা ইটও খুলে ফেলার চেষ্টা করে তাহলে সিধ্‌পুরে একটা কাফেরকেও বাঁচতে দেওয়া হবে না! বেরোদানে ইসলাম!

বাবরি মসজিদ যেদিন ধ্বংস করা হলো তার ঠিক পরের দিন মধ্যরাত্রে মৌলভি-সাব-এর নেতৃত্বে এক সশস্ত্র জনতা গেল হিন্দুমহল্লা আক্রমণ করতে। চৌধুরীসাব কিছুই জানতেন না। বাইরের বৈঠকখানা ঘরে প্রতিদিনের মতোই ঘুমাচ্ছিলেন। হঠাৎ ঘুম থেকে ওঁকে ডেকে তুলল জুলেখা। বলল, সর্বনাশ হয়ে গেছে। রসিদ কোথা থেকে একটা তরোয়াল যোগাড় করে আক্রমণকারী দলের সঙ্গে গেছে হিন্দুমহল্লায়।

জামাল সাহেব নিজের মনে ছিলেন এতদিন। মৌলভি সাহেবের বক্তৃতা বা বক্তব্য শুনতে জমায়েতে একদিনও সামিল হননি। এখন জুলেখার মুখে শুনে তিনি রীতিমতো উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠেন। লুঙ্গিটা ছেড়ে প্যান্ট-শার্ট পরে খালি হাতেই রওনা দেন রসিদকে ফিরিয়ে আনতে।

তার পরের ঘটনাগুলো উনি ঠিক পরপর মনে করতে পারেন না। এটুকু মনে আছে

প্রৌঢ় মানুষটাকে পাঁচিল টপকে ঢুকতে হয়নি। আহত দ্বারপাল কাটা-সৈনিকের মতো পড়ে আছে খোলা গেটের একপাশে। ভিতরে মশাল হাতে কারা যেন ছোটাছুটি করছে। মাঝেমাঝে ভেসে আসছে মশালধারীদের রণহুঙ্কারঃ আল্লাহু আকবর!

জামাল সাহেব বিনা বাধায় গিয়ে উপস্থিত হলেন একতলায় সিঁড়ির মুখে। দেখলেন নগ্ন তরবারি হাতে রসিদ সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠছে। সিঁড়ির ল্যান্ডিঙে দাঁড়িয়ে আছে একজন মধ্যবয়সী যুবক—পরে জেনেছিলেন, তার নাম মহেন্দ্রভাই। তার হাতে—আশ্চর্য! একটা মশারির ছত্রি! ঠিক যে-অস্ত্রটা তিনি একদিন নিজেই বেছে নিয়েছিলেন হেকিম সাহেবের স্ত্রী-পুত্র-পরিজনকে রক্ষা করতে। আর সিঁড়ির মাথায় একজন সীমন্তিনী গর্ভিণী নারী! ঐ মশারির ছত্রিটাতেই সব ওলটপালট হয়ে গেল। মহেন্দ্রভাইয়ের মধ্যে নিজেকে আবিষ্কার করলেন প্রফেসর চৌধুরী। তিনি তিন লাফে পৌঁছে গেলেন ল্যান্ডিঙে। কিন্তু তার আগেই রসিদ একটা কোপ মেরেছে। মহেন্দ্রভাইকে স্পর্শ করতে পারেনি। তরোয়ালের কোপে শুধু দ্বিখণ্ডিত হয়েছে কাঠের ছত্রিটা—ঠিক যেমন হয়েছিল তাঁর ক্ষেত্রে। জামাল সাহেব ঝাঁপিয়ে পড়লেন রসিদের উপর। তাকে বাধা দিতে। তার হাত থেকে তরোয়ালটা ছিনিয়ে নিতে। রসিদ তখন হত্যা-উন্মাদনায় বেদিল। এক প্রচণ্ড ধাক্কা মারল ওঁকে—না চিনেই!

তারপর আর ওঁর খেয়াল নেই। উনি তরোয়ালটা কেড়ে নিতে পেরেছিলেন কি পারেননি। সিঁড়ির ব্যালাসট্রেডে মাথায় আঘাত লেগে উনি পড়ে গিয়েছিলেন কি পড়েননি কিছুই স্মরণ হয় না। লোকমুখে শুনেছেন মহেন্দ্রভাইয়ের দ্বিখণ্ডিত মুণ্ডুটা সিঁড়ির পাদদেশে পাওয়া গিয়েছিল। আর ঐ মৃতের স্ত্রী তাঁকে সনাক্ত করেছিল—সেটা আদালতে স্বকর্ণে শুনেছেন হত্যাকারীরূপে। মীরা বহিন কখন অজ্ঞান হয়ে পড়ে গিয়েছিল—মহেন্দ্রভায়ের মৃত্যুর আগে না পরে—তাও ঠিকমতো নির্ধারিত হয়নি। তবে জামাল সাহেবের ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি এবং তালশিরের টুপিটা মনে ছিল মেয়েটির।

দিন তিনেক পরে উজির খান পাঠান এসে দেখা করল মানুভাইয়ের ভদ্রাসনে। উনি বাইরের ঘরে বসে আখবর পড়ছিলেন। আগন্তুককে দেখে কাগজ নামিয়ে রাখলেন। উজির খান নত হয়ে বললে, নমস্তে আঙ্কলজী! তবিয়ৎ তো ঠিক হ্যয় না?

মানুভাই দেখে নিলেন উজির খান একা এসেছে। তার হাতে একটা বড় স্যুটকেস। উনি ইজিচেয়ারে শুয়েছিলেন। সোজা হয়ে বসে বললেন, আদাব অর্জ, ভকিলসাব। বৈঠিয়ে!

উজির এবার হিন্দি ছেড়ে গুজরাতি ভাষায় সবিনয়ে বললে, আপনি আমাকে চিনতে পারেননি আঙ্কেলজী! আমাকে আবার 'আপনি আজ্ঞে' কিসের? আমি সেই...ইয়ে, উজির খান!

মানুভাই নেপথ্যের দিকে তাকিয়ে হাঁকাড় পারেন, শিউলাল!

শিউলাল উপস্থিত হলে তাকে দু গ্লাস সিদ্ধির শরবত ফরমায়েস করে আগন্তুককে বললেন, আপনাকে না চিনব কেন ভকিলসাব? আদালতে তো কতবার দেখেছি! বলুন? কী বলতে এসেছেন?

উজির বুঝতে পারে নাতির বয়সী আগন্তুকের সঙ্গে উনি আপনি আজ্ঞেই করে

যাবেন।

সে ইনিয়ে-বিনিয়ে অনেক যুক্তি-তর্ক দাখিল করল। হ্যাঁ, ঐ তেত্রিশজনই ওঁর ভদ্রাসনে বে-আইনী প্রবেশ করেছিল, সচ্ বাৎ! উজির খান পাঠান এককথায় মেনে নিচ্ছে। অন্যায় করেছে ওরা। বে-অকুফ! লেকিন বদমাশ নেহি, স্রেফ বুড়বক! জামাত উলেমার উগ্রপন্থী বাঁদরগুলোর কথায় উত্তেজিত হয়ে অন্যায় করেছে। মানুভাই মহানুভব। স্বয়ং গান্ধীজীর হাতে গড়া মানুষ! সেবাগ্রামে মানুভাই বালখিল্য বাহিনীতে এককালে কাজ করেছেন, উজির খান জানে...আর তাছাড়া বিবেচনা করে দেখুন, প্রফেসর চৌধুরীর যদি ফাঁসিও হয়, তবু মহেন্দ্রভাই তো আর ফিরে আসবে না?

বৃদ্ধ এতক্ষণ তরুণ আইনজীবীর সওয়াল নির্বাক শুনে যাচ্ছিলেন, এবার শুধু বললেন, তো?

—আপনি ওদের 'মাফি' করে দিন, আঙ্কলজী। ভুল ভুলই। উত্তেজনায় এসব বেমক্কা করে বসেছে। আর সত্যি কথা বলতে কি, প্রফেসরসাব ঐ জঘন্য অপরাধটা করেনওনি।

মানুভাই বললেন, ভকিলসাব! আপনি একটা গল্‌তি করছেন। মামলা হচ্ছে স্টেট ভার্সেস পার্টি! আমি তো স্রেফ এফ. আই. আর. লজ করেছি; আর হাঁ, আমার বহুরানী প্রধান সাক্ষী। সে স্বচক্ষে দেখেছে তার মরদকে তলোয়ারের কোপে দ্বিখণ্ডিত হতে! ব্যস! মামলার সঙ্গে দাভে পরিবারের এটুকুই তো সম্পর্ক। তাই নয় কি?

—জী না! আঙ্কেলজী! আপনি যদি আদালতের বাহিরে মামলাটা মিটিয়ে নিতে রাজী হন, তবে পুলিশ কেস চালাবেই না! পি. পি. সাহেব আমাকে বলেছেন, ডি. এস. পি-সাব আমাকে অ্যাসিওর করেছেন।

—আদালতের বাহিরে মামলা মিটানো! সেটা কী রকম?

উজির খান পাঠান নতমস্তকে বললে, আমরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে চাঁদা তুলেছি। মহেন্দ্রভাইয়ের জীবন আমরা ফিরিয়ে দিতে পারব না; লেকিন মীরাবহিনের ঐ নুন্নিমুন্নি মেয়েটার বিয়ে একদিন আপনাকে দিতে হবে। সে দায় আমাদের—ভুল করে ফেলা অপরাধীদের! এই স্যুটকেসে চার লাখ টাকা আছে, আঙ্কেলজী। বিশ বরিষ পিছে মুন্নির

সাদির সময়ে তা আধা কড়োরের উপর কিছু একটা হয়ে যাবে। আপনি মামলাটা তুলে নিন।

শিউলাল এই সময় একটা কাঠের ট্রেতে দু'গ্লাস শরবত নিয়ে বৈঠকখানায় প্রবেশ করে। মানুভাই উঠে দাঁড়ালেন। ভৃত্যকে বললেন, তুই এখানে দাঁড়িয়ে থাক। ভকিলসাব যদি শরবতটা পান করেন তো ভাল, না হলে ঐ নর্দমায় ঢেলে দিস্। উনি চলে গেলে সদর বন্ধ করে দিবি। আমি পূজাঘরে যাচ্ছি...

উজির খান পাঠানও উঠে দাঁড়ায়। বলে, আঙ্কেলজী! একটা কথা বলে যান শুধু। চার লাখ টাকার অঙ্কটা কি ভুলে কম ধরেছি?

বৃদ্ধ টলতে টলতে দ্বার পর্যন্ত চলে গিয়েছিলেন। এ কথায় ঘুরে দাঁড়ালেন। বললেন, ভকিলসাব! জিন্দেগীভর হান্ড্রেড কাউন্ট সুতোই কেনা-বেচা করেছি। ভ্রাতৃরক্তের বাজারদর তো আমার য়্যাদ নেই! মুঝে মাফি কিয়া যায়!

পরদিন সকালে আমেদাবাদ থেকে অ্যাডভোকেট মগনভাই এসে হাজির হলেন তাঁর মারুতি সুজুকি চালিয়ে। একা। আগের রাত্রেই সিধ্‌পুর থেকে ওর মক্কেলের দল উজির খানকে মুখপাত্র করে তাঁর সঙ্গে গিয়ে দেখা করেছে। মানুভাই চার লক্ষ টাকা খেশারত প্রত্যাখ্যান করায়।

মানুভাই দাভে তাঁর বহুদিনের পরিচিত অ্যাডভোকেট বন্ধুকে সাদরে আপ্যায়ন করে বসালেন। মগনভাই বোঝাতে থাকেন সিধ্‌পুরে আবার নতুন করে একটা দাঙ্গা বাধার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। বিজেপি লীডার গিরীশ থাপার বিশ্বহিন্দুপরিষদের জনা ছয়েক নেতাকে সঙ্গে নিয়ে এসে থানা গেড়েছেন। ওদিকে জামায়েত উলেমার কয়েকজন নেতাও এসে হাজির। মগনভাই আরও বললেন, দাঙ্গাটা এবার হিন্দু-মুসলিমের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না—সেটা হয়তো হতে চলেছে শিয়া-সুন্নির দাঙ্গা!

—ওহ্ কৈসে?

মগনভাই বুঝিয়ে বলেন, মীরা বহুরানী গল্‌তি আদমীকে সনাক্ত করেছে। প্রফেসরসাব খুনটা আদৌ করেননি। তাঁর হাতে তরোয়াল ছিলই না। যে খুনটা বাস্তবে করেছে সে মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছে। ইতিমধ্যেই অনেকের কাছে কবুল করে বসে আছে। মুশকিল এই যে, প্রফেসর হচ্ছেন সুফি সম্প্রদায়ের আর ঐ গাড়োলটা শিয়া। ফলে এখন মুসলিম সম্প্রদায়ের ভিতরেই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধার উপক্রম।

মানুভাই সে কথায় কান না দিয়ে বললেন, তুমি ঠিক জান? প্রফেসর তরোয়ালের কোপটা মারেনি?

—হরগিজ!

—কে করেছে তাও জান?

—এতদিন জানতাম না। গতকাল রাত্রে কমবক্তটা আমার কাছে নিজ মুখে কবুল করেছে। ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছরের একটা নওজোয়ান। পড়িলিখি আদমী, লেকিন আহাম্মক! বেওকুফটা একটা সাদিও করেছে বছর খানেক আগে। ওর স্ত্রীও বর্তমানে গর্ভিণী।

মানুভাই একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিলেন একটি প্রস্তরনির্মিত মূর্তির দিকে। ওঁর বাইরের ঘরের কুলুঙ্গিতে। সমভঙ্গে দণ্ডায়মান আদিনাথ বা ঋষভনাথের শ্বেতপাথরের মূর্তিটি। হঠাৎ উনি সোজা হয়ে উঠে বসলেন। বললেন,

মগনভাই! একটিমাত্র শর্তে আমি মামলা তুলে নিতে রাজী আছি।

—কী শর্ত?

—মিউনিসিপ্যালিটির অফিসটা দুই মহল্লার মাঝামাঝি। আজই বেলা দুটোর সময় আমি ওখানে যাব। বহুরানীকে সঙ্গে নিয়েই যাব। ওদেরও আসতে বল। সর্বসমক্ষে প্রকৃত খুনী আমার বহুরানীর কাছে করজোড়ে মার্জনা চাইবে। আর আমি তার শাস্তির বিধান করব। ব্যস্!

মগনভাই সবিস্ময়ে বলেন, কী শাস্তি?

—ঘাবড়াচ্ছ কেন মগনভাই, আমি জজ সাহেব নই। প্রাণদণ্ড বা কারাদণ্ড দেওয়ার এক্তিয়ার আমার নেই! এই বুড়োর হাতের একটা থাপ্পড় কি সইতে পারবে না ঐ নওজোয়ান?

মগনভাই বললেন, না। তা নয়! তবে কথা হচ্ছে সর্বসমক্ষে কবুল করার কথা উঠছে কিনা! 'মার্ডার চার্জ' বলে কথা!

—বহুৎখুব! ব্যস্! আমার শেষ কথা বলেছি। এখন তোমরা যা ভাল বোঝ।

বৃদ্ধ মানুভাই দাভের এই আজব শর্তটার কথা দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ল সিধ্‌পুরে। জামাত উলেমার নেতার ঘোর আপত্তি ছিল; কিন্তু স্থানীয় মুসলিম নেতৃবৃন্দ সে কথা শুনলেন না। মহল্লা থেকে মহল্লায়। বেলা দুটোর কিছু আগে শ্বেতম্বরা বিধবাকে নিয়ে মানুভাই আর ভোগীলাল যখন মিউনিসিপ্যাল অফিসে এসে পৌঁছালেন তখন সেখানে লোকে লোকারণ্য। এস. ডি. পি. ও কোথা থেকে খবর পেয়ে এক প্লেটুন পুলিশ নিয়ে এসে মিউনিসিপ্যালিটিটা ঘিরে ফেলেছেন। মাইক্রোফোন বসানো হয়েছে জনতা নিয়ন্ত্রণের জন্য।

লোকজনকে ভিতরে যেতে দেওয়া হয়নি তা বলে। সংলগ্ন ফুটবল মাঠটায় শুধু মানুষ, মানুষ আর মানুষ। হিন্দু-মুসলমান। পৃথক পৃথক জমায়েত! মিউনিসিপ্যাল চেয়ারম্যান সাহেব এগিয়ে এসে ওদের তিনজনকে মিটিংরুমে নিয়ে গিয়ে বসালেন। শহরের জনা বিশেক বিশিষ্ট মানুষ সেখানে উপস্থিত। এ দলের এবং ও দলের। তদুপরি এস. ডি. পি. ও সভাধিপতি, বি. ডি. ও এবং এস. ডি. ও।

মাথায় আধো-ঘোমটা দিয়ে সদ্যবিধবা মীরাবাঈ তার ভাশুরের পাশের সীটে এসে বসল। অ্যাডভোকেট মগনভাই এগিয়ে এসে বললেন, বহুমা! তোমাকে একটু কষ্ট করে আমার সঙ্গে আসতে হবে। এস।

মীরাবাঈ প্রশ্নটা পেশ করার আগেই মানুভাই জানতে চাইলেন, কোথায়? কেন?

—পাশের ঘরে একটি বোরখা পরা মুসলমান বধূ বসে আছে। তার স্বামীই এসেছে কবুল খেতে। মীরা-মা রাজী হলে মেয়েটি মীরাকে জনান্তিকে কিছু বলতে চায়! এ ঘরে সর্বসমক্ষে সে আসতে পারে না। সে গর্ভিণী!

মানুভাইয়ের সম্ভবত আপত্তি ছিল; কিন্তু সেটা দাখিল করার আগেই প্রাক্তন স্কুল-টীচার সপ্রতিভভাবে মগনভাইকে বললে, চলুন!

মিনিট দশেক পরে মীরাবাঈ এঘরে ফিরে এল। বসল তার আসনে।

জামাত উলেমার এক বৃদ্ধ নেতা উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, আস্‌সালামু আলাইকুম মানুভাই দাভেজী, ঔর ভোগীলাল দাভেজী...

মানুভাই ধমকে ওঠেন, আপনি থামুন! আপনি সিধ্‌পুরের বাসিন্দা নন! হাজীসাহেবের কি কিছু বক্তব্য আছে? তাহলে বলুন?

মসজিদের বড়া-ইমাম হাজীসাহেব বলেন, জী! আপনি যা চেয়েছেন আমরা তাতে রাজী হয়েছি। অপরাধটা যে করেছে সে সর্বসমক্ষে কবুল খাবে, আপনার কাছে মার্জনা চাইবে। আপনি অনুমতি করলে, তাকে এখানে হাজির করি।

মানুভাই বললেন, করুন। তবে ওকে বলে দিন, মাফিটা চাইতে হবে আমার বহুরানীমার কাছে, আমার কাছে নয়। আর একটা কথা! আমি তাকে মাফ করব সে কথা তো আমি বলিনি। বরং মগনভাইকে বলেছি, আমি তার শাস্তির বিধান করব।

বড়া-ইমাম একটু অবাক হয়ে বললেন, সে কী! আপনি মাফি করে দেবেন এমন প্রতিশ্রুতি পেয়েই তো আমরা এসেছি। আপনি যদি সর্বসমক্ষে ওকে মাফ করে না দেন তাহলে তো ও নিজেই মার্ডার চার্জে ফেঁসে যাবে।

মানুভাই এবার মগনভাইয়ের দিকে ফিরে বললেন, এ সওয়ালের জবাব দেবার দায় আমার নয়, আপনার। আমি একবারও বলিনি যে, আমার ভ্রাতৃহত্যার অপরাধীকে আমি মাফ করে দেব! আপনার মক্কেলদের আপনি কী বুঝিয়েছেন তা আপনিই জানেন। যদি আমার কথায় আপনারা ভুল বুঝে থাকেন তবে এখানেই এ আলোচনা শেষ হোক। বাকিটা আদালতে ফয়সালা করা যাবে।

মগনভাই ঝাঁপিয়ে পড়ে তাঁর মক্কেলদের কীসব বোঝাতে থাকেন। মানুভাই নির্বাক নিস্পন্দ অপেক্ষা করতে থাকেন।

শেষে বড়া-ইমাম বললেন, ঠিক হ্যায়। মান লি!

তিনি এস. ডি. ও. সাহেবের দিকে ফিরে গ্রীবাভঙ্গি করলেন। এস. ডি. ও ইঙ্গিত করলেন এস. ডি. পি. ও.-কে। এবার তাঁর নির্দেশে একজন সেপাই এসে খুলে দিল পাশের একটা দরজা। সেখান থেকে বার হয়ে এল একজন দীর্ঘদেহী সবল পুরুষঃ রসিদ আহ্‌মেদ!

একমুখ খোঁচা-খোঁচা দাড়ি। সপ্তাহখানেক খৌরি করেনি। পরনে কুর্তা-পায়জামা। পায়ে কাবলি চপ্পল। চোখে বাণবিদ্ধ হরিণের আর্তি। ওর ঠোঁট দুটো থরথর করে কাঁপছে। তার পিছন-পিছন ঘরে ঢুকেছে একটি তরুণী। আপাদমস্তক বোরখায় ঢাকা।

মসজিদের বড়া-ইমাম বললেন, আল্লাহ্-কসম বড়াভাই—প্রফেসরসাব নেহী। ইয়ে কমবক্তনে....

লোকটা হঠাৎ হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল। নতজানু ভঙ্গিতে। যুক্তকর বাড়িয়ে ধরল মানুভাই দাভের দিকে। অস্ফুটে বললে, প্রফেসরসাবকো কোই কসুর নেহী—ম্যায়নে খুদ....

বড়া-ইমাম বললেন, বহ্ কমবক্তকা নাম—

একটা হাত সামনের দিকে বাড়িয়ে দিলেন মানুভাই। যেন ওঁকে থামতে বললেন। বড়া-ইমাম মাঝপথেই বাক্য অসমাপ্ত রেখে নীরব হলেন। হা-হা করে কেঁদে উঠল নতজানু বলিষ্ঠদর্শন লোকটা। মাটিতে মাথা ঠেকালো!

কেউ তাকে বলেনি, তবু সহধর্মিণী বলেই বোধহয় পাশাপাশি নতজানু হয়েছে এতক্ষণে বোরখা-পরা মেয়েটি।

মানুভাই তাঁর পাশে-বসা ভ্রাতৃবধূর দিকে ফিরে প্রশ্ন করলেন, ক্যা রে বহু-মাঈ? তু নে য়ে বদমাশকো....

দু-হাতে মুখ ঢেকে মীরা হু-হু করে কেঁদে ফেলল। কোনোক্রমে উচ্চারণ করলঃ জী!

মানুভাই উঠে দাঁড়ালেন। অস্ফুটে বললেনঃ বহুৎ খুব। চুলের মুঠি ধরে টেনে তুললেন ভূলুণ্ঠিত মানুষটাকে। মুখোমুখি দাঁড়ানোতে বোঝা গেল ঐ পাট্টা-জোয়ানটা মানুভাইয়ের চেয়ে এক-বিঘৎ লম্বা। মানুভাইকে সে দু'-হাতে মাথার উপর তুলে ছুড়ে ফেলে দেবার শক্তি রাখে। মানুভাই তাকে প্রশ্ন করলেন, কা রে? তু পড়িলিখি আদমী হো?

চোখের জলে ভাসতে ভাসতে লোকটা বললেঃ জী!

মহাত্মাজী কো আত্মজীবনী পড়া হ্যয় তুনে?

দু'দিকে মাথা নেড়ে নেতিবাচক উত্তর করল লোকটা।

মানুভাই প্রশ্ন করলেনঃ কেঁউ?

যেন মহাত্মাজীর আত্মজীবনী পড়েনি এমন পড়িলিখি ভারতীয় আদমী একটা অনিবার্য কৈফিয়ৎ দিতে বাধ্য। লোকটা এ প্রশ্নের কী জবাব দেবে বুঝে উঠতে পারল না।

ওর পার্শ্ববর্তিনী ইতিমধ্যে উঠে দাঁড়িয়েছে। সে মানুভাইকে তার বোরখার মধ্যে থেকে অস্ফুটে বললে, ম্যয়নে পড়ি হ্যয়।

মানুভাই অবগুণ্ঠনবতীর খসমকে হিন্দিতে বললেন, তোর সরম হওয়া উচিত। তুই পড়িলিখি আদমী, ভারতবাসী, অথচ বাপুজীর আত্মজীবনী পড়িসনি এতদিনেও। ঐ দ্যাখ্, তোর ঘরওয়ালী পর্যন্ত তা পড়েছে।

এর কী জবাব?

মানুভাই জুলেখাকে বললেন, যা, ইস্‌কো ঘর লে যা! ঔর উস্‌কো বহ্ কেতাব পড়ানা। সমঝি? তেরি খসম্‌কো হম দোনো মাফি কর দিয়া—যা! ঘর লৌট যা!

গল্পটা ওখানেই শেষ হতে পারত। হয়েছেও। তবু বাকি আছে কিছু উপসংহার। কিছুদিন পরেই মগনভাই বারোতকে মুখপাত্র করে মুসলমান এলাকার সাত-আট জন মাতব্বর শ্রেণীর মোড়ল এসে দেখা করতে চাইলেন মানুভাইয়ের সঙ্গে। মানুভাই এবং ভোগীলাল বুঝে উঠতে পারেননি—ব্যাপারটা কী হতে পারে। মামলা তো পুলিশ তুলে নিয়েছে—মানুভাইয়ের আবেদনক্রমে। তাহলে আবার কী বক্তব্য থাকতে পারে ও পক্ষের?

যাহোক, নির্দিষ্ট দিনে ওঁরা সবাই এলেন। মানুভাইয়ের বৈঠকখানাটা প্রকাণ্ড বড়। মাঝখানে বৃহৎ ডবল্-বেড খাটের মাপে একটা নিচু গদি। তাতে ধবধবে সাদা চাদর পাতা। ইতস্তত ছড়ানো খান চার-ছয় ছোট ছোট তাকিয়া বা গদ্দা। এছাড়া দুই দেওয়াল বরাবর দুই-সার গদি-মোড়া চেয়ার। যাঁরা সুটেড-বুটেড, তাঁরা তাতে বসেন—ধুতি-পাজামা-পাঞ্জাবি-কুর্তার দল গদিতে।

ভোগীলাল আগবাড়িয়ে সকলকে সমাদর করে বসালেন। বুদ্ধি করে ভোগীলাল এ-পাড়ার, মানে হিন্দু-মহল্লার, কিছু মাতব্বরকেও আসতে বলেছিলেন। অবশ্য যাঁরা সিধ্‌পুরের স্থায়ী বাসিন্দা শুধুমাত্র তাঁদেরই। হিন্দুধর্মকে শিখণ্ডী করে যাঁরা রাজনীতি যুদ্ধে অবতীর্ণ—সাম্প্রদায়িক স্পর্শকাতর সিধ্‌পুরে সম্প্রতি গেরুয়া ঝাণ্ডা পুঁতে দফতর খুলে বসেছেন, তাঁদের আমন্ত্রণ করেননি। দাভেজীর মতে ঐসব বহিরাগতদের এই জাতীয় অন্তরঙ্গ গ্রামীণ জমায়েতে অনুপস্থিত থাকাই মঙ্গল। এ যুক্তিটা—দাভেজী লক্ষ্য করে দেখলেন, ও পক্ষও মানতে শুরু করেছেন। মিউনিসিপ্যাল মিটিং হলে যে বহিরাগত মৌলবাদী মৌলানা-সাহেব ও-দলের দলপতি সেজে উপস্থিত হয়েছিলেন—সেই যিনি মুখ খোলার আগেই দাভেজীর কাছে দাবড়ানি খেয়েছিলেন, তিনি এবার ও-দলে অনুপস্থিত।

এসেছেন মসজিদের বড়া-ইমাম, আরও কয়েকজন স্থানীয় মুসলমান মাতব্বর—নিজামুদ্দীন সাহেব, হাজীশাহ্, এনায়েৎভাই, এছাড়া প্রফেসর জামালউদ্দীন চৌধুরী, উজির খাঁ পাঠান। সেই ভাগলপুর থেকে আসা কি যেন নাম মোটর-মেকানিকটা—যাকে সেদিন 'মাফি' করে দিয়েছিলেন, সে আসেনি কিন্তু। অথচ এসেছে বোরখা-পরা একটি নারী, ঐ লোকটার সহধর্মিণী। কারও নিষেধ সে মানেনি। তার একান্ত ইচ্ছা মীরাদিদিকে সে একটা প্রণাম করে যাবে। হ্যাঁ, প্রণামই—হেঁদুরা যেমন করে বড় বহিনকে! বিজয়াদশমীর দিনে এককালে ছোট বোন স্বাতীলেখা পায়ে হাত দিয়ে যেমনভাবে প্রণাম করত তার দিদিকে—স্মৃতিলেখাকে। না, এখানে অবশ্য পায়ে হাতে দেবে না জুলেখা, অন্তত না জিজ্ঞাসা করে পদস্পর্শ করবে না! কে জানে, হয়তো সেজন্য মীরাদিদিকে এই অবেলায় আবার স্নান করতে হবে।

বৈঠকখানা ঘরে সবাই বসলেন। কেউ নির্দেশ দেয়নি, কিন্তু বসার ভঙ্গিটা হিন্দুস্থান - পাকিস্তানের! মুসলমান মেহ্‌মানরা—যাঁরা ও-পাড়া থেকে এসেছেন তাঁরা বসলেন পাশাপাশি দেয়ালঘেঁষা চেয়ারে। এ-পাড়ার হিন্দু মাতব্বরেরা গদিতে।

মানুভাই সকলকে স্বাগত জানিয়ে বললেন, আপনারা কী আলোচনা করতে এসেছেন তা জানি না। বারোত টেলিফোনে আমাকে কোনো ইঙ্গিতই দেয়নি। তা সে যাইহোক, আলোচনা শুরু করার আগে আমি দুটি কথা জানতে চাই। প্রথম কথা, আপনাদের সঙ্গে একটি মহিলা এসেছেন দেখছি, এখনো তিনি দাঁড়িয়েই আছেন। উনি যদি এখানে বসতে না চান, তাহলে ওঁকে ভিতর-বাড়িতে পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করি—

আগন্তুকদের মধ্যে একজন উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, আদাব মানুভাইজী—এ বিষয়ে আমার একটি বক্তব্য আছে। আমার পরিচয়টা আগে দিই—

মানুভাই বাধা দিয়ে বলে ওঠেন, আপনার পরিচয় আর নতুন করে দিতে হবে না প্রফেসর চৌধুরী। আপনি সিধ্‌পুরে তিন বছর বাস করছেন। আপনার বহু ছাত্রছাত্রীর কাছে আমি আপনার সুখ্যাতি শুনেছি। আদালতেও আপনাকে দেখেছি।

উজির খান বলে, মাফ করবেন, আঙ্কলজী! প্রফেসরসাব নিজের পরিচয়টা দিতে যাচ্ছিলেন না—ঐ বোরখা-আবৃতার সঙ্গে ওঁর গূঢ় সম্পর্কটা জানাতে চাইছিলেন—

জামালউদ্দীন বলেন, জী সাব! ঐ মেয়েটি আমার ছাত্রী, তাই আমি বলব....

উজির খান বলে ওঠে, অবজেকশান য়োর অনার! প্রফেসরসাব ট্রুথ বলেছেন! কিন্তু হোল ট্রুথ বলেননি! নাথিং বাট দ্য ট্রুথ তো নয়ই!

জামালসাহেব লজ্জা পেলেন।

মগনভাই জিজ্ঞাসুনেত্রে তাকিয়ে দেখলেন উজির খানের দিকে। কিন্তু সে কিছু বলার

আগেই জামালসাহেব বলে ওঠেন, অবান্তর প্রসঙ্গ টেনে এনে সময় নষ্ট করার প্রয়োজন নেই। জুলেখা আহমেদের সঙ্গে আমার একাধিক সম্পর্ক আছে। আমরা একই সঙ্গে ভাগলপুর থেকে এসেছি। এক ছাদের নিচেই থাকি সিধ্‌পুরে। আমি শুধু বলতে চাইছিলাম যে, ঐ মেয়েটি জন্মসূত্রে হিন্দুর কন্যা ছিল। ও এখানে এসেছে যে উদ্দেশ্যে, সেই একই উদ্দেশ্যে এসেছি আমরা। তাই আমরা খুশি হব, যদি আপনি ওকে এখানেই বসবার অনুমতি দেন।

মানুভাই বললেন, বেশক! বস মা তুমি—না, না, চেয়ারে নয়। এই আমার পাশে, ফরাসে।

জুলেখা সলজ্জে এগিয়ে এসে বসল বৃদ্ধের বাঁ পাশে। মানুভাই তাঁর অনুজকে নির্দেশ দিলেন, ভোগীলাল, তুমি ভিতর বাড়িতে গিয়ে বহুমাকে একটা খবর দাও। আমার ইচ্ছা, সেও এসে বসুক, এই আলোচনাসভায়।

ভোগীলাল দাভে অন্দরমহলে চলে গেলেন।

মগনভাই বারোত জাতে অ্যাডভোকেট। তাই বললেন, দাভেভাই! তুমি তখন দুটি কথা বলতে চেয়েছিলে। দ্বিতীয়টা?

—দ্বিতীয় কথা, আমি আপনাদের জন্য কী ফরমায়েশ করব? চা, কোল্ড ড্রিংক্স, না ঠাণ্ডাই?

উজির খান তৎক্ষণাৎ প্রত্যুত্তর করে, ঠাণ্ডাই! তবে এক শর্তে, আঙ্কেলজী! যদি শিউলালকে এবার ঐ রকম হুকুম না দেন! আমাদের নাকের ডগায় ঠাণ্ডাইয়ের গ্লাস দেখিয়ে নর্দমায় ঢেলে দিতে!

মগনভাই বলেন, তার মানে?

মানুভাই বাধা দেন, উজির-বেটা মওকা পেয়ে আমায় 'লেগ পুলিং' করছে।

একটু পরে ভিতর থেকে এসে গেল মীরা দাভে। বসল গৃহকর্তার ডান পাশে। নিম্নস্বরে জুলেখার সঙ্গে তার কী জাতের কথা শুরু হলো।

তারপর মগনভাই বারোত বলেন, এবার আলোচনা শুরু করা যাক। আমাকে আমেদাবাদে ফিরতে হবে। অনেকটা পথ। আপনি শুরু করুন হাজীসাহেব।

হাজীসাহেব বলেন, এটা কেমন কথা হলো মগনভাইজী। আপনাকে আমরা মুখপাত্র করে নিয়ে এলাম তো এজন্যই, যাতে আমাদের সকলের ইচ্ছার কথাটা আপনি গুছিয়ে বলতে পারেন এঁদের।

মগনভাই বারোত বললেন, অলরাইট! তাই হবে। শোন মানুভাই, এবং এ-মহল্লার মাতব্বরেরা, আপনারাও শুনুন। আমরা একটা প্রস্তাব নিয়ে এসেছি। আপনারা সম্মত হলে সেটা কার্যকরী করা যাবে।

প্রস্তাবটি বিচিত্র। জামালউদ্দীন সাহেবের শান্তি মকুব করার খেশারত হিসাবে ওঁরা বাড়ি বাড়ি ঘুরে যে চাঁদার তহ্‌বিলটা গড়ে তুলেছিলেন, সেটায় এখনো হাত পড়েনি। ওঁরা তাই দিয়ে একটা 'ট্রাস্ট' গঠন করতে চানঃ 'সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ট্রাস্ট'। ভবিষ্যতে যাতে বহিরাগত মৌলবাদী কোনো সাম্প্রদায়িক দলের প্ররোচনায় সিধ্‌পুরে আবার না দাঙ্গা বেধে যায়। ট্রাস্টের নিজস্ব একটি অফিস থাকবে—মিউনিসিপ্যালিটির কম্পাউন্ডের ভিতর। ওটা দুই মহল্লার সংযোগস্থলে। জমিটা দান করতে মিউনিসিপ্যালিটি স্বীকৃত—যদি ঐ বিশেষ কাজে অফিসটা ব্যবহার করা হয়। ট্রাস্টের নিজস্ব শান্তিরক্ষা বাহিনী থাকবে। জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে। তারা দুই মহল্লাতেই রাত্রে পালা করে টহল দেবে। প্রামের মুসলমান যুবশক্তি এতে সম্মত। হিন্দুরাও সম্মত হলে হিন্দু-মুসলমানের মিলিত বাহিনী হবে, যেমন হয়েছিল পলাশী প্রান্তরে—মোহনলাল আর মীরমদনের মিলিত বাহিনী! ওদের ইমাম এবং অন্যান্য 'অ্যালাওয়েন্স' ট্রাস্ট দেবে। ঐ ধর্মের লোক স্বীকৃত হলে ঐ ট্রাস্টের টাকায় আদিনাথের জৈন মন্দির এবং মসজিদ দুটোই মেরামত করা হবে, রঙ ফেরানো হবে। এই বিষয়েই আমাদের আলোচনা।

মানুভাই তুলসীদাস মেহ্‌তাজীর দিকে ফিরে বললেন, আপনিই আমাদের মধ্যে বয়ঃজ্যেষ্ঠ। আপনি কিছু বলুন—

প্রফেসার তুলসীদাস মেহ্‌তা আমেদাবাদ কলেজে তুলনামূলক সাহিত্যের অধ্যাপক ছিলেন। এখন অবসর নিয়ে সিধ্‌পুরেই থাকেন। আশি ছুঁই-ছুঁই জ্ঞানবৃদ্ধ। তিনি বললেন, আমি এ প্রস্তাবে শর্তসাপেক্ষে স্বীকৃত। যদি আমার বন্ধুরা তা অনুমোদন করেন।

মগনলাল বারোত জানতে চান, কী

আপনার শর্ত?

—একাধিক শর্ত। এক নম্বরঃ ট্রাস্টের মূলপুঁজি চার লক্ষ টাকা থাকলে আমি রাজী নই! ওটাকে আট লক্ষ করতে হবে। সিধ্‌পুরের হিন্দু-মহল্লায় আমাদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে চাঁদা তুলে আমরা যাতে প্রাথমিক তহবিলটাকে আট লক্ষ করতে পারি, সে-বিষয়ে আপনাদের অনুমতি দিতে হবে।

হাজীসাহেব হা-হা করে অট্টহাস্য করে ওঠেন। বলেন, খুশিসে মান্‌লি। ঔর?

—দ্বিতীয় শর্তঃ মন্দির-মস্‌জিদ দুটোই ঐ তহবিল থেকে মেরামত করানোতে আমরা স্বীকৃত। কিন্তু আপনারা সকলেই জানেন—সিধ্‌পুরে হিন্দু-মুসলিম দু'-জাতের মিস্ত্রিই আছে—লেবার কন্ট্রাক্টর, রাজমিস্ত্রি, ছুতোর, রঙমিস্ত্রি, সবকিছুই। আমরা কাউকেই বঞ্চিত করব না। আমার শর্তটা এইঃ মন্দির মেরামতির কাজটা দিতে হবে কোনো মুসলমান ঠিকাদারকে। সে হিন্দু মিস্ত্রি বা মজদুর এমপ্লয় করতে পারবে না। দ্বিতীয়ত মসজিদ মেরামতের কাজটা দিতে হবে কোনো হিন্দু কন্ট্রাকটারকে—সে কোনো মুসলমান মিস্ত্রি বা মজদুর লাগাতে পারবে না।

প্রফেসার জামালউদ্দীন সোৎসাহে বলে ওঠেন, আপনার শর্ত—লা-জবাব! কিন্তু তাহলে আমারও একটা প্রস্তাব আছে, প্রফেসর মেহ্‌তা। বিবেচনা করে দেখুন। এই 'সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি'-র তৃণমূলে আছে মীরাবহিনজীর মহানুভবতা। তিনি যদি রসিদ আহ্‌মেদকে সেদিন মাফ না করে দিতেন, তাহলে আজ এ-সভা অনুষ্ঠিতই হতো না। তাই আমার প্রস্তাবঃ এই ট্রাস্টের নাম হোক 'মীরাবহিন সম্প্রীতি ট্রাস্ট'।

সবাই একযোগে কেয়াবাৎ দিয়ে ওঠে।

উঠে দাঁড়ায় মীরা দাভে। প্রাক্তন স্কুল মিস্ট্রেস। সবিনয়ে বিশুদ্ধ হিন্দিতে বলে, আপনারা যেভাবে আমাকে সম্মানিত করতে চেয়েছেন, তাতে আমি অভিভূত, সম্মানিত। কিন্তু আমি সবিনয়ে আমার আপত্তি পেশ করছি। এ সম্মান আমি গ্রহণ করতে পারি না। এ সম্প্রীতির তৃণমূলে আছেন আমার স্বামীর জ্যেষ্ঠভ্রাতা। কিন্তু তাঁর নামও আমি প্রস্তাব করছি না—এমনকি যাঁর হত্যাকাণ্ডে এই ব্যাপারটার সূচনা হয়েছিল সেই প্রয়াত ব্যক্তি—আমার স্বামীর স্মৃতিরক্ষার্থে তাঁর নামটা গ্রহণেও আমার দৃঢ় আপত্তি। হেতুটি

সহজবোধ্য। সেক্ষেত্রে একটা বেদনার কণ্টক, একটা অনুশোচনার কষ্টকর দুঃস্বপ্ন লেগে থাকবে এই ট্রাস্টের গায়ে। তাছাড়া প্রফেসর মেহ্‌তা যেভাবে তুলাদণ্ডে মেপে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে সমমাপের আশীর্বাদ বণ্টন করলেন তারপর আমি মনে করি এই ট্রাস্ট ফান্ডের সঙ্গে এমন একজন মহামানবের নাম যুক্ত হয়ে থাক, যিনি আজীবন হিন্দু-মুসলমানের সম্প্রীতির জন্য প্রাণপাত করে গেছেন; এবং যাঁর জীবনের অবসানও হয়েছিল সেই প্রচেষ্টাতেই। তাই আমার প্রস্তাব, এর নাম হোক, 'বাপুজী সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি সঙ্ঘ'!

জামাল সাহেবকে আবার বলতে হলো, মীরাবহিনের এ সওয়ালটাও লা-জবাব!

ইতিমধ্যে শরবৎ ও মিষ্টান্নের থালা এসে গেল। আলোচনা বন্ধ করতে হলো, পরিবেশনের জন্য। সেই সময় জুলেখা এপাশে সরে এসে তার মুখের পর্দা সরিয়ে প্রফেসর জামালউদ্দীনকে বললে, স্যার, আপনাকে মীরাদি জনান্তিকে কিছু বলতে চান। আপনি কাইন্ডলি একটু এই পাশের ঘরে আসবেন?

জামাল বিস্মিত হয়ে বলেন, জনান্তিকে?

—না। ঠিক জনান্তিকে নয়। আমিও থাকব সেখানে। আসুন।

পাশের ঘরে ওঁদের দুজনকে এনে বসালো মীরা দাভে। নিজেও বসল একটি সোফায়। বলল, প্রফেসরসাব, আপনার কাছে আমিও অপরাধী হয়ে আছি। ক্ষমা চেয়ে নিতে চাই।

জামাল চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ান। যুক্ত করে বলেন, ছি ছি, এসব কী বলছেন? বহিনজী!

—সেই দাঙ্গার রাত্রে আমার স্বামীর মৃত্যুর পূর্বেই আমি জ্ঞান হারিয়ে কার্পেটের ওপর লুটিয়ে পড়েছিলাম। রসিদ আহ্‌মেদ প্রথম বার যখন তরোয়ালের কোপটা মারে তখন উনি—মানে আমার স্বামী, একটা মশারির ছত্রি দিয়ে তা প্রতিরোধ করেছিলেন। সেটা আমি স্বচক্ষে দেখেছিলাম। তারপরেই দেখলাম আপনি ঝাঁপিয়ে পড়লেন রসিদের উপর। তরোয়ালটা ছিনিয়ে নিতে। আপনি তা কেড়ে নিতে পেরেছিলেন কি না, আমি জানি না, দেখিনি—কারণ ঠিক সেই মুহূর্তেই আমি সংজ্ঞাহারা হয়ে পড়ে যাই।

জামাল নতনেত্রে বললেন, বহিনজী, আমি নিজেও জানি না, আমি ওর হাত থেকে অস্ত্রটা ছিনিয়ে নিতে পেরেছিলাম কিনা। কিন্তু আদালতে আপনি তো আপনার সাক্ষ্যে বলেছিলেন যে—মানে আমাকেই আপনি—

—হ্যাঁ, সে-জন্যই এই জনান্তিকে মার্জনা চেয়ে নিচ্ছি। আমাকে উকিলবাবু বুঝিয়েছিলেন যে, আপনিই কাজটা করেছেন। উনি আমাকে আরও বলেন, আপনার চোখের সামনেই নাকি ভাগলপুরে কিছু হিন্দু গুণ্ডা তরোয়ালের কোপে আপনার কয়েকজন প্রিয়জনকে হত্যা করেছিল। এটা কি সত্য কথা ভাইসাব?

—হ্যাঁ, সত্য! আমিও বাধা দিতে চেষ্টা করেছিলাম ঐ মশারির ছত্রি দিয়েই!

—উকিলবাবু আমাকে বুঝিয়েছিলেন, তাই স্বহস্তে প্রতিশোধ না নিলে আপনার তৃপ্তি হবে না বলেই আপনি ওভাবে রসিদ আহ্‌মেদের হাত থেকে তরোয়ালটা ছিনিয়ে নেন।

জামাল বলেন, থাক মীরাবহিনজী। সেই

দুর্যোগের রাতের কথা যত কম আলোচনা করা যায় ততই ভাল। আমরা সবাই চাইছি সেই বিভীষিকা রাত্রির স্মৃতিটা ভুলে যেতে। চলুন, আমরা ও-ঘরে যাই। আপনার বাচ্চাটা কোথায়?

—ঘুমাচ্ছে। চলুন, ও-ঘরে সবাই অপেক্ষা করছে।

রসিদ আহ্‌মেদ এ জমায়েতে আসেনি। সে নাকি মহাত্মাজীর আত্মজীবনীটা আদ্যন্ত শেষ না করে রুদ্ধদ্বার কক্ষের বাইরে আসবে না। নিজেই নিজেকে সশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছে।

'বাপুজী সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ট্রাস্ট' রেজিস্ট্রি করা হয়েছে। হিন্দু ও জৈন যুবকেরা বাড়ি বাড়ি ঘুরে চাঁদা সংগ্রহ করেছে। মোট সংগ্রহ দশ লক্ষ টাকা হয়ে যাবার পর উদ্বোধনের আয়োজন করা হলো। মিউনিসিপ্যাল মাঠে বিরাট সামিয়ানা খাটিয়ে 'সম্প্রীতি সঙ্ঘে'র আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হলো। উদ্বোধন করতে যিনি এলেন, তিনি না হিন্দু, না মুসলমান। তিনি বিতর্কিত ইংরেজি ভাষার ভারতীয় সাংবাদিক খুশবন্ত সিং। প্রধান অতিথি হিসাবে যিনি উপস্থিত হলেন, তিনিও—না হিন্দু, না মুসলমান। তিনি আমেদাবাদের চার্চের পাদরি রেভারেন্ড আর্মেস্ট। 'ইন্ডিয়া টুডে'-র ঐ বিশেষ সংখ্যায় মানুভাই দাভের সঙ্গে খুশবন্ত সিং-এর ছবিও ছাপা হয়েছিল।

সম্প্রীতি তহবিলের অর্থে জৈন মন্দির ও মসজিদ দুটিকেই মেরামত করা হয়েছে। রঙ ফেরানো হয়েছে। বলা বাহুল্য অধ্যাপক মেহ্‌তার আরোপিত শর্ত মেনে। অর্থাৎ মন্দিরের মেরামতি বা রঙ ফেরানোর কাজ করেছে মুসলমান ঠিকাদার, মুসলিম মিস্ত্রি ও মজুরদের নিয়োগ করে। ঠিক তেমনি মসজিদের গম্বুজে, লিয়ানে যে ফাটল হয়েছিল, তা মেরামত করেছে রামাওতার আর তার দলবল।

একজোড়া দুঃখের কথা, মৌলবাদী হিন্দু ও মুসলমান দু-দুটি রাজনৈতিক দল—যাঁরা পাকাপোক্তভাবে সিধ্‌পুরে থানা গেড়ে বসেছিলেন, তাঁরা গ্রাম থেকে বিতাড়িত। মানুভাই, ভোগীলাল, প্রফেসর মেহ্‌তা প্রভৃতি ঐ গেরুয়াপার্টির নেতাদের গিয়ে অনুরোধ করেছিলেন, আপনাদের ঐ ধর্ম-নিয়ে-রাজনীতি ব্যবসায় আমরা সিধ্‌পুরে বরদাস্ত করব না। আপনারা দয়া করে ডেরা-ডাণ্ডা গুটিয়ে সসম্মানে বিদায় নিন। সন্ন্যাসী নেতা স্বীকৃত হননি। বলেছিলেন, হেরে পালিয়ে যাব বলে আমরা এখানে দপ্তর খুলে বসিনি। তা সত্যি—ওঁদের পিছনে রাজনৈতিক দলের মদত ছিল। কিন্তু গ্রামবাসীরা ওঁদের সর্বতোভাবে 'বয়কট' করল। কোনো দোকানদার ওঁদের মাল বেচবে না, বাজারে সবজিওয়ালা সওদা বেচবে না। খবরের কাগজওয়ালা কাগজ দেবে না, ডেয়ারির দুধ ফিরিকরনেওয়ালা দুধ বেচবে না। ওঁরা থানায় গিয়ে অভিযোগ করলেন। থানাদার বললে, কোনো দোকানদার কাউকে মাল না বেচলে ভারতীয় দণ্ডবিধির কোনো ধারা লঙ্ঘিত হয় বলে তো জানি না। এফ. আই. আর. লেখাতে পারলেন না ওঁরা। গ্রামসুদ্ধ মানুষ ওঁদের সঙ্গে বাক্যালাপ বন্ধ করল। ওঁরা আমেদাবাদ থেকে পার্টি লীডারদের আনিয়ে সভা করলেন। কদিন ধরে হিন্দু-মহল্লার পাড়ায় পাড়ায় সাইকেল-রিকশায় মাইকমুখো ক্যাডাররা সভার ঘোষণা করে ফিরল। সে সভায় যথারীতি গেরুয়া ঝাণ্ডা পোঁতা হলো, মাইক খাটানো হলো, মঞ্চ বানানো হলো। কিন্তু দেখা গেল যাঁরা গেরুয়াপার্টির সঙ্গে আমেদাবাদ থেকে 'মোটরকেডে' এসেছেন সেই জনা-বিশেক লোক ছাড়া সভায় আর মানুষ হয়নি।

গেরুয়াপার্টির অফিসটা সিধ্‌পুর থেকে উঠে গেল। একই অবস্থা সবুজপার্টির।

গেরুয়াপার্টির অফিসের মৌলবাদীরা সিধ্‌পুর থেকে বিতাড়িত হয়েছেন শুনে বহিরাগত সবুজপার্টির নেতারা উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন। মুসলমান-মহল্লায় তাঁরা একটা সভার আয়োজন করেছিলেন পরবর্তী নীতি নির্ধারণের জন্য। সে সভায় শুধু সমবেত হয়েছিল মুসলমান ভাইয়েরাই—জুম্মাবারে জোহরের নমাজের পর। এ সভায় কিন্তু বেশ লোক সমাগম হয়েছিল। হওয়ার কথাও। কারণ জামাল এবং রসিদের মুক্তিলাভের পর এই প্রথম জুম্মাবারের জোহরের নমাজ হচ্ছে। নমাজ শেষ হলে বড়া-ইমাম সুর করে পুকার দিলেন, আউদুবিল্লাহে শয়তান-ইর রাজিম। বিশমিল্লাহে রহমান্-ইর রহিম। তারপর তিনি থামলেন। বহিরাগত সবুজপার্টির মৌলবাদী মৌলানাসাব এরপর ডায়াসের দিকে এগিয়ে এলেন তাঁর ভাষণ দিতে। তাঁকে বাধা দিয়ে স্থানীয় বড়া-ইমাম হাজীসাহেব বললেন, মাফ কিজিয়ে বড়াভাই! এবার আমাদের প্রফেসরসাব কিছু বলবেন। উনি কোনোদিনই আমাদের জমায়েতে আসেন না, আজ প্রথম এসেছেন। সদ্য ফাঁসির দড়ির আলিঙ্গনমুক্ত হয়ে উনি ফিরে এসেছেন। সবাই ওঁর ভাষণ শুনতে আগ্রহী। আপনি এর পরে বলবেন।

মৌলানাসাব কিছু বিরক্ত হয়ে নিজের আসনে ফিরে গেলেন।

জামালউদ্দীন উঠে দাঁড়ালেন ডায়াসে। এগিয়ে গেলেন মাইকের দিকে। জনতায় একটা চাঞ্চল্য জাগল। কে একজন উৎসাহভরে পুকার দিয়ে ওঠে, 'আল্লাহ্ হু আকবর'! শ্রবণমাত্র সবাই ঐ ধ্বনি দিয়ে প্রফেসর জামালউদ্দীনকে অভ্যর্থনা জানালো। মনে হলো, মুসলমান যুবসমাজের ধারণায় জামালউদ্দীন একটা 'ট্রফি'। একটা প্রায় সমান-সমান ফাইনাল খেলা ড্র হতে হতে ওরা 'সাডেন ডেথ্'-এর পেনাল্টি কিক্-এ ট্রফিটা জিতে এনেছে।

জামাল সাহেব মাইকটাকে টেনে নিয়ে জনতার দিকে তাকিয়ে দেখলেন। সবাই মুসলমান। সামনের সারিতেই বসে আছেন উজির খান পাঠান, রসিদ আহমেদ, হাজী শাহ্, এনায়েৎভাই, নিজামুদ্দীন সাহেব প্রভৃতি। একান্তে—একটু দূরে একজনমাত্র বোরখা-পরা মহিলা। একমাত্র স্ত্রীলোক এ জমায়েতে। বোরখা এখনো সে খুলতে পারেনি প্রকাশ্য স্থানে; কিন্তু স্ত্রী-স্বাধীনতার ব্রতটাকেও সে ত্যাগ করতে পারেনি মৌলবাদীদের চোখরাঙানিতে। কট্টরপন্থীরা আপত্তি জানাতে সাহস পাননি। হেতুটা সহজবোধ্য। ঐ বোরখাধারিণীর খসম্ তার ধর্মপত্নীর এ আবদার মেনে নিয়েছে; আর সে লোকটা দৈহিক ক্ষমতায় একটা দৈত্য। সবচেয়ে বড় কথা সে যে তরোয়ালের এক কোপে ঘাড় থেকে কারও মাথা নামিয়ে দিতে সক্ষম এটা আদালতে প্রতিষ্ঠিত! বোরখার জালির ফুটো দিয়ে মেয়েটি নির্নিমেষ নয়নে দেখছিল ঐ প্রৌঢ় মানুষটিকে—যিনি তার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছেন, যাঁকে ও অত্যন্ত অন্তরঙ্গভাবে জানে। যাঁর সঙ্গে সে একটা গোপন-কথা যৌথ প্রতিজ্ঞায় লুকিয়ে রেখেছে। স্বামীকেও আজ পর্যন্ত বলেনি।

জামাল বক্তৃতা শুরু করলেন, বেরোদানে ইসলাম! সিধ্‌পুরের হে প্রিয় ইসলামী ভ্রাতৃবৃন্দ! আমি ভাগলপুর থেকে তিন বছর আগে আপনাদের গ্রামে আশ্রয় নিতে এসেছিলাম। ভাগলপুরের নৃশংস দাঙ্গার আমি প্রত্যক্ষদর্শী। আমার চোখের সামনেই পাঁচ-সাত জন নারী ও বৃদ্ধকে নির্মমভাবে নিহত হতে দেখেছি। আমি প্রতিবাদ করতে পারিনি—কারণ ওদের আঘাতে আমি তার আগেই ভূতলশায়ী হয়ে পড়ি। উঠে বসবার দৈহিক ক্ষমতা ছিল না আমার। ফলে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ভয়াবহতা আমার প্রত্যক্ষ-করা তথ্য! আমি জানতাম, এখানে আপনারা মাঝে মাঝে জমায়েত হন। হাজীসাহেব, মৌলানা সাহেব প্রভৃতি বক্তৃতা করেন। আমি কোনোদিন সেসব বক্তৃতা শুনতে আসিনি। যদিও আমি একটি কলেজে অধ্যাপনা করতাম—বক্তৃতা দেওয়াই ছিল আমার জীবিকা, তবু কোনোদিন আপনাদের সামনে বক্তৃতা করিনি।...কারণ আমি জানতাম, আমার বক্তৃতা আপনাদের পছন্দ হবে না, আপনারা শুনতে চাইবেন না। তার হেতু এতদিন আপনারা সাম্প্রদায়িক বিষে জর্জরিত হয়ে ছিলেন। অযোধ্যায় বাবরি মসজিদ ধ্বংসের প্রচেষ্টার যুগ থেকে।

সারা ভারতে হোক-না-হোক সিধ্‌পুরে আজ সম্প্রীতির একটা সূচনা হয়েছে। আমরা নতুনভাবে ভাবনার একটা সুযোগ পেয়েছি। আপনারা জানেন, আমি মৃত্যুর মুখ থেকে সদ্য ফিরে এসেছি। আমার এই পুনর্জন্মের মূলে আছে হিন্দু-মুসলমানের যৌথ-মুবারকী। সেই দুর্যোগ রাত্রে আমি খালি হাতে দাভেজীর ভদ্রাসনে প্রবেশ করেছিলাম। আমার বন্ধু রসিদ আহ্‌মেদের হাতে ছিল ঐ মারাত্মক আলা-ই-মুহ্‌লিখ! আমি সেটা ওর হাত থেকে কেড়ে নিতে গিয়েছিলাম। রসিদ হত্যার উন্মাদনায় আমাকে চিনতে পারেনি। আমাকে প্রচণ্ড ধাক্কা মারে। আমার ধারণা ছিল, সেই ধাক্কায় আমি ছিটকে পড়ি। আমার মাথাটা রেলিং-এর ব্যালাসট্রেডে প্রচণ্ড ধাক্কা খায়—আমি জ্ঞান হারাই। কিন্তু আদালতে শুনলাম, আমিই হত্যাকারী। মৃতের ঔরৎ আমাকে সনাক্ত করেছেন! আমি প্রতিবাদ করতে পারিনি। 'নট গিলটি প্লীড' করতেও পারিনি। কারণ আমার জ্ঞান ছিল না। আমাকে গিলটি হিসাবে বিচারক রায় দিতেন এতে সন্দেহ নেই।

কিন্তু তা ঘটল না। কেন হলো না? প্রথম কথাঃ রসিদ আহ্‌মেদ স্বীকার করে বসল যে, সে নিজেই হত্যাকারী। বন্ধুগণ! আপনারা বিবেচনা করে দেখুন। ঘটনাস্থলে ছিল চারজন মানুষ। একজন মৃত, দুজন নিশ্চেতন, শুধু মাত্র একজনই জানে প্রকৃত ঘটনাটি—সে ঐ রসিদ আহ্‌মেদ! সে নিজে থেকে কবুল না করলে প্রকৃত সত্য কোনোকালেই উদ্ধার করা যেত না। দ্বিতীয়ত, মীরাবহিন এবং মানুভাই দাভেজী যদি ওকে মাফি করে না দিতেন তাহলেও এমন সুন্দরভাবে সবকিছু সমাপ্ত হতো না। আমি ফাঁসির দড়ি থেকে ফিরে আসতাম না।

—বন্ধুগণ! আপনারা বিবেচনা করে দেখুন—ধর্মান্ধ মৌলবাদীদের প্ররোচনায় আমরা যেমন মাঝেমাঝে পশুর মতো আচরণ করি, ঠিক তেমনি কখনো কখনো মনুষ্যত্বের সাক্ষ্যও রাখি। রসিদ আহ্‌মেদ নিজে থেকে অপরাধ স্বীকার করতে এসেছিল মানুষ হিসাবে, মুসলমান হিসাবে নয়। দাভেজী ওকে ক্ষমা করে দিয়েছিলেন মানুষ হিসাবে—প্রতিহিংসাকামী হিন্দু হিসাবে নয়! ফলে সিধ্‌পুরের হিন্দু-মুসলমানের যৌথ উদ্যোগে এখানে একটি নতুন সম্প্রীতির সূচনা হয়েছে। নতুনভাবে চিন্তাভাবনা করার একটা সুযোগ এসেছে। তাই আমি বলব, ভারতে যত মুসলমান আছে অত মুসলমান পৃথিবীর অন্য কোনো রাষ্ট্রে নেই—এই তথ্যটা আপনারা সবাই জানেন কিনা জানি না। আর সেই সংখ্যাটা এত বৃহৎ যে সারা পৃথিবীতে যত জাপানী আছে প্রায় তার সমান। আপনারা এ তথ্যটা জানুন বা না জানুন—আমার আশঙ্কা কিছু পণ্ডিত কট্টর হিন্দু নেতা তা জানেন—অথচ না জানার ভান করেন। তাঁরা মনে করেন এই বিশাল মুসলিম জনসংখ্যাকে পদতলে রেখে, তাদের দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকে পরিণত করে তাঁরা ভারতে রামরাজ্য চালাতে পারবেন। ঠিক যেমনভাবে দক্ষিণ আমেরিকার প্ল্যান্টার্সরা আমেরিকাবাসী নিগ্রোদের দাসত্ববন্ধনে আবদ্ধ করে দেশটা শাসন করতে চেয়েছিল, অথবা শেষ গ্র্যান্ড মোঘল আওরঙ্গজীব চেয়েছিলেন হিন্দু প্রজাদের দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রজা বানিয়ে ভারত শাসন করতে। ইতিহাস প্রমাণ করেছে, না হয় না। দু'-চার শতাব্দী আগে তা সাময়িকভাবে হয়তো সম্ভবপর হতো, এখন তা একদিনের জন্যও চলে না। একথা কি ঐ কট্টর হিন্দু মৌলবাদী নেতারা জানেন না? জানেন। তবু তাঁরা ঐ শ্লোগান দিয়ে চলেন, ভারতের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্তে হিন্দুরাজ্য স্থাপনের প্রতীক হিসাবে রথযাত্রা করেন। তাঁদের একটিমাত্র আশা—বৃহত্তর হিন্দু ভোটাররা মোহগ্রস্ত হয়ে ভোট-বাক্সে তাদের সম্মতি জানাবে। ওঁরা গদিতে চড়ে বসবেন। শাসন ও শোষণ ক্ষমতা লাভ করবেন। ভাইপো-ভাগ্নেদের চাকরি দিতে থাকবেন, সুইস্ ব্যাঙ্কে অ্যাকাউন্ট খুলতে উদ্যোগী হয়ে পড়বেন। যতদিন না পরের নির্বাচনে ভোট-বাক্সের পদাঘাতে গদিচ্যুত হন।

এই স্বার্থসন্ধানী রাজনীতিক দলের বিপরীত মেরুতে আছেন একদল মুসলমান মৌলবাদী নেতা। তাঁরা মনে করেন যে, আমরা মুসলমানেরা, ভারতবর্ষের জীবনের মূল স্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে শতাব্দীর পর শতাব্দী 'সংখ্যালঘুতা'র সুবিধা ভোগ করে যাব। মনে রাখবেন, অষ্টম থেকে পঞ্চদশ শতাব্দী—দীর্ঘ সাতশ' বছর ধরে স্পেনে আধিপত্য বজায় রাখার পর—স্পেনবাসীদের জীবনের মূলস্রোতে মিশে যেতে না পারায় আজ স্পেনে ইসলাম নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে—

জনতার একাংশ থেকে কে একজন উর্দুতে প্রশ্ন করল, বড়াভাই! আপনার কথা আমরা কিছুই বুঝতে পারছি না।

জামাল আন্দাজে সেদিকে ফিরে বললেন, আমারই দোষ। আমি ভুলে গেছিলাম যে কলেজ-হলে লেকচার দিচ্ছি না। বেশ, আপনাদের বোধগম্য ভাষাতেই বলি, ভারতে প্রায় দশ কোটি মুসলমান আছে। তার শতকরা ষাট-সত্তর ভাগ অতি দরিদ্র—তারা দু'বেলা খেতে পায় না। পনের-বিশ ভাগও দারিদ্র্যসীমার নিচে। বাকি দশ-পনের শতাংশের অধিকাংশই মধ্যবিত্ত—চাকুরিজীবী, ব্যবসাদার প্রভৃতি। আর মাত্র এক বা দুই শতাংশ কোটিপতি! তাঁরাই কট্টর মৌলবাদীনীতির নিয়ন্ত্রক। তাঁরা মুসলমান জনতাকে হিন্দুর বিরুদ্ধে খেপিয়ে তোলেন। তাঁরা তাতে লাভবান হন। কী হিসেবে? সাম্প্রদায়িক ভেদনীতিটা বজায় রেখে। একমাত্র তাহলেই তাঁরা সঙ্ঘবদ্ধ ভোট নিয়ে

রাজনীতির বাজারে কেনাবেচা করতে পারেন। যে রাজনৈতিক দল তাঁদের বেশি সুবিধা দিতে স্বীকৃত হবে—মুসলমান হিসাবে তাদেরই ভোটগুলো দেওয়া হবে। ঐ নিরন্ন-নির্যাতিত ঝোপড়িবাসী মুসলমানদের তাতে কোনো সুবিধা হয় না। সব সুবিধাই লাভ করেন নেতৃস্থানীয় কোটিপতি মৌলবাদীরা। আমার কথাঃ আমরা ধর্ম বজায় রাখব, কিন্তু কুসংস্কার নয়। গো-মাংস মুসলমানের খাদ্যতালিকায় আবশ্যিক, এ কথা কোনো পীর-পয়গম্বর বলেননি কোনোদিন। না শেষনবী, না কোরান, না হাদিস। তবু একশ্রেণীর স্বার্থসন্ধানী মৌলবাদী মুসলিম ফতোয়া জারি করেনঃ গো-মাংস খাওয়া আবশ্যিক। 'হিন্দুত্ব-বিরোধিতা' ছাড়া এ নির্দেশের পিছনে আর কোনো প্রেরণা নেই। হিন্দুধর্ম ত্যাগ করে যাঁরা ইসলামধর্মে দীক্ষিত হতেন, দীর্ঘদিন ধরে তাঁদের গো-মাংস খাওয়াটা বাধ্যতামূলক ছিল। এই দৃষ্টিভঙ্গি বদল করার দিন এসেছে। আজই! এখনই!

দ্বিতীয় কথাঃ বহুবিবাহ এবং তালাক প্রথা। কট্টর মুসলিম নেতারা মনে করেন মুসলমানকে এক সঙ্গে চার-চারটি বিবি রাখার অনুমতি দিতে হবে। এ নাকি শরিয়তী আইনের অপরিহার্য নির্দেশ। তাছাড়া তালাক প্রথা পরিবর্তন করা যাবে না—সুপ্রীম কোর্ট শাহ্‌বানুর পক্ষে রায় দিলেও! কেন? না, আমরা মুসলমান পুরুষমানুষেরা স্ত্রী-শিক্ষা, স্ত্রী-মুক্তি, স্ত্রী-স্বাধীনতার বিরোধী! বন্ধুগণ! আপনারা কি জানেন, পাকিস্তানের মতো কট্টর ইসলামি দেশেও বর্তমানে বহুবিবাহ এবং তালাক প্রথা নিষিদ্ধ? এই প্রশ্নটি নিয়ে আমি আমার পরবর্তী বক্তা মৌলানা সাহেবের সঙ্গে আলোচনা করেছিলাম। উনি বললেন, পাকিস্তান একটি নিছক 'মুসলিম' রাষ্ট্র, 'ইসলামিক' রাষ্ট্র নয়। পাকিস্তানের মুসলমান একসঙ্গে চারটি বিবি পুষতে পারে না—তিনবার তালাক দিয়ে বিশ বছরের বিবাহিত সহধর্মিণীকে ঘর থেকে পথে নামিয়ে দিতে পারে না। এঁরা বলেন, তাতে কী? আমরা এতকাল স্ত্রীলোকদের উপর যে আধিপত্য বিস্তার করে এসেছি, যে অত্যাচার করে এসেছি তা অব্যাহত রাখতেই হবে! না হলে আমরা আন্দোলন করব। যে পার্টি আমাদের এই অধিকার রক্ষার প্রতিশ্রুতি

দেবে তাকেই ভোট দেব! দশ কোটি মুসলমান আছে ভারতে। তার মধ্যে যাঁরা ভোটার তার আশি-নব্বই শতাংশ পুরুষ, বাকি দশ-বিশ শতাংশ মহিলা। ঐ মহিলাদের ঘরে বন্দী করে রাখলেই হলো! এই দশ কোটি মুসলমানের ভোট নিয়ে আমরা ব্যবসা করব।

বন্ধুগণ! ভারতে বহু ধর্মের লোক সুখে-স্বচ্ছন্দে বাস করবে এটাই প্রত্যাশিত। আমরা ইসলামধর্ম পালন করব, অপ্রতিবাদে। কিন্তু আমাদের ভারতীয় হয়ে যেতে হবে। না হলে এই সাম্প্রদায়িক বিভেদে না-হিন্দু, না-মুসলিম—কেউই শান্তি পাবে না।

মোট কথা অচিরেই বহিরাগত কট্টর সবুজ পার্টির অফিসটাও গ্রাম থেকে উঠে গেল।

সবচেয়ে মজার কথাঃ মানুভাই দাভে একটা বিচিত্র খেতাব লাভ করলেন। আনুষ্ঠানিকভাবে নয়—মানুষের মুখে মুখে। গাঁয়ের আপামর জনসাধারণ—কী হিন্দু, কী মুসলমান—তাঁকে ডাকতে শুরু করল এক বিচিত্র সম্বোধনে, বাপুজী!

এত বড় সম্মান ক'জন পায়?

উদ্বোধনের দিনে খুশবন্ত সিং খুশবন্ত হয়ে বলেছিলেন, It has proved that Gandhiji's spirit is not really dead. [এখানে প্রমাণিত হলো যে, গান্ধীজীর মূলনীতিটা মৃত্যুঞ্জয়ী।]

অ্যাডভোকেট মগনভাই বারোত তাঁর ভাষণে বলেছিলেন, 'One just can't believe that such a thing can happen in real life. It is just a miracle and if only such incidents were to get replicated in many of our communally sensitive towns, the monster would indeed vanish.' [বাস্তবে এমন ঘটনা যে ঘটতে পারে তা যেন বিশ্বাসই হতে চায় না। এ যেন আধিদৈবিক এক অলৌকিক কাণ্ড! আর এমন ঘটনা যদি আমাদের সাম্প্রদায়িক স্পর্শকাতর অন্যান্য শহরগুলিতে ক্রমান্বয়ে ঘটতে থাকে, তাহলে ঐ সাম্প্রদায়িক রাক্ষসটা হাওয়ায় মিলিয়ে যাবে।]

এইখানে—কাহিনী সমাপ্ত করার পূর্বে একটা ব্যক্তিগত কৈফিয়ৎ দিয়ে যাই—এ কাহিনীর কিছুটা ঔপন্যাসিকসত্য, কিছুটা বাস্তবসত্য। ডক্টর খৈরনার, মানুভাই দাভে, ভোগীলাল, মহেন্দ্রভাই, মদনভাই বারোত ইত্যাদি বাস্তব চরিত্র। জ্ঞাতসারে তাঁদের বিষয়ে আমি ঔপন্যাসিকের সাহিত্যস্বীকৃত কল্পনাশ্রয়ী কোনো কথা বলিনি। মীরাবহিনের চরিত্রটি আদ্যন্ত বাস্তব—তাঁর স্বামীর নামও; কিন্তু তাঁর নামটা আমাকে কল্পনা করতে হয়েছে। সমস্ত তথ্য বাস্তব ঘটনার ভিত্তিতে রচিত—কিন্তু সহজেই অনুমেয়—কথোপকথন প্রভৃতি আমাকে কল্পনা করতে হয়েছে। তবু দৃঢ়তার সঙ্গে বলবঃ বাস্তবতা থেকে জ্ঞাতসারে আমি কোথাও বিচ্যুত হইনি। আমি জানি, আমার পাঠক-পাঠিকা বেশি আগ্রহী জানতে—সিধপুরে কী ঘটেছিল, ভাগলপুরে কী ঘটেছিল। আমার মনগড়া আষাঢ়ে গল্প নয়, বাস্তব তথ্য। তাই কথাসাহিত্যের খাতিরে আমি সজ্ঞানে কোথাও বাস্তব তথ্যকে অতিক্রম করিনি। তবু এইসব বাস্তব চরিত্রগুলি বর্ণনা করার সময় ভ্রমক্রমে আমি যদি কারও মনে বা ধর্মবিশ্বাসে আঘাত দিয়ে থাকি তবে করজোড়ে ক্ষমা চাইছি। আমার একমাত্র

উদ্দেশ্য : কথাসাহিত্যের মাধ্যমে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি গড়ে তোলা। প্রফেসর জামালউদ্দীন বা জুলেখা বা রসিদ আহ্‌মেদকে যদি আমি অনভিপ্রেতভাবে বর্ণনা করে থাকি তবে আমি তাঁদের কাছে যুক্তকরে ক্ষমাপ্রার্থী।

সিধ্‌পুরে 'বাপুজী সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি সঙ্ঘের' উদ্বোধন দিবসে শ্রদ্ধেয় মানুভাই দাভে যা বলেছিলেন—দৈনিক ইংরেজি পত্রিকায় যা ছাপা হয়েছিল তা এই : 'If attitudes are to undergo change then one has to set a precedent. If it is in the benefit of mankind, one has to make a beginning. In this particular case, I did it. Nothing more. [যদি দৃষ্টিভঙ্গি বদল করার প্রয়োজন হয়, তাহলে একটা উদাহরণ দিয়েই তো তা শুরু করতে হবে? যদি সেই পরিবর্তনে বৃহত্তর মনুষ্যসমাজের উপকার হয়, তাহলে একজনকে সেটা শুরু করার দায়িত্বটা নিতে হবে। এক্ষেত্রে আমি সেটা নিয়েছি। ব্যস! এর বেশি কিছু নয়।]

কী সহজ, সরল সংক্ষিপ্ত বক্তব্য!

মানুভাই দাভে যখন স্কুলের

ছাত্র—আমেদাবাদে—তখন উনি স্বয়ং মহাত্মাজীর সান্নিধ্যে আসার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। প্রতিদিন সন্ধ্যায় আশ্রমের প্রার্থনাসভায় যোগ দিতেন। উনি ছিলেন সেবাগ্রামে বালখিল্য বাহিনীর একজন সক্রিয় সদস্য। মহাত্মাজী বহুবার ওঁর মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করেছেন। সেই ঐতিহ্যের বাহক মানুভাই দাভেজী আজ সিধ্‌পুরের 'বাপুজী'!

উপসংহারে আবার সেই মূল প্রশ্নটাতেই ফিরে আসি : 'ক্যুয়ো ভাদিস!'

এ কোথায় চলেছি আমরা? একদল গেরুয়া রঙের হনুমান আর একদল সবুজ রঙের বাঁদর ক্রমাগত ধর্মের জিগির তুলে সম্প্রদায়গত বিভেদটা জিইয়ে রাখছে! আর যারা সংবিধানকে কব্জা করে দেশশাসনের নামে দেশশোষণে বদ্ধপরিকর, তারা ঐ 'সংখ্যালঘুতা' বিশেষ্য পদটাকে ভোটের বাজারে একটা পণ্য হিসাবে গণ্য করে! ঐসব স্বার্থসন্ধানী হোলটাইম রাজনীতি-বিদদের জুয়াচুরি বন্ধ করে আমরা কি পারি না একটা সুস্থ-সবল-সত্যনিষ্ঠ সরকার গঠন করতে—যারা হিন্দু, মুসলিম, ক্রিশ্চান, শিখকে দেখতে পাবে 'ভারতীয়' হিসাবে? যে মূর্খ নির্যাতিত, নিরন্ন, অবহেলিত আমজনতাকে দেখিয়ে আজও প্রশ্ন করছে : 'ওরা হিন্দু, না ওরা মুসলিম?' তাদের মুখের উপর আজও কি বলার সময় আসেনি যে ওরা 'মানুষ! সন্তান মোর মা'র!'

ছবি : অমিত চক্রবর্তী